আফগান ভূখণ্ডে আমেরিকা ও ন্যাটো বাহিনীর বিরুদ্ধে
লড়াইরত এক মুজাহিদের ঈমানদীপ্ত দাস্তান

মুকাদ্দাস জঙ্গ

হা য়া তু ল্লা হ

মুকাদ্দাস জঙ্গ

আফগান ভূখণ্ডে আমেরিকা ও ন্যাটো বাহিনীর বিরুদ্ধে
লড়াইরত এক মুজাহিদের ঈমানদীপ্ত দাস্তান

মুকাদ্দাস জঙ্গ

মূল : হায়াতুল্লাহ
সম্পাদনা : ড. হামিদ আসগর শায়খ, (পাকিস্তান)
ভাষান্তর : ছানা উল্লাহ সিরাজী

আবাবিল প্রকাশন
ইসলামী টাওয়ার, ১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০
দূরালাপনী : ০১৭১১৭১১৪০৯

মুকাদ্দাস জঙ্গ
হায়াতুল্লাহ

প্রকাশক
এস এম আমিনুল ইসলাম

© সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ
নভেম্বর ২০১৪ ঈ.

প্রচ্ছদ
শাকীর এহসান উল্লাহ

কম্পোজ
ব ই ঘ র বর্ণসাজ
বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০
০১৭১১৭১১৪০৯

মুদ্রণ : মাসুম আর্ট প্রেস
২৬/২ প্যারীদাস রোড, ঢাকা-১১০০

মূল্য : ২০০ টাকা

ISBN : 984-70160-0113-7

MUKADDAS JONG : By Hayatullah, **Published by :** S M Aminul Islam, **ABABIL PROKASHON** : Islami Tower, 11/1 Banglabazar Dhaka-1100
First Edition : November 2014 © by the pablisher

Price : 200 Taka only

অনুবাদকের কলম থেকে

এটি গতানুগতিক কোনো কল্পকাহিনী নয়। রাশিয়া ও বৃটেন থেকে শুরু করে আমেরিকা ও ন্যাটোসহ সম্মিলিত ক্রুসেডার বাহিনীর বিরুদ্ধে লাখো শহীদের পুণ্যভূমি আফগানের সরেজমিনে যুদ্ধরত একজন পাকিস্তানি মুজাহিদের ঈমানদীপ্ত আত্মকথা। যার একদিকে রয়েছে মানবতার রক্তে রঞ্জিত হাতের জুলুম, নির্যাতন, বর্বরতা, হিংস্রতা আর অপরদিকে রয়েছে মজলুমানের ডাকে বিশ্বের দিক দিগন্ত থেকে ছুটে আসা মুহাম্মাদী শার্দূলদের বীরত্ব, সাহসিকতা, ত্যাগ আর খোদায়ী মদদের জীবন্ত উপমা। যার পরতে পরতে পাঠক খুঁজে পাবেন শ্বাসরুদ্ধকর বিভীষিকাময় সম্মুখ যুদ্ধের বিবরণ। যার মিসাইল, মাইন, গোলাবারুদের উৎকট গন্ধ আর বিকট বিস্ফোরণ পাঠককে নিয়ে যাবে পাথুরে পাহাড় ঘেরা গিরিসঙ্কট আর কাটাগুল্মের বালুময় রণাঙ্গনে। এছাড়াও বক্ষমান গ্রন্থে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হবে বর্তমান বিশ্বের প্রকৃত ইসলামের ধারক-বাহক তালেবানের বিরুদ্ধে চালানো তথ্য-সন্ত্রাস ও প্রোপাগাণ্ডার গোপন অধ্যায়। অবশেষে আখেরি জমানায় ইমাম মাহদীর বাহিনীতে যোগ দেয়ার আশায় বুক বেঁধে প্রস্তুত থাকা পাগলদের নামে তোহফা পাঠিয়ে মহান আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করছি, তিনি যেনো আমাকেও শামিল করে নেন সেই পবিত্র বাহিনীতে। সেই সাথে কবুল করেন গ্রন্থটিকে এবং তার পাঠকদেরকে।

– ছানা উল্লাহ সিরাজী
২৬.১১.৩৫ হিজরী,
২২.০৯.১৪ খ্রিষ্টাব্দ

সম্পাদকের কথা

বর্তমান জমানার সবচেয়ে বড় ক্রুসেড যুদ্ধে কুফুরি বিশ্বের মোকাবিলায় দীর্ঘ সময় ধরে মাথা উঁচু করে দণ্ডায়মান সিংহশাবক এবং শাহী দিলের তালেবান মুজাহিদীনের এই ঈমানদীপ্ত দাস্তান আক্রমণ, পিছু হটা, পিছু হটে পাল্টা আক্রমণ করার এক বাস্তব নমুনা। এই উপাখ্যান এমন এক মুজাহিদ লিপিবদ্ধ করেছেন, যিনি দীর্ঘ সময় তালেবান মুজাহিদীনের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বিশ্ব-কুফরের মোকাবিলায় লড়াই করেছেন এবং তাদেরকে নাকানি-চুবানি খাইয়েছেন। এই দাস্তানের লেখক ভাই হায়াতুল্লাহ নিজের খোদাদাদ যোগ্যতাকে কাজে লাগিয়ে জিহাদের ময়দানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। দোয়া করি আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত ভাই হায়াতুল্লাহ এবং অন্যান্য বন্দী মুজাহিদীনকে মুক্তি দান করুন। আমীন।

– সম্পাদক

পূর্বাভাষ

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ○

আর তোমরা হিম্মত হারিও না এবং পেরেশান হয়ো না, তোমরাই বিজয়ী হবে যদি তোমরা মুমিন হও। *[আলে ইমরান ৩:১৩৯]*

ইতিহাস সাক্ষী, আফগান ভূমিতে বিশ্বের সুপার পাওয়ারগুলো নিজেদের সংখ্যাধিক্য, উন্নত যুদ্ধাস্ত্র, অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ভরসা এবং শক্তির দাপটে বার বার হামলা করেছে। তারা নিজেদের সামনে আত্মমর্যাদাশীল আফগানদের মাথা ঝুকাতে চেয়েছে; কিন্তু প্রত্যেক বার আত্মমর্যাদাশীল আফগান মুসলমানরা যুগের ফেরাউনদেরকে নিজেদের ঈমান, ধৈর্য, সাহসিকতা এবং কৌশলের সাথে টুকরো টুকরো করেছে। প্রতিবারই আফগান ভূখণ্ডকে আত্মমর্যাদাশীল আফগান মুসলমানরা সুপার পাওয়ারদের কবরস্থান প্রমাণ করে ছেড়েছে।

কথিত সুপার পাওয়ারেরা যে আকৃতিতেই আফগানিস্তানের উপর নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে সর্বদাই আফগানিদের হাতে ধ্বংস হয়েই ফিরে গেছে। কেননা মুমিনের ঈমান কখনো তাকে শাসিত হতে এবং অন্যের গোলামি করতে অনুমতি দেয় না। এ জন্যই আফগান মুসলমানরা কখনও কারো জবর দখল মেনে নেয়নি।

আজ থেকে বারো বছর আগে বিশ্বের কথিত সুপার পাওয়ার সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে নিজেদের বানানো, অচল এবং ফালতু আন্তর্জাতিক আইনের ধুয়া তুলে হামলা করে। সেই সাথে এই হামলা এবং প্রকাশ্য সন্ত্রাসকে যথার্থ ও বৈধ ঘোষণা করে। সম্ভবত আমেরিকা ও তাদের মিত্র বাহিনীর আত্মমর্যাদাশীল বাহাদুর আফগানদের ইতিহাস জানা ছিলো না। যদিও জানা থাকে, তাহলে তা থেকে তারা শিক্ষা গ্রহণ করেনি। তাছাড়া আমেরিকা ও তাদের সাঙ্গপাঙ্গরা নিজেদের অত্যাধুনিক প্রযুক্তির উপর খুবই ভরসা এবং অহংকার করতো। তারা মনে করতো, অত্যাধুনিক অস্ত্র এবং বিপজ্জনক বৈমানিক শক্তির জোরে তালেবান মুজাহিদীনকে পিষে মেরে ফেলবে।

যদিও আমেরিকার নিকৃষ্টতম আগ্রাসী এবং হিংস্রতার ফলে বাহ্যিক দৃষ্টিতে আমিরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর মুজাহিদ দা.বা. নিজের

হুকুমত ছেড়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু দীর্ঘ ১১ বছর আমেরিকা এবং তাদের সাঙ্গপাঙ্গদের পূর্ণ চেষ্টা, মানবতাবিরোধী জুলুম-নির্যাতন ও সর্বপ্রকার নিত্য নতুন অস্ত্র, প্রযুক্তি ব্যবহার করা সত্ত্বেও আজ কাবুল থেকে কান্দাহার, গজনী থেকে বদখশান এবং খোশত থেকে মাজার শরীফ পর্যন্ত তালেবান মুজাহিদীনেরই রাজত্ব। আফগানিস্তানের ভিতর তালেবান যেখানে ইচ্ছা আমেরিকা এবং ন্যাটো বাহিনীর বিরুদ্ধে নিজেদের ইচ্ছে মতো আক্রমণ পরিচালনা করছে। এছাড়া আফগানিস্তানের অত্মমর্যাদাশীল জনগণের অধিকাংশই তালেবানের উপর পূর্ণ ভরসা রাখে। এই কারণেই তালেবান মুজাহিদীন আফগানিস্তানের যে কোনো এলাকায় চলে যায়, সেখানকার জনগণ গোপনের তাদেরকে স্বাগত জানায় এবং তাদের প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ রাখে। যার জীবন্ত উপমা আপনি অত্র বইয়ের জায়গায় জায়গায় দেখতে পাবেন।

আমিরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর মুজাহিদ দা.বা. এর নেতৃত্বে আফগানিস্তানে আমেরিকা এবং ন্যাটো বাহিনীর বিরুদ্ধে উন্নত শির মুজাহিদীন, ভাই হায়াতুল্লাহ, মোল্লা আব্দুস শুকুর, মোল্লা দাদুল্লাহ, ভাই আজমরে, ভাই খালিদ কে-টু, উস্তাদ বেলালী, ক্বারী আব্বাস শহীদ এবং অন্যান্য মুজাহিদীনের ধারাবাহিক প্রচেষ্টা ও কুরবানীর প্রতিদানে আজ আফগানিস্তানের ৭৫ ভাগের চেয়েও বেশি এলাকা তালেবানের নিয়ন্ত্রণে। এসব এলাকায় তাদেরই হুকুমত চলে। যা আজ আমেরিকা ও ন্যাটোসহ গোটা বিশ্বের অধিকাংশ দেশ স্বীকার করছে। আফগানিস্তানে ন্যাটো এবং আমেরিকার জঙ্গী নেতৃত্বের উচ্চ পর্যায়ের অফিসাররা চুরি করে গোপনে বিশ্বের বই পুস্তক ও মিডিয়া জগতের সামনে স্বীকারোক্তিও করছে যে, আফগানিস্তানের ৩৪টি প্রদেশের মধ্যে ৩৩টি প্রদেশেই তালেবানের হুকুমত রয়েছে। যেখানে তাদের গভর্নর নিয়মিত হুকুমতের কাজ করছে। বিদ্যমান অবস্থা থেকেই অনুমান করা যায়, তালেবানের হাতে আমেরিকা এবং তাদের সাঙ্গপাঙ্গদের কী পরিণতি হচ্ছে। তারা আফগানিস্তানের মৃত্যুপুরী থেকে নিজের জান বাঁচানোর জন্য পালানোর পথ খুঁজছে। আমেরিকা বিভিন্ন বাহানায় এমন কোনো মান বাঁচানো পদ্ধতি খুঁজছে, যার মাধ্যমে নিজ সাঙ্গপাঙ্গদের কোলে নিয়ে আফগানিস্তান থেকে পালিয়ে যাবে। পক্ষান্তরে তালেবান মুজাহিদীন নিজেদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সাথে খোরাসান ভূমিকে ভিনদেশী সৈন্যদের জন্য কবরস্থান বানাতে উন্মুখ হয়ে রয়েছে।

২০০১ সালে যখন আমেরিকা পুরো বিশ্বের উল্লেখযোগ্য রাষ্ট্রগুলোর[১] সাথে মিলে খোরাসানের[২] সরেজমিনে হামলা করেছিলো, তখন গোটা পৃথিবী, বিশেষত মুসলিম দেশের লোকজন দাঁতে আঙুল কামড়াচ্ছিলো যে, এখন কী হবে? দাজ্জালি এজেন্ডা বাস্তবায়নকারী এবং কথিত বিশ্লেষকদের যবান তখন দরাজ হয়েছিলো, এবার ইসলামী শরীয়ত বাস্তবায়নকারী মোল্লাদেরকে তছনছ করে ফেলবে। আমেরিকা এসব তালেবানের নাম নিশানা দুনিয়া থেকে মিটিয়ে দেবে। ইসলামের শ্লোগানধারী সেসব মুজাহিদীনের ইতিহাস অতীত কাহিনী করে ফেলবে। বহ্যিক দৃষ্টিতেও এমনি মনে হচ্ছিলো। কারণ, আমেরিকা এবং ইউরোপের মারাত্মক ধরনের অত্যাধুনিক প্রযুক্তির মোকাবিলায় তালেবানের কাছে তো কিছুই ছিলো না। তালেবানের সরঞ্জামহীনতা আর বাহ্যিক প্রযুক্তি ও অস্ত্রশস্ত্রের জীর্ণশীর্ণ অবস্থা দেখে দুনিয়া অনুমান করলো, এবার আমেরিকার হাতে তালেবানের ধ্বংসকে কেউ ঠেকাতে পারবে না। মুসলমানদের দুশমনেরা আনন্দ করছিলো; দুনিয়াতে বিদ্যমান একমাত্র প্রকৃত ইসলামী হুকুমতকে আমেরিকা এবং মিত্র বাহিনী খতম করে দেবে। অথচ মুজাহিদীনদের মহব্বতকারী মুসলমানগণ দূরে বসে অশ্রু বিসর্জন দিচ্ছিলো– হায়, ইসলামী হুকুমত শেষ হয়ে যাবে! মুজাহিদীনকে মেরে ফেলা হবে!

পক্ষান্তরে হুকুমত এবং রাজত্ব ছেড়ে আমিরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর মুজাহিদ দা.বা. এবং তার জানবাজ সাথীবর্গ এক নতুন গেরিলা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে পাহাড়ের দিকে যাচ্ছিলেন। আমেরিকা এবং তাদের

---

১. দেশগুলো হলো, আলবেনিয়া, আরমেনিয়া, অস্ট্রেলিয়া, অস্ট্রিয়া, আজারবাইজান, বাহরাইন, বেলজিয়াম, বসনিয়া, হার্জেগোভিনা, বুলগেরিয়া, কানাডা, ক্রোয়েশিয়া, চেক রিপাবলিক, ডেনমার্ক, এল সালভাদর, এস্তোনিয়া, ফিনল্যান্ড, ফ্রান্স, জর্জিয়া, জার্মানি, গ্রিস, হাঙ্গেরি, আইসল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড, ইতালি, জর্ডান, রিপাবলিক অব কোরিয়া, লাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া, লুক্সেমবার্গ, মালয়েশিয়া, মঙ্গোলিয়া, মন্তেনিগ্রো, নেদারল্যান্ডস, নিউজিল্যান্ড, নরওয়ে, পোল্যান্ড, পর্তুগাল, রোমানিয়া, স্লোভাকিয়া, স্লোভেনিয়া, স্পেন, সুইডেন, প্রাক্তন যুগোস্লাভিয়া রিপাবলিক অফ মেনিডোনিয়া, টোঙ্গা, তুর্কি, ইউক্রেন, সংযুক্ত আরব আমিরাত, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র। যাদের সংক্ষিপ্ত নাম, ISAF (International Security Assistance Force) –অনুবাদক।

২. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে বৃহত্তর খোরাসান বলতে নিম্ন লিখিত ভূ-খণ্ডকে বুঝাতো– 'উত্তর-পশ্চিম আফগানিস্তান (হেরাত, বলখ, কাবুল, গজনী ও কান্দাহার), উত্তর ও দক্ষিণ-পূর্ব উজবেকিস্তান (সমরকন্দ, বুখারা, সেহরিসাবজ, আমু নদী ও সীর নদীর মধ্যাঞ্চল), উত্তর-পূর্ব ইরান (নিশাপুর, তুশ, মাসহাদ, গুরুগান ও দামাঘান), দক্ষিণ তুর্কমেনিস্তান (মেরি প্রদেশ, মার্ভ ও সাঞ্জান), দক্ষিণ কাজাখাস্তান, উত্তর ও পশ্চিম পাকিস্তান (মালাকান্দ, সোয়াত, দীর ও চিত্রাল) এবং উত্তর পশ্চিম তাজিকিস্তান (সুগ্ধ প্রদেশের খোজান্দ, পাঞ্জাকেন্ত) এলাকা নিয়ে বিস্তৃত। বর্তমানে আফগানিস্তান যার মধ্যমণি। –অনুবাদক।

সাঙ্গপাঙ্গদের অত্যাধুনিক প্রযুক্তি, ভয়ঙ্কর মারণাস্ত্র এবং মারাত্মক ধরনের বৈমানিক শক্তি তাদেরকে বিলকুলই প্রভাবিত করতে পারেনি। কারণ, তাদের দৃষ্টি সরঞ্জামের প্রতি নয়, বরং সকল সরঞ্জামের মালিকের প্রতি ছিলো। তাদের সামনে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের এই ঘোষণা ছিলো–

كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ

কত ছোট দল আল্লাহর হুকুমে বড় দলের উপর বিজয়ী হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা ধৈর্য ধারণকারীদের সাথে রয়েছেন। *[বাকারা ২:২৪৯]*

আলহামদু লিল্লাহ! আজ আল্লাহ তায়ালার উপর ভরসাকারীরা বিজয়ী হয়েছেন। আসমানী সাহায্যের সামনে প্রযুক্তির ভূত টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে।

বক্ষমান পুস্তক 'মুকাদ্দাস জঙ্গ' সেসব কাণ্ডারীদের উপাখ্যান, যাঁরা সরঞ্জাম ছাড়াই আল্লাহ তায়ালার মদদ ও নুসরতের ভরসায় জমানার ফেরাউনদের সাথে লড়ে গেছেন। 'মুকাদ্দাস জঙ্গ' আল্লাহর সেসব সৈনিকদের উপাখ্যান, যাঁরা নিজেদের আবিস্কৃত দেশি অস্ত্রসস্ত্র ও গোলাবারুদ দিয়ে ইহুদী নাসারাদের অত্যাধুনিক প্রযুক্তিকে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে। 'মুকাদ্দাস জঙ্গ' খোরাসানে ক্রুসেডীয় এবং জায়নবাদী সৈন্যদের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দণ্ডায়মান অল্প সংখ্যক জানবাজ মুজাহিদীনের চোখে দেখা ঘটনাপুঞ্জি। এই উপাখ্যানকে পাঠ করে একজন পাঠক নিজেই আন্দাজ করতে পারবেন, 'মুকাদ্দাস জঙ্গ' পুস্তকে উল্লেখিত দুই/একটি যুদ্ধ ছাড়া গোটা আফগানিস্তানে মুজাহিদীনের হাতে ক্রুসেডীয় এবং জায়নবাদী সৈন্যদের কী করুণ পরিণতি হয়েছে।

আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের দরবারে দরখাস্ত, তিনি এই পুস্তককে উম্মতে মুসলিমার জন্য জাগরণী টনিক হিসেবে আপন দরবারে কবুল করুন। তিনি এই পুস্তকের লেখক এবং অন্যান্য মুজাহিদীনকে তাগুতের কয়েদখানা থেকে মুক্তি দান করুন। আমীন।

ড. হামিদ আসগর শায়খ
০১.০৩.২০১৩ খ্রিষ্টাব্দ
১৮.০৪.১৪৩৪ হিজরি

সূ চি প ত্র

শুহাদাদের পুণ্যভূমি আফগানিস্তানে জিহাদী সফর / ১৯
আমেরিকান হেলিকপ্টারের আগমন / ২২
আঙ্গুর বাগানের দিকে রওয়ানা / ২২
মোল্লা মিলাঙ্গের সাথে সাক্ষাৎ / ২৩
এলাকায় তল্লাশি / ২৪
খোদায়ী মদদের অবাক করা কাহিনী / ২৪
মোল্লা আব্দুর কাদীর ও খোদায়ী মদদ / ২৫
মুজাহিদীনের গ্রেফতার ও মুক্তি / ২৬
এলাকা রেকি ও দায়িত্ব বণ্টন / ২৭
আমেরিকানদের উপর প্রথম আঘাত / ২৭
নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে / ৩০
ক্রুসেডারদের জুলুম নির্যাতন / ৩৪
স্বদেশ প্রত্যাবর্তন / ৩৫
আফগান বাকি, পাহাড়ি অঞ্চল বাকি / ৩৬
আফগানে যাত্রা / ৩৮
কোয়েটার করুণ অবস্থা / ৩৯
ডিউরেন্ড বর্ডার ক্রসিং / ৪০
পুলিশপ্রধান নজর আলী / ৪২
কমান্ডার মোল্লা আব্দুশ শুকুরের সাক্ষাৎ / ৪৬
তালেবানের রণপ্রস্তুতি / ৪৮
বিভিন্ন জেলার তালেবানের আগমন / ৪৯
গোয়েন্দার দৃষ্টান্তমূলক পরিণতি / ৫৫
আজমরে এবং আল্লাহ তায়ালার রহমত / ৫৬
মাইন ফেটে গেছে / ৫৭

খাকরিজ জেলে হামলা / ৬০
চৌকি ঘেরাও / ৭০
ফিরে আসার সফর এবং আজমরের শুশ্রূষা / ৭১
আজমরে মুহাজির এবং মুজাহিদ : মধ্য এশিয়ার রাষ্ট্রগুলোর অবস্থা এবং দৃঢ়-ঈমান মুসলমানদের করুণ অবস্থা / ৭২
মধ্য এশিয়ার আজাদ হওয়া রাষ্ট্রগুলো / ৭৩
আহমদ শাহ মাসউদের গাদ্দারির কারণ / ৭৭
তালেবানের সাথে খাকরিজ প্রশাসনের সন্ধি / ৮৩
তালেবানের শর্তাবলি / ৮৩
সুড়সেক মুজাহিদীনের মারকাজে : কানাডিয়ান আর্মির বিরুদ্ধে আক্রমণের জন্য উদ্বুদ্ধকরণ / ৮৪
সুড়সেক এবং নামকরণের কারণ / ৮৫
শিনের দিকে যাত্রা / ৮৭
সরল-সহজ তালেবান এবং ক্রুসেডীয় নির্লজ্জতা / ৮৯
গুল খানের মর্মান্তিক শাহাদাত / ৯১
জিহাদের আরো একটি কারামত / ৯৪
গুল খান শহীদ রহ. / ৯৫
হযরত খানছা রা. এর রেওয়ায়াত : গুল খান শহীদ রহ. এর সম্মানিতা মাতার প্রতিক্রিয়া / ৯৬
কানাডিয়ান আর্মির কনভয়ে রেকি / ৯৭
তালেবানের প্রচেষ্টা / ৯৯
সাবউন খান এবং দেশি মুরগি / ১০০
মহব্বত খানের মহব্বত / ১০৩
নতুন আবিষ্কার / ১০৫
নামকরণের কারণ / ১০৬
প্রয়োগ / ১০৬
মাইন বিছানো / ১০৬
দেখার মতো আক্রমণ / ১০৭
কানাডিয়ান আর্মির বদ অনুভূতি / ১১২
আমেরিকান বিমানের বোম্বিং / ১১২
তালেবানের সাথে যোগাযোগ / ১১৩

ধ্বংসপ্রাপ্ত ট্যাংকের বাকি অংশ / ১১৩
তালেবানের শুভেচ্ছা বাণী / ১১৪
কানাডিয়ান আর্মির প্রতিনিধির স্বীকারোক্তি / ১১৫
মোল্লা আব্দুর রহমানের প্রতিক্রিয়া / ১১৫
স্থানীয় জনতার জিহাদী স্পৃহা / ১১৯
মাওলানা হামিদুল্লাহ আমলদার আলেম এবং সফল ব্যবসায়ী / ১১৯
কানাডিয়ান আর্মির উপর দ্বিতীয় হামলার প্রস্তুতি / ১২১
আক্রমণে ব্যর্থ হওয়ার কারণসমূহ / ১২৪
নতুন আবিষ্কারের প্রশিক্ষণ / ১২৫
চুনারে যাত্রা / ১২৮
নিশ জেলার আক্রমণের বিবরণ / ১৩০
দাররাহনুর পার হওয়া / ১৩৩
ঘেরাওয়ে তালেবান / ১৩৪
রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ / ১৩৫
নিখোঁজ সাথীদের খোঁজে / ১৩৮
মোল্লা আব্দুল হাকিমের শাহাদাত / ১৩৯
আমেরিকানদের চালাকি / ১৪০
আমেরিকান নির্লজ্জতা এবং তালেবানের জবাব / ১৪১
মোল্লা আব্দুশ শুকুরের সাথে পরামর্শ / ১৪১
মোল্লা আব্দুল হাকিম শহীদ রহ. এর কবরে / ১৪২
শহীদের কারামত / ১৪২
মোল্লা আব্দুল হাকিম শহীদ রহ. : ইলম ও
জিহাদের অনুপম সংমিশ্রণ / ১৪৩
শিনে যাত্রা / ১৪৫
আব্দুস সবুরের গ্রেফতার / ১৪৫
কানাডিয়ান আর্মির উপর দ্বিতীয় আঘাত / ১৪৬
কানাডিয়ান আর্মির উপর তালেবানের ভয়ভীতি / ১৪৬
খাঞ্জার প্রভাব / ১৪৭
সুস্পষ্ট বিজয় / ১৪৭
তালেবানের অভিনন্দন / ১৪৮
বিবিসির পশতু বিভাগের সংবাদ / ১৪৮

কাজি শের জামান ক্রুসেডারদের এজেন্ট / ১৪৯
কাজি শের জামানের উপর গুপ্তচরবৃত্তি / ১৪৯
ক্রুসেডীয় জজ আপন পরিণামে / ১৫০
ফিরতি সফর / ১৫২
গম্বুজ বসতিতে রেপিয়েটার স্থাপন / ১৫৩
রেপিয়েটার কী / ১৫৪
বি-৫২ বিমানের ভীতিকর বোম্বিং / ১৫৪
মোল্লা তোর নকিবের সাথে যোগাযোগ / ১৫৫
খেজুর যুদ্ধ / ১৫৫
সুস্পষ্ট বিজয় / ১৫৬
কমান্ডার মোল্লা তোর নকিবকে মোবারকবাদ / ১৫৭
তালেবানি হুকুমত / ১৫৭
কান্দাহারের দরজায় করাঘাত / ১৫৭
রওয়ানা / ১৫৮
বিশ্বরোডে রেকি / ১৫৮
কান্দাহার টু উর্জেগান বিশ্বরোডে এ্যাম্বুশ / ১৫৯
তালেবানের অসাধারণ বৈঠক / ১৬০
বৈঠকের ঘোষণা / ১৬০
জেলার দায়িত্বশীলগণ / ১৬১
তালেবানের আদালতি ফায়সালা / ১৬১
প্রেমের পরীক্ষা আরো বাকি / ১৬২
দোস্তামের জীবন এবং বর্বরতা / ১৬৩
কামাল শহীদ রহ. / ১৬৯
মঞ্জিলের দিকে রওয়ানা / ১৭০
হায়রে তোমার আমেরিকান ইসলাম / ১৭১
কাবুল / ১৭২
কোথায় পবিত্র হিজাজ, কোথায় কাবুল / ১৭৩
তালেবান আফগানিস্তানকে কী দিয়েছে / ১৭৩
শান্তি ও নিরাপত্তা / ১৭৪
ন্যায় ও ইনসাফ / ১৭৫
শরয়ী শাস্তি / ১৭৫

অপরাধের প্রতিকার / ১৭৬
কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা / ১৭৬
নেশাজাতদ্রব্যের উৎপাদন বন্ধ / ১৭৬
খুন-খারাবির সমাপ্তি / ১৭৭
অবৈধ ট্যাক্স বন্ধ / ১৭৭
সুদের সমাপ্তি / ১৭৭
অস্ত্রবাজি বন্ধ / ১৭৮
দীনি এবং সাধারণ শিক্ষা / ১৭৮
নারী শিক্ষা / ১৭৯
জেলখানা সংশোধনী কেন্দ্র / ১৮৯
কৃষি উন্নয়ন / ১৮০
নতুন শিল্প কারখানা স্থাপন / ১৮০
টেক্সটাইল মিল চালু / ১৮০
তৈল শোধনাগার / ১৮১
সার উৎপাদন / ১৮১
সেচ প্রকল্প চালু / ১৮১
বিশুদ্ধ খাবার পানির ব্যবস্থা / ১৮১
গ্যাসের সুব্যবস্থা / ১৮২
সহজ চিকিৎসা ব্যবস্থা / ১৮২
অসহায়দের পুনর্বাসন / ১৮২
যোগাযোগ ব্যবস্থা / ১৮৩
সড়ক ব্যবস্থার উন্নয়ন / ১৮৩
পানিসম্পদ উন্নয়ন / ১৮৩
বিদ্যুতের ব্যবস্থা / ১৮৪
যাকাতের প্রচলন / ১৮৪
জার্মান মার্সিডিজে মাজার শরীফ / ১৮৫
চারিকার / ১৮৬
ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের নিপুণ শৈলি চারিকার ঝর্ণা / ১৮৭
নৌকা চালানো এবং কৃত্রিম পুল তৈরির প্রশিক্ষণ / ১৮৭
জাবালুস সিরাজ / ১৮৮
দাররাহসালঙ্গ থেকে খাঞ্জান পর্যন্ত / ১৮৮

মুকাদ্দাস জঙ্গ ◈ ১৬
দোশি / ১৮৯
হাশেম খানের সঙ্গীদের শাহাদাত / ১৮৯
দোশির এক ভয়ানক রাত / ১৯০
বামিয়ান বিদ্রোহের কারণ / ১৯৪
বামিয়ান / ১৯৬
বামিয়ান জেলে হাজারা শিয়াদের হামলা / ১৯৬
বামিয়ান জেলে তালেবানের উপর শিয়াদের জুলুম / ১৯৭
গরম শলা দিয়ে ছ্যাঁকা দেয়া / ১৯৭
দাড়ির অবমাননা / ১৯৭
মৃত্যুদণ্ডের ভয়ানক পদ্ধতি / ১৯৮
গাড়ির নিচে পিষ্ট করা / ১৯৮
বিরল পদ্ধতি / ১৯৮
আবু জাহেলি চিন্তা-চেতনা / ১৯৯
সাহাবায়ে কেরামের অবমাননা / ১৯৯
তালেবানের আগে হিজবে ওয়াহদাতের জুলুম / ২০০
মৃতের নাচ / ২০১
জাতিসঙ্ঘের ভূমিকা / ২০১
আফগান বর্ডারে ইরানি সৈন্য সমাবেশ / ২০১
ইরানি অনুপ্রবেশের প্রমাণ / ২০২
ইরানি অস্ত্র / ২০৩
পুলখমরি / ২০৩
দাররাহকিয়ান / ২০৪
অস্ত্রের গুদাম / ২০৫
চাকা পাংচার হয়ে গেছে / ২০৫
তাশকরগানে অবস্থান / ২০৬
ঈমানের ডাকাত এবং মালের ডাকাত / ২০৬
হায়রাতান রাজপথ অথবা দোস্তি রাজপথ / ২০৭
মাজার শরীফ / ২০৭
চাররুকের দিকে / ২০৮
কামান্দান দিলাওয়ার জানের মেহমানখানায় / ২০৮
কামান্দান দিলাওয়ার জান / ২০৯

হাজি মুহাম্মাদের ডেরায় / ২০৯
কামাল শহীদ এবং উস্তাদ আতা / ২১০
মাজার শরীফ টু শিবারগান রোডে রেকি / ২১২
মাইন বিছানো / ২১৩
উস্তাদ আতার ধোঁকা / ২১৩
কামাল শহীদের উপদেশ / ২১৪
শহীদি হামলার সিদ্ধান্ত / ২১৪
ফেদায়ীর আগমন / ২১৫
জশনে নওরোজ এবং দোস্তামের অপেক্ষা / ২১৫
উসমান শহীদ রহ. / ২১৬
কান্দাহার প্রত্যাবর্তন / ২১৮
শহীদানের আলোচনা / ২১৮
মোল্লা আব্দুশ শুকুর শহীদ রহ. / ২১৮
খালেদ শহীদ রহ. / ২১৯
খুরশেদ শহীদ রহ. / ২২১
গর্বিত কমান্ডার ভাই সুলতান শহীদ রহ. / ২২২
পয়গামে শুহাদা / ২২৪

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

শুহাদাদের পুণ্যভূমি আফগানিস্তানে জিহাদী সফর

২০০৫ সালের গ্রীষ্মকালের মাঝামাঝি সময়। আফগানিস্তানের কান্দাহার প্রদেশের খাকরিজ জেলার দিকে আমার জিহাদী সফর। প্রথমে আমরা ১৭ জন মুজাহিদ ছিলাম। যাদের মধ্যে ১৩ জন মুজাহিদ আমাদের আগেই চলে গিয়েছিলেন। আমি আরো ৩জন সাথীর সাথে কয়েকদিন পর রওয়ানা হই। আমার সাথে তাজিকিস্তানের মুজাহিদ আজমরে, আফগান মুজাহিদ আব্দুল করিম এবং দাউদ আকা ছিলেন। কোয়েটা থেকে ফজর নামাজের পর রওয়ানা হই। প্রায় দশটার দিকে চমন বর্ডারে পৌছে যাই। বর্ডার ক্রসিংয়ের সময় বিশেষ কোনো সমস্যা হয়নি। তারপর স্পেন বুলদাক স্টেশনে খাবার খাই এবং কান্দাহারের দিকে রওয়ানা হই।

গাড়িতে আমরা সকলেই পৃথক পৃথক ভাড়া দেই। এটি নিরাপত্তার একটি পন্থা ছিলো, যাতে গাড়িতে কোনো ক্রুসেডীয় গুপ্তচর সঠিক তথ্য জানতে না পারে। তাছাড়া তল্লাশি, গ্রেফতার কিংবা অন্য কোনো সমস্যা সামনে আসলে অন্য সাথীরা যেনো নিরাপদ থাকে। আমরা স্পেন বুলদাক থেকে রওয়ানা হওয়ার পর দু'আড়াই ঘণ্টার মধ্যে কান্দাহার পৌছে যাই। আমি কান্দাহারে আরো কয়েকবার এসেছিলাম। এখানে কিছু সময় থেকেও গিয়েছি। কারণ, কান্দাহার হযরত আমিরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর মুজাহিদ দা.বা. এর শহর।

কিন্তু আজ কান্দাহার পেরেশান। কারণ, এর গলিগুলো জনমানব শূন্য। এখানে চলছে ক্রুসেডীয় হায়েনা আর মুনাফিক আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের চরদের দৌরাত্ম্য। এখানকার যুবক যুবতীর মা-বাবারা নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারেন না। কারণ, কান্দাহারের গলিগুলোতে আজ গভর্নর মোল্লা হাসান রহমানীর লাঠিবাহী পহারাদারদের দেখা যায় না। আজ কান্দাহার চিন্তিত। কারণ, এখানে ইনসাফগার তালেবান কাজির স্থানে আজ বসে আছে রক্তচোষা হামিদ কারজাইয়ের ঘুষখোর মন্দাচারী গভর্নর। কিন্তু কান্দাহার তো অপেক্ষমান...

সেই চাটাইয়ে উপবেশনকারী, যিনি ইসলামী ইমারতের প্রধান, মুজাহিদীনের সর্দার এবং উচ্চতর মজলিশে শুরার ইমাম। তিনি আর কেহ নন, আমিরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর দা.বা.। আমি এসব চিন্তায়ই মগ্ন ছিলাম। দাউদ

আকা বললেন, গাড়ি যাওয়ার জন্য প্রস্তুত, আমার সাথে চলুন। আমি চোখের আর্দ্রতা মুছতে মুছতে গাড়িতে উঠে বসলাম। আমরা একটানা তিন ঘণ্টা চলার পর খাকরিজ জেলার চুনার বসতিতে পৌঁছি।

আমাদের উদ্দেশ্য ছিলো, ওই এলাকায় অবস্থানরত ক্রুসেডীয় সৈন্যদের আসা যাওয়া বন্ধ করা। এর জন্য তাদের রাস্তায় মাইন বিছানোর প্রয়োজন ছিলো। রাত প্রায় ৯টার দিকে আমরা চুনার বসতিতে পৌঁছি। আব্দুল করিম তার বাড়িতে চলে যান। তার ঘর চুনার বসতিতেই ছিলো। আমরা নিরাপত্তার খাতিরে সামনের বসতিতে চলে যাই। যার নাম ছিলো 'লুড়াওয়ালা'। আমরা যখন লুড়াওয়ালায় পৌঁছি তখন সেখানকার এক ঘর থেকে আলো বের হচ্ছিলো। আমরা সেই ঘরের দরজায় কড়া নাড়লে বাড়িওয়ালা বের হয়ে আসেন। বাড়িওয়ালা দাউদ আকার পরিচিত লোক। তিনি একজন কিশমিশের ব্যবসায়ী। তিনি বাহিরে এসে আফগানি রেওয়াজ অনুযায়ী আনন্দচিত্তে খোশ আমদেদ জানালেন। সালাম, দোয়া এবং মুয়ানাকার পর আমাদেরকে তার কিশমিশের ঘরে নিয়ে গেলেন। যেখানে ধুমধামের সাথে কিশমিশ বানানোর কাজ চলছিলো। আমরা সেখানে গিয়ে গল্পে মশগুল হয়ে গেলাম। কর্মচারীরা কিশমিশ বানানোর জন্য ছোট ছোট কাঠিতে আঙ্গুর লটকাচ্ছিলো। সাড়ে দশটার দিকে বাড়িওয়ালার ছেলে খাবার নিয়ে এলো। যা ছিলো আফগানি ধাঁচের শানদার খাবার। তাছাড়া খাবারের ক্ষেত্রে আমাদের মেজবান নিজেদের প্রচলিত মেহমানদারিরও পূর্ণ খেয়াল রেখেছিলেন। মেজবানের সাথে আমরা খাবার খেলাম। তারপর মেহমানখানায় গিয়ে ওজু করে এশার নামাজ আদায় করলাম। এরই মধ্যে আমাদের আরামের জন্য বিছানা করে দেয়া হয়। আমাদের মেজবান আমাদের হেফাজতের জন্য একটি রাশিয়ান কালাশনিকভ (একে-৪৭ রাইফেল) নিয়ে এসে বললেন, এটা কাছে রাখো তোমাদের কাজে আসবে। তারপর তিনি অনুমতি চেয়ে চলেগেলেন। আমরা যখন চুনার বসতিতে পৌঁছি তখন আকাশে গোয়েন্দা বিমান চক্কর দিচ্ছিলো।[৪] এজন্যই আমরা চুনার বসতি ছেড়ে লুড়াওয়ালায় চলে এসেছিলাম।

কিন্তু এই গোয়েন্দা বিমান সারা রাত চুনার বসতি, লুড়াওয়ালা এবং আশেপাশের বসতিগুলোর উপর খুব বেশি নিচু দিয়ে উড়াউড়ি করছিলো। গোয়েন্দা বিমান এতো নিচু দিয়ে উড়াউড়ি করছিলো যে, আমরা রাতেও তা খালি চোখে দেখতে পাচ্ছিলাম। এতে আমাদের সন্দেহ এবং শঙ্কা হচ্ছিলো।

---

১. যাকে আমেরিকানরা ড্রোন বিমান এবং আফগানিরা বোঙ্গি বিমান বলে।

এরই মধ্যে দিনভর সফরের ক্লান্তি এবং অর্ধরাত পার হয়ে যাওয়ায় আমাদের উপর ঘুমের বিজয় হয়। আমার সঙ্গীরা ঘুমের জগতে চলে গেলো, আর আমি হারিয়ে গেলাম নিজের চিন্তার জগতে। আমি ভাবছি, এই আমেরিকা প্রকৃতপক্ষে ইসলামী বিশ্বের বিরুদ্ধে ক্রুসেড যুদ্ধ করে যাচ্ছে। কিন্তু আমেরিকা জনগণের স্বাধীনতা, গণতন্ত্রের মুক্তি, নারী স্বাধীনতার শ্লোগান এবং সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের বাহানা করে সত্যিকার ইসলামী হুকুমত ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের উপর সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে হামলা করছে। মূলত তারা গোটা পৃথিবীতে ইসলাম এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে জুলুম ও বর্বরতার বাজার গরম করছে। আফগান থেকে কাশ্মির পর্যন্ত, ইরাক থেকে ফিলিস্তিন পর্যন্ত মুসলমানদের রক্ত পানির মতো সস্তা মনে করে আমেরিকার ইশারায় প্রবাহিত করা হচ্ছে। আবু গরীব কারাগারের ফাতেমা নূর থেকে নিয়ে মুসলিম নারী ড. আফিয়া সিদ্দিকী পর্যন্ত তাদের বর্বরতার শিকার হয়েছে। গোয়ান্তানামু বে থেকে বাগরাম জেল পর্যন্ত, কেল্লায়ে জঙ্গী থেকে শিবারগান জেল পর্যন্ত এবং সিআইএ এর গোপন কারাগার থেকে নিয়ে পাকিস্তানের নিখোঁজ ব্যক্তি পর্যন্ত হাজারো মুসলমান নওজোয়ান আমেরিকা ও তাদের সাঙ্গপাঙ্গদের জুলুমের চাকায় নিষ্পেষিত হচ্ছে। আমেরিকার ইশারায় ইউরোপ-আমেরিকার গৃহপালিত ইসরাইল ট্যাংক ও স্থলবাহিনী দিয়ে ঘেরাও করে গাজাকে এক কয়েদখানায় পরিণত করেছে। সেখানকার বাসিন্দাদের নিকট ইসরাইলী বিমান থেকে বর্ষিত বিধ্বস্ত বোমা ছাড়া খাবার মতো কিছুই নেই।

আমি ভাবছি ৫৭টি ইসলামী দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা এই জুলুমের বিরুদ্ধে কেনো জিহাদের ঘোষণা করছে না? এক মুসলমান মেয়ের ডাকে সিন্ধু বিজেতা মুসলিমের সন্তান পরিচয়দাতারা আজ ফাতেমা নূর, ড. আফিয়া সিদ্দিকী আর অন্যান্য শহীদানের ডাকে কেনো ছটফট করে না। এক খ্রিস্টান নারীর আহ্বানে স্পেন বিজয়ী মুসলমানের অনুসারীরা আজ ক্রুসেডীয় জুলুমের শিকার হাজারো বসতহীন মুসলিম বাচ্চাদের প্রতিরক্ষার জন্য কেনো ময়দানে আসে না? আমি খুব চিন্তার সাথে এর হিসেব নিলাম। মুসলিম প্রশাসকদের আমি ইহুদীদের ঠিক তেমনি রক্ষক পেয়েছি যেমন আব্দুল্লাহ বিন সাবাকে ইহুদীদের অনুসারী পেয়েছি। এরা ইসলামের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত হাকিম বিন জাবালাহ, আশতার মালিক, মুখতার ছাকাফী, হাসান বিন সাব্বাহ, ইবনে আলকমা, নাসীরুদ্দীন তুসী, ফাতেমী শিয়া, মীর জাফর, মীর সাদেক, ইয়াহিয়া খান এবং পারভেজ মোশাররফের আকৃতিতে মুসলমানদের ভিতরে ঘাপটি মেরে আছে।

আমেরিকান হেলিকপ্টারের আগমন

আমার ঘুম এসেছে মাত্র কিছুক্ষণ হলো, ক্রুসেডার হেলিকপ্টারের আওয়াজে আকাশ গর্জে উঠে। আমরা দ্রুত জেগে উঠি এবং অবস্থা পর্যবেক্ষণ করি। তখন ছিলো সেহরীর সময়। কিছুক্ষণ পরই ফজরের আযান শুরু হয়ে যায়। ফজরের নামাজ আদায় করে চিন্তা করলাম, যদি আমেরিকানরা নিচে নেমে আসে তাহলে অবশ্যই তল্লাশি হবে। আমরা ৩ জন। কিন্তু লড়াইয়ের জন্য কালাশনিকভ মাত্র একটি। যা দিয়ে আমরা বেশিক্ষণ লড়তে পারবো না। সুতরাং এটি লুকিয়ে ফেলাই উত্তম। আমরা দ্রুত কালাশনিকভটিকে শীতের সময় জ্বালানোর জন্য স্তুপ করে রাখা ঘাসের ভিতর লুকিয়ে ফেললাম। তারপর মেজবানকে ডাকলাম। তিনি হেলিকপ্টার আসার কারণ জানতে চাইলেন। আমরা আমাদের নিজেদের শঙ্কা প্রকাশ করে বললাম, কোনো সংবাদের ভিত্তিতে আসেনি তো? আমাদের মেজবান হেলিকপ্টার চক্কর দেয়ার সুনির্দিষ্ট কারণ তো বলতে পারলেন না, কিন্তু শানদার একটি পরামর্শ দিলেন। তিনি বললেন, আপনারা তিনজনই আঙ্গুরের বাগানে চলুন। যদি কেউ জিজ্ঞেস করে তাহলে আমরা বলবো তারা আমার মজদুর। মজদুরি করতে এখানে এসেছে। এতে তোমরা আমেরিকানদের থেকেও নিরাপদ হয়ে যাবে সেই সাথে আশপাশের বসতিবাসী থেকেও। কোনো ক্রুসেডীয় গোয়েন্দাও তোমাদের আশেপাশে আসতে পারবে না।

আঙ্গুর বাগানের দিকে রওয়ানা

আমরা উড়ন্ত হেলিকপ্টারের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছিলাম, এরই মধ্যে আমাদের নাশতা এসে যায়। আমরা নাশতা করে মেজবানের সাথেই আঙ্গুর বাগানের দিকে রওয়ানা হই। রাস্তায় আমরা আমাদের সেই ১৩ সাথীর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম যারা কয়েকদিন আগে কোয়েটা থেকে এসেছে। আমাদের মেজবান বললেন, তাদের ব্যাপারে আমার কাছে কোনো তথ্য নেই। কিন্তু তিনি এই সান্ত্বনা দিলেন যে, কিছুক্ষণের মধ্যে আমি তাদের সংবাদও নিয়ে নেবো।

আমাদের এতটুকু জানা ছিলো যে, তারা এই এলাকাতেই আছে, কিন্তু কোথায় আছে তা জানতাম না। তবে পেরেশান হচ্ছিলাম এ জন্য যে, আকাশে উড়ন্ত আমেরিকান হেলিকপ্টার এবং গোয়েন্দা বিমান যেটি রাতে ওড়াউড়ি করছিলো, সেটি না আবার তাদের কোনো সংবাদ অথবা ছবি সংগ্রহ করে ফেলেছে। এরই মধ্যে আমরা আঙ্গুর বাগানে পৌছে গেলাম এবং মেজবানসহ সকলেই আঙ্গুর ছিঁড়তে ব্যস্ত হয়ে গেলাম। আমরা তিনজন যদিও আঙ্গুর খাচ্ছি আর গোটা বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছি, কিন্তু আমাদের পূর্ণ মনোযোগ বসতি এবং তার আকাশে

উড়ে বেড়ানো ক্রুসেডার হেলিকপ্টারের উপর। যেটি কারো উপর সন্দেহ হলেই নিচে নেমে তল্লাশি নেয় এবং সওয়াল জওয়াবও করে, তোমরা তালেবান নও তো?

এগারোটার দিকে বড় দু'টি আমেরিকান হেলিকপ্টার[১] আকাশে চক্কর দিতে থাকে। কিছুক্ষণ পরই সেগুলোর একটি সামনের পাহাড়ে এবং অপরটি নিচে নেমে আসে। সেই সাথে আগের হেলিকপ্টারগুলোও আকাশে চক্কর দিতে থাকে। ক্রুসেডার আমেরিকানরা আকাশপথ এবং স্থলপথ ঘেরাওয়ের পর এলাকায় তল্লাশি শুরু করে। আমরা খুবই পেরেশান ছিলাম; আল্লাহ না করুন ঘেরাও যদি আমাদের সাথীদের উপর হয়ে থাকে আর তারা ঘেরাওয়ের ভিতরে থাকে! তাই আমরা তিনজনই আল্লাহর দরবারে সাথীদের হেফাজতের জন্য কায়মনোবাক্যে দোয়া করছিলাম। আমেরিকান ক্রুসেডাররা এক ঘণ্টা তল্লাশি চালানোর পর ফিরে যায়। এরই মধ্যে মেজবানের বাড়ি থেকে দুপুরের খাবার চলে আসে। আমরা দুপুরের খাবার খেলাম এবং বাগানস্থ কূপ থেকে ঠাণ্ডা পানি পান করলাম। তারপর ওজু করে যোহরের নামাজ আদায় করে সাথীদের জন্য আল্লাহ তায়ালার দরবারে খুব কান্নাকাটি করে দোয়া করলাম।

মোল্লা মিলাঙ্গের সাথে সাক্ষাৎ

আমরা যোহর নামাজ আদায় করার পর জানতে পারলাম, তালেবান জিম্মাদার মোল্লা আব্দুশ শুকুরের ভাই মোল্লা মিলাঙ্গ নিকটবর্তী বসতিতে এসেছেন। আমরা মোল্লা মিলাঙ্গকে সংবাদ পাঠালাম। তিনি সংবাদ পেয়েই আমাদের সাথে দেখা করতে আঙ্গুর বাগানে চলে এলেন। মোল্লা মিলাঙ্গ আমাদের সাথে খুবই আগ্রহের সাথে সাক্ষাৎ করলেন। আমরা তৎক্ষণাৎ আমাদের পেরেশানি প্রকাশ করে সাথীদের ব্যাপারে জানতে চাইলাম। তিনি সংক্ষিপ্ত জবাব দিলেন, তারা ভালই আছেন। এতে আমরা নিশ্চিন্ত হলাম। তারপর মোল্লা মিলাঙ্গ বিস্তারিত অবস্থা বর্ণনা করে বলেন, কমান্ডার মোল্লা আব্দুশ শুকুর ব্যস্ততার কারণে পিছনে রয়ে গেছেন। এখন আমিই এই এলাকার জিম্মাদার। দ্বিতীয় বার আমি তার নিকট আমাদের সাথীদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, যেই পাহাড়ের উপর আমেরিকান চিনুক নেমেছিলো তার কোলেই একটি বাড়ি আছে। সেটি বসতির বাহিরে অবস্থিত। এর মালিক এক বড়লোক। সেই বাড়ির সাথে একটি মসজিদ এবং তার সামনে খুব সুন্দর একটি বাগান আছে। যার আশেপাশে আমাদের মেজবান প্রশস্ত ফসলের ক্ষেত করে রেখেছেন। আমরা ১৩ সাথী

---

১. যেগুলোকে আমেরিকানরা চিনুক হেলিকপ্টার বলে।

রাতে সেই মসজিদে কাটিয়েছি এবং সকল সাথী রাতে পালাক্রমে পাহারা দিয়েছি।

এলাকায় তল্লাশি

সকাল সকাল মুজাহিদীন নিজেদের আগামী সফরের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। কিছু সাথী তাহাজ্জুদ নামাজে মশগুল ছিলেন। এরই মধ্যে আকাশে আমেরিকান হেলিকপ্টার চক্কর দিতে থাকে এবং তারা এলাকা তল্লাশি শুরু করে দেয়। মুজাহিদীন নিজেদের প্রোগ্রাম অনুযায়ী সকাল সকাল রওয়ানা দেয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলো। তল্লাশি শুরু হতে দেখে তারা পরামর্শ করলো, আমরা এই এলাকাতে এসেছি দু'তিন দিন হলো, যারফলে এলাকা সম্পর্কে ধারণা কম। তাছাড়া অস্ত্রও অল্প, তাই যুদ্ধ না করাই ভালো হবে। অল্পসংখ্যক যে অস্ত্র আছে তা লুকিয়ে ফেলা হোক। অন্যথায় আমাদের সাথে স্থানীয় জনগণও আমেরিকানদের জুলুমের শিকার হবে।

সুতরাং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সাথীরা মোল্লা মিলাঙ্গকে তৎক্ষণাৎ বের হয়ে যেতে বললেন। সাথীরা বলল, আমরা গ্রেফতার হলেও আপনি অন্যান্য সাথীদের নিয়ে কাজ চালু রাখতে পারবেন। সকল সাথী পাহাড়ের অপর পাশে চলে গেলেন। সেদিকে বড় বড় পাথর এবং ঝোপ ঝাড় রয়েছে। এরই মধ্যে সাথীরা অস্ত্রগুলো জমা করে গাধার উপর উঠালো এবং এক সাথী আকবরকে বললেন, এগুলো নিকটবর্তী বসতিতে পৌছে দিন। প্রথমবার সে অন্ধকারের মধ্যেই বসতিতে অস্ত্র পৌছে দিয়ে চলে আসে।

খোদায়ী মদদের অবাক করা কাহিনী

আকবর যখন দ্বিতীয়বার অস্ত্র নিয়ে যাচ্ছিলেন তখন অনেক আলোকিত হয়ে গিয়েছিলো। আকবর তখনো বসতিতে পৌছেননি। এরই মধ্যে আমেরিকান হেলিকপ্টার তার মাথার উপর পৌছে যায়। এবার বাঁচার বাহ্যিক সরঞ্জাম তো কিছুই নেই। তিনি ছিলেন খোলা ময়দানে, যেখানে লুকানোর কোনো জায়গাও নেই। পর্যাপ্ত পরিমাণ অস্ত্র গাধার পিঠে স্তুপ করা আছে। হেলিকপ্টার মাথার উপর চক্কর দিচ্ছে। এরই মধ্যে হেলিকপ্টার থেকে সৈন্যরা আকবরকে থামতে ইশারা করলো। আকবর থেমে গেলেন। আমেরিকানরা হেলিকপ্টার নিচে অবতরণ করালো। যখন হেলিকপ্টার নিচে নামলো তখন হেলিকপ্টারের চারপাশে ধূলার তুফানে আকাশ ছেয়ে যায়। এতে গাধা ভয় পেয়ে বসতির দিকে পালিয়ে যায়। তখনই হঠাৎ আকবর লক্ষ্য করলেন তার একদম নিকটে শাহতুত

গাছ রয়েছে। সেটি উপর থেকে আড়াআড়িভাবে কাটা। আনুমানিক তা চারফুট উঁচু হবে। বসন্তকাল হওয়ায় তার অনেক ডালপালা এবং পাতা গজিয়েছে। আকবর দৌড়ে লাফ দিলো এবং তার ডালপালার ভিতরে লুকালো। ঘন ডালপালা থাকার কারণে নিচ থেকে কিছুই দেখা যাচ্ছিলো না।

যখন ধুলোবালির ঝড় থেমে গেলো এবং আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেলো, তখন আমেরিকানরা হেলিকপ্টার থেকে নেমে সেখানে না কোনো গাধা পেলো, না কোনো মানুষ। তারা অনেক খোঁজাখুঁজি করেও অস্ত্রবাহী গাধা এবং আকবরের কোনো হদিস পেলো না। আমেরিকানদের দেমাগ হয়রান হয়ে গেলো, দু'টি প্রাণীকে জমিন গিলে ফেলেছে নাকি আসমান খেয়ে ফেলেছে? আকবর শাহতুতের ঘন গাছে বসে নিজের চোখে কুফর, শিরক, জুলুম এবং একনায়কতন্ত্রের ঝাণ্ডাবাহীদেরকে অপদস্ত হয়ে মাটি চাটতে দেখছিলেন। সেই সাথে অন্তরে হিজরতের রাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফেরদেরকে অন্ধ করে মদীনা রওয়ানা হওয়ার ঘটনার উপর অবতীর্ণ আল্লাহ তায়ালার নুসরতের স্বাদও নিচ্ছিলেন। ভাবছিলেন, হিজরত এবং জিহাদের আঁচল রহমতের সাথে বাঁধা। আজ আকবরও মুহাজির এবং মুজাহিদ। রব্বুল আলামীনের রহমতকে নিজের চোখে তিনি অবতীর্ণ হতে দেখছিলেন। এর জন্য তিনি নিজের রবের শুকরিয়া আদায় করছিলেন এবং পুনরায় শান শওকতের সাথে ইসলামকে নবায়ন করে ইসলাম কায়েমের জন্য দোয়া করছিলেন। গাধা যখন বসতিতে ঢুকলো তখন সেখানকার লোকেরা অস্ত্রশস্ত্র নামিয়ে গোপন করে রাখে এবং গাধাকে বসতি থেকে বের করে দেয়। ক্রুসেডার আমেরিকানরা অল্প কিছুক্ষণ তালাশ করার পর ফিরে গেলো। তখন আকবর সহীহ সালামতে বসতিতে পৌছে গেলেন।

মোল্লা আব্দুর কাদীর ও খোদায়ী মদদ

কমান্ডার মোল্লা মিলাঙ্গ বললেন, তিনি নিরাপদ জায়গায় দাঁড়িয়ে হেলিকপ্টারের ওড়াউড়ি, পাহাড়ে অবতরণ এবং খোলা ময়দানে অবতরণের দৃশ্য নিজ চোখে দেখছিলেন। তিনি বলেন, ক্রুসেডাররা তালাশ করতে করতে সে জায়গায় পৌছে গিয়েছিলো যেখানে সাথীরা লুকিয়ে ছিলো। সাথীদের লুকানোর বিশেষ কোনো জায়গা ছিলো না। কেবল পাথর আর ছোট ঝোপঝাড় ছিলো। আমেরিকানরা খুব মনোযোগ দিয়ে তালাশ করছিলো। ঠিক তখনই খোদায়ী মদদের এক আজব কাহিনী মোল্লা আব্দুল কাদীরের সাথে ঘটে যায়। মোল্লা আব্দুল কাদীর পার্শ্ববর্তী বসতি তাম্বিলের বাসিন্দা ছিলেন। তিনি তল্লাশির সময় বিলকুল

পরিষ্কার ময়দানে বসা ছিলেন। তার নিকট লুকানোর মতো কোনো জায়গা ছিলো না। এমনকি কোনো পাথর, ঝোপঝাড় এবং কোনো গাছও ছিলো না। কফি বানানোর কেতলি মোল্লা আব্দুল কাদীরের একদমই সামনে পড়েছিলো। আমেরিকানরা তল্লাশি করতে করতে তার একদমই নিকটে পৌছে যায়। তিনি এক আমেরিকান সৈন্যকে তার দিকে আসতে দেখেন। সৈন্যটি একদম সোজা চলে তার দিকেই আসছিলো। ডানে বামেও খুব মনোযোগের সাথে দেখছিলো। তার হাতে লোড করা আমেরিকান গান ছিলো, যার উপর দূরবীণও লাগানো ছিলো। সে সোজা মোল্লা আব্দুল কাদীরের চারফুট দূরে এসে ডানে বামে দেখে চলে যায়। এটি কেবলই আল্লাহ তায়ালার রহমত এবং মদদ ছিলো যে, বাদামী চামড়া আর কালো কাজকর্মওয়ালা আমেরিকান চারফুট দূর থেকেও মোল্লা আব্দুল কাদীরকে দেখতে পায়নি। মোল্লা মিলাঙ্গ বলেন, এগুলো সেসব কাহিনী ও খোদায়ী মদদেরই বহিঃপ্রকাশ, মুজাহিদীন যেগুলোর মাধ্যমে ক্রুসেডারদের সম্মিলিত বাহিনীকে নাকানি-চুবানি খাওয়াচ্ছে এবং সরঞ্জামহীনতার দুনিয়ায়ও বিশ্ব কুফরের মোকাবিলায় অটল হয়ে আছে। মোল্লা মিলাঙ্গ নিজের অবিচলতা দ্বিতীয়বার প্রকাশ করে বলেন, যদি আল্লাহ তায়ালার মদদ আমাদের সাথে থাকে তাহলে আমরা খুব দ্রুতই বিশ্ব কুফর এবং সম্রাজ্যবাদীর ধ্বজাধারীদেরকে শুহাদাদের পুণ্যভূমি থেকে পালাতে বাধ্য করবো ইনশাআল্লাহ।

মুজাহিদীনের গ্রেফতার ও মুক্তি

আমেরিকানরা দুপুর একটা পর্যন্ত তল্লাশি চালিয়ে ঘেরাও উঠিয়ে নেয় এবং তল্লাশি শেষ করে চলে যায়। এরপর সাথীরা যখন একত্রিত হলো তখন জানা গেলো তারা যাওয়ার সময় আব্দুল্লাহ এবং আছমতুল্লাহ নামের আমাদের দু'জন সাথীকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। তাদেরকে আমেরিকানরা কান্দাহার বিমানবন্দরে নিয়ে গেছে। সেখানে তাদেরকে তিনদিন পর্যন্ত আমেরিকানরা জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং নির্দোষ প্রমাণিত হওয়ায় তাদেরকে ছেড়ে দেয়। ফিরে আসার ভাড়াও তাদেরকে দিয়ে দেয়। যখন তারা আমাদের কাছে পৌছে তখন তারা বলল, আমরা আমেরিকানদেরকে বলেছি আমরা শিকারী। কান্দাহার থাকি। মাছরাঙ্গা শিকার করতে এসেছিলাম। দু'জনই তিনদিন যাবত তাদেরকে এই কাহিনী শোনাতে থাকি। বাড়ির মালিককেও গ্রেফতার করা হয়েছিলো। সেও আমাদেরকে চিনে না বলে সাফ জানিয়ে দিলো, আমি তাদেরকে কোথাও দেখিনি, আমার নিকট কোনো তালেবানও আসেনি। বাড়ির মালিককে আমেরিকানরা ছয় মাস পর মুক্তি দেয়। এর কারণ, আমেরিকানদের নিকট তার

বাড়ির ওই ছবি ছিলো, যাতে তালেবানরা তার ঘরে খাবার খাচ্ছিলো। কিন্তু সেটা অস্পষ্ট ছবি ছিলো। খাবাররতদের চেহারা বুঝা যাচ্ছিলো না। শুধু মানুষজন আছে সেটাই বুঝা যাচ্ছিলো। তারা সেটা তদন্ত করেছিলো। কিন্তু বাড়ির মালিকের অস্বীকৃতি এবং প্রমাণ না পাওয়ায় তাকে নির্দোষ বলে ছেড়ে দেয়।

এলাকা রেকি[৬] ও দায়িত্ব বণ্টন

এলাকা কিছুটা শান্ত হলে আমি, আজমরে (তাজিকিস্তানি) এবং দাউদ আকা সবাই মোল্লা মিলাঙ্গের সাথে আমাদের বাকি ১৩ সাথীর নিকট আসি। তারা আমাদেরকে আন্তরিক অভিনন্দন জানান। আমরা তাদের থেকে গতরাতের সংক্ষিপ্ত কারগুজারি শুনি এবং তাদের অবিচলতার জন্য দোয়া করি। এবার আমরা এলাকায় অবস্থানরত সকল ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে কাজ শুরু করার ব্যাপারে পরামর্শ করি। অবশেষে সিদ্ধান্ত হলো, এলাকা সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা নেয়া হবে এবং নিজেদের যুদ্ধের সরঞ্জাম প্রস্তুত করা হবে। সন্ধ্যা নাগাদ ওয়ারলেস সেট, রিমোট কন্ট্রোল, ব্যাটারি সেল, এন্টি-ট্যাংক মাইন ইত্যাদি জিম্মাদারগণ থেকে সংগ্রহ করা হয়। আর এলাকা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া গেলো, এলাকার মোট তিনটি রাস্তা আমেরিকানরা যাতায়াতের জন্য ব্যবহার করে। সুতরাং সে অনুযায়ী সাথীদেরকে প্রস্তুত করা হলো। কান্দাহার টু উর্জেগান রোডে আকবর ও সাঈদ মল, চুনার টু কান্দাহার রোডে আজমরে, সাঈদ জান, দাউদ আকা ও আব্দুল কাদীর এবং চুনার টু হেলমন্দ রোডে আজিজুর রহমান, রমজান (ইস্টেন গর) এবং মোল্লা মুহাম্মাদ কাসেমকে প্রস্তুত করা হয়।

আমেরিকানদের উপর প্রথম আঘাত

প্রস্তুতির পর সকল সাথী নিজ নিজ এলাকার দিকে রওয়ানা হয়ে যায়। আমি আমার সাথীদের সাথে কান্দাহার টু উর্জেগান রোডে মাইন ফিট করি। কিন্তু তিনদিন অপেক্ষা করার পরও এই রোডে কোনো সেনা কনভয় যাতায়াত করেনি। আমরা আমাদের কাজ শেষ করে পাহাড়ের উপর থেকে দূরবীণ দিয়ে দুশমনের যাতায়াত পর্যবেক্ষণ করতে থাকি। নামাজও উপরেই আদায় করি। আমাদের খাবারও আমাদের এলাকার সাথী উপরে নিয়ে আসেন। কিন্তু এই

---

৬. তথ্য সংগ্রহের জন্য টহল দেয়া বা ঘোরাফেরা করা।

রাস্তা দিয়ে কোনো সেনা কনভয় যাতায়াত করেনি। এরই মধ্যে আমাদের তাজিকিস্তানি সাথী আজমরে আমাদের সাথে যোগাযোগ করে এবং আমাদেরকে তাদের কাছে আসার দাওয়াত দেয়। আমি আমার সাথী আকবর ও সাঈদের সাথে আজমরের এলাকার দিকে রওয়ানা হই। যখন তার কাছে পৌঁছি তখন সেখানকার অবস্থা আমাদের এখানকার মতোই ছিলো। সেও রোডে মাইন ফিট করে আমেরিকান সেনা কনভয়ের অপেক্ষা করছিলো। তখন পর্যন্ত সম্মিলিত বাহিনীর কোনো কনভয় সেখান দিয়ে যাতায়াত করেনি। আজমরে অসন্তুষ্ট হয়ে বলল, এই অব্যবহৃত রোডে মাইন পুঁতে অপেক্ষা করা আর সময় নষ্ট করা একই কথা। কিন্তু আমিরের আনুগত্যের কারণে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করতে রাজি। যদিও আমার ব্যক্তিগত ইচ্ছা হেলমন্দ টু চুনার রোডে আমেরিকানদের শিকার করা।

আল্লাহ তায়ালা আজমরেকে অবিচলতা দান করেন এবং তার দীলি তামান্না পূর্ণ হয়। হঠাৎ আমাদের ওয়ারলেস সেটে আমেরিকান কনভয় চুনার থেকে কান্দাহারের দিকে রওয়ানা হওয়ার সংবাদ আসে। আজমরে দূরবীণ নিয়ে পাহাড়ের উপর উঠে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে লাগলো। কিন্তু কোনো কনভয় অথবা অস্বাভাবিক কোনো কিছু তার দৃষ্টিতে আসছে না। এরই মধ্যে কমান্ডার মোল্লা মিলাঙ্গের সাথেও সাক্ষাৎ হয়। তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। দু'জন খাবার আনতে চলে যায়। রাত কাটানোর জন্য পাহাড়ে খোঁজ নিলে একটি বড় গর্ত পেয়ে যাই, যাতে কমপক্ষে দশজন সাথীর জায়গা হবে। অতিরিক্ত অস্ত্রশস্ত্র গর্তে নিরাপদে রেখে মাগরিবের নামাজ আদায় করি। আজমরে মনে করিয়ে দিলো আমি নিচে যে এ্যান্টি ট্যাংক মাইন ফিট করেছি তার ব্যাটারি সেল চারদিন আগে লাগিয়েছি। আমি ভাবলাম, যদি ব্যাটারি সেলের দুর্বলতা অথবা নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে অভিযান ব্যর্থ হয়ে যায়! সুতরাং আজমরেকে সাথে নিয়ে মাইনের জায়গায় চলে গেলাম। রাস্তায় সুনসান নীরবতা। না কোনো ফৌজি গাড়ি চলছে, না কোনো পাবলিক গাড়ি। আমি আজমরেকে পাহারায় নিযুক্ত করে মাইনের ব্যাটারি সেল পাল্টাতে লাগলাম। ব্যাটারি সেল পরিবর্তন করে টার্গেট ঠিক করার নিদর্শনের দিকে খেয়াল করলাম। সেগুলো স্পষ্ট ছিলো না। আমরা দু'জন মিলে সেগুলো ঠিক করে ফিরে এলাম।

বড় গর্তের নিকট আমাদের সাথী মোল্লা মিলাঙ্গ, সাঈদ জান, সাঈদ মল, দাউদ আকা এবং মোল্লা আব্দুল কাদীর সবাই উপস্থিত ছিলেন। সবাই মিলে নামাজ আদায় করলাম। তারপর রাতে পাহারার পালা ঠিক করে খাবার খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। শোয়ার আগে মোল্লা মিলাঙ্গ বললেন, আমাকে ভোর ৪টায় উঠিয়ে

দিও। আমার নিকট ডিজিটাল রেডিও ছিলো, আমি তাতে ভোর চারটার এ্যালার্ম দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। ভোর ৪টায় এ্যালার্ম বাজলে আমি মোল্লা মিলাঙ্গকে জাগিয়ে দেই। তিনি জাগ্রত হয়ে বাইরে এলেন এবং একদিকে চলে গেলেন। সাথীদেরকে ফজর নামাজের জন্য জাগালাম। সবাই ওযু করে একসাথে জামাতের সাথে ফজর নামাজ আদায় করলাম। নামাজের পর সাঈদ মল এক জরুরি কাজে চুনার বসতিতে চলে যান। সকলে রাতে বেঁচে যাওয়া শুকনো রুটি আর কফি দিয়ে নাশতা সেরে নেই এবং আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের শুকরিয়া আদায় করি। আমরা গতকালের সংবাদের ভিত্তিতে এলাকা পর্যবেক্ষণ করি। নিজেদের পূর্ণ মনোযোগ রাস্তার উপর রেখে আমেরিকান কাফেলার অপেক্ষা করতে থাকি। মোল্লা আব্দুল কাদির এবং দাউদ আকা দশটার দিকে বললেন, আমাদের খুব খিদে পেয়েছে। আমরা পার্শ্বের বসতি থেকে খাবার নিয়ে আসি। তারা অস্ত্রশস্ত্র আমাদের নিকট রেখে খাবার আনতে বসতির দিকে চলে যান।

আমরা আমাদের কমান্ডার মোল্লা মিলাঙ্গের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করি। কিন্তু তার ওয়ারলেস সেট বন্ধ ছিলো। আমরা ভাবলাম সে চুনার বসতির বাসিন্দা, তাই হয়তো কোনো কাজে চুনার বসতিতে চলে গেছেন। এ জন্যই হয়তো তার ওয়ারলেস সেট বন্ধ। তখন আমি, আজমরে এবং সাঈদ জান এই তিনসাথী মোর্চায় অবস্থিত ছিলাম। আমরা তিনজনই মোর্চার সামনের অংশে বসেছিলাম। সময়টা খুব বন্ধুত্বের মনে হলো। গল্প গুজব চলছে। কিন্তু আমাদের দৃষ্টি রোডের উপর ছিলো। এরই মধ্যে চুনার বসতির দিক থেকে হঠাৎ তিনটি হেলিকপ্টার দেখা গেলো। আমরা তিনজন তৎক্ষণাৎ পাথরের আড়ালে লুকিয়ে গেলাম। হেলিকপ্টার আমাদের উপর দিয়ে উড়তে উড়তে কান্দাহারের দিকে চলে গেলো। আমরা পুনরায় আমাদের জায়গায় এসে বসলাম। কথাবার্তা, হাসি-ঠাট্টা এবং গল্পগুজব আবার শুরু হয়ে গেলো। এরই মধ্যে আজমরে রোডের উপর মেটে রঙের একটি গাড়ি দেখলো। সে সন্দেহ করলো হতে পারে এটা ক্রুসেডারদের সম্মিলিত বাহিনীর গাড়ি। সে দূরবীণ লাগিয়ে রাস্তার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে লাগলো। সে আনন্দে নাড়ায়ে তাকবীর বলে উঠলো এবং বলল, আমি দূরবীণ দিয়ে ক্রুসেডার সম্মিলিত বাহিনীর কাফেলা আমাদের দিকে আসতে দেখছি। তাতে ক্রুসেডারদের ৬টি ট্যাংক এবং একটি ফৌজি ট্রাক রয়েছে।

আমি আজমরের নিকট ফৌজি কাফেলা আসার কথা শুনে তৎক্ষণাৎ মোর্চাতে এলাম। ওয়ারলেস সেটের ব্যাটারি সেল পরিবর্তন করলাম এবং রিমোট কন্ট্রোল এ্যান্টি ট্যাংক মাইনের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলাম। যা থেকে আমাদের দূরত্ব

আনুমানিক এক কিলোমিটার ছিলো। আজমরে দূরবীণ দিয়ে ক্রুসেডার কনভয়ের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছিলো। সে বলল, কনভয় পুরোটাই আমেরিকান ফৌজের। এতে একটি ফৌজি ট্রাক রয়েছে, যাতে প্রায় পঁচিশ জন সৈন্য আছে। আমরা এটিকে টার্গেট করলাম। ইতোমধ্যে সাঈদ জান অস্ত্রশস্ত্র গর্তে লুকিয়ে ফেলে। ততক্ষণে আমেরিকান কাফেলা আমাদের পুঁতে রাখা মাইনের একদমই নিকটে চলে আসে। আজমরে দূরবীণ ঠিক করে বলল, আমি যখন সুবহানাল্লাহ বলবো তখনই আপনি রিমোট কন্ট্রোলের বাটন চাপবেন। আমি وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ পড়লাম এবং আজমরে সুবহানাল্লাহ বলতেই বাটন চেপে দিলাম। সাথে সাথেই এক বিকট শব্দে বিস্ফোরণ ঘটলো। ধোঁয়া এবং মাটির কালো মেঘের মধ্যে ফৌজি ট্রাক আকাশে উড়ে যেতে দেখা গেলো। যার কেবিন দু'টুকরো হয়ে একটা অংশ আকাশে উড়ে রাস্তার অপর পার্শ্বে উল্টে যায়। সকল ক্রুসেডার ফৌজ তার আওতায় এসে যায়। আল্লাহ তায়ালা আপন ফজল ও করমে আমাদেরকে এতো বড় অভিযান চালানোর তাওফিক দান করেছেন। আমরা এই জায়গাটা এ জন্যই নির্বাচন করেছিলাম, যাতে দুশমনের বেশি থেকে বেশি ক্ষতি হয়। এই নির্দয় মরু-বিয়াবান পাহাড়ি এলাকায় ক্রুসেডারদের এমন পরিণতি দেখে প্রশান্তি হচ্ছে। গোয়ান্তানামু বে আর আবু গরীব কারাগারের আহ! এবং ডুকরে উঠা কান্নার প্রতিশোধ নেয়ার স্পৃহায় প্রলেপ মিলেছে। অন্তর শীতল হয়েছে। এর আলোচনাই আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত কুরআন মাজিদে করেছেন–

قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ.

লড়াই কর তাদের সাথে, যাতে আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদেরকে শাস্তি দেন এবং অপদস্ত করেন। আর তোমাদেরকে তাদের উপর বিজয়ী করে মুমিনদের অন্তরকে শীতল করেন। *[তাওবা ৯ : ১৪]*

নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে

আমেরিকানদের ট্রাক ধ্বংস এবং ক্রুসেডার বাহিনীর মৃত্যু নিশ্চিত হবার পর তৎক্ষণাৎ নিজেদের সরঞ্জাম গুছিয়ে ফেলি এবং নিরাপদ আশ্রয়ের দিকে রওয়ানা হই। এই জায়গা থেকে বের হওয়ার জন্য আমাদের নিকট ১০-১৫ মিনিট সময় ছিলো। কারণ, এখানে যেকোনো সময় ক্রুসেডারদের হেলিকপ্টার এসে যেতে পারে এবং তল্লাশি হতে পারে।

আমি দূরবীণ নালার মধ্যে লুকিয়ে ফেলি এবং ওয়ারলেস সেট নিজের কাছে রাখি। যাতে এর মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারি। সেই নালা দিয়ে চলতে চলতে যখন আমরা বাইরে এলাম তখন সামনে একটি বড় বাড়ি দেখতে পেলাম, যার বাইরে একজন সাদা দাড়ি ওয়ালা মুরুব্বি দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমরা তার নিকট তাম্বিল বসতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি সামনের দিকে ইশারা করে বললেন ওই যে সামনের বসতি-ই তাম্বিল। আমার সাথে আজমরে এবং সাঈদ জান মুরুব্বীকে শুকরিয়া জানালো এবং তাম্বিল বসতির দিকে ছুটলো। চুনার বসতির দিকে না যাওয়ার কারণ, সেখানে গ্রেফতার হওয়ার ভয় রয়েছে। আমরা ভাবলাম তাম্বিলে দাউদ আকার বাড়ি আছে। সেখান থেকে ধারণা নিয়ে আমরা নিরাপদ জায়গায় চলে যেতে পারবো।

যখন আমরা তাম্বিল বসতিতে পৌঁছলাম তখন গোটা বসতি ধোঁয়া ওঠা জায়গার দিকে তাকিয়ে ছিলো। যেখানকার আকাশে হেলিকপ্টার চক্কর দিচ্ছিলো। আমরা রাস্তাতেই দাউদ আকার ভাইকে পেয়ে গেলাম। সে আমাদেরকে বসে চা-নাশতার দাওয়াত দিলো। আমি মানা করে বললাম, আমাদেরকে এই এলাকা থেকে দূরে কোনো নিরাপদ এলাকার ঠিকানা বলুন। আমরা এই এলাকা সম্পর্কে অবগত নই। দাউদ আকার ভাই বললেন, আপনারা উসমানিয়া বসতিতে চলে যান। সেখানে কমান্ডার মোল্লা আব্দুশ শুকুরের বন্ধু আব্দুর রহমান থাকেন। তিনি সবেমাত্র শিবারগান জেল থেকে মুক্তি পেয়ে এসেছেন। আপনারা তিনজনই সেখানে চলে যান। তিনি আরো বললেন, রাস্তায় যদি কেউ আপনাদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে তাহলে বলবেন, আমরা আব্দুর রহমানের মজদুর। কারণ, সে ইদানীং কূপ খনন করছে।

আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আমরা আব্দুর রহমানকে কিভাবে চিনবো? আমরা তো তার ব্যাপারে কিছুই জানি না। তিনি বললেন, আব্দুর রহমানের সবচেয়ে বড় নিদর্শন হলো, তার জামার বুকের প্লেট আংটাযুক্ত হবে। উসমানিয়া বসতিতে একমাত্র আব্দুর রহমানই আংটাওয়ালা জামা পরিধান করে। আমরা দাউদ আকার ভাইকে শুকরিয়া জানিয়ে উসমানিয়া বসতির দিকে রওয়ানা হয়ে গেলাম। ১৫ মিনিট পায়ে হাঁটার পর যখন আমরা মেইন রোডে উঠলাম তখন দেখতে পেলাম একটি ট্রাক্টর ট্রলি আমাদের দিকে আসছে। সেটি একজন সাদা দাড়িওয়ালা বৃদ্ধ চালাচ্ছেন। চেহারা দেখে তাকে একজন মুত্তাকী লোক মনে হচ্ছিলো। আমরা তাকে থামতে ইশারা করলাম। তিনি থামলে আমরা তাকে জিজ্ঞেস করলাম কোথায় যাচ্ছেন? তিনি জবাব দিলেন উসমানিয়া বসতিতে

যাচ্ছি। আমরাও সেখানে যাচ্ছিলাম। বাহন মিলে যাওয়ায় আমাদের চেহারায় হাসি ফুটে উঠলো।

আমি, আজমরে এবং সাঈদ জান ট্রলির উপর আরোহন করলাম। সাঈদ জান ট্রাক্টর ওয়ালা বাবাজিকে জিজ্ঞেস করলেন এই বিস্ফোরণের আওয়াজ কোত্থেকে আসছে? তিনি উত্তর দিলেন, তালেবানরা ওত পেতেছিলো, তারা আমেরিকানদের উপর হামলা করেছে। যার ফলে ৩টি গাড়ি জ্বলে যাওয়া এবং কয়েক ফৌজ মরে যাওয়ার সংবাদ এসেছে। মুরুব্বীর কথা অনুযায়ী এখনো সেখানে তুমুল লড়াই চলছে। আল্লাহ তায়ালার খেলা, আমাদেরই হামলা আমাদের কাছে বাড়িয়ে বর্ণনা করা হচ্ছিলো। রাস্তায় দু'জন লোক ট্রলি থামাতে ইশারা করলে ড্রাইভার গাড়ি থামালেন। অপরিচিত লোক দু'টি আমাদের দিকে ইশারা করে জিজ্ঞেস করলো এরা কারা? ড্রাইভার বললেন, ওরা আব্দুর রহমানের মজদুর। উসমানিয়া বসতিতে আব্দুর রহমানের কূপ খনন করতে যাচ্ছে। কিন্তু তাদের একজন বলল, দেখে তো মজদুর নয় তালেবান তালেবান লাগছে। অপরজন বলল, চেহারা তো বাস্তব মজদুরের মতো নয়।

এখানেও আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের মদদ সাথে ছিলো। তারা আমাদেরকে কোনো প্রশ্ন করেনি। ড্রাইভারকেও বেশি কিছু জিজ্ঞেস করেনি। তারা পিছু হটে যায় আর আমরা উসমানিয়া বসতির দিকে রওয়ানা হয়ে যাই। আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত, যিনি দিলের খবর জানেন, তিনিই সবকিছু জানেন যে, ওরা আমাদের কল্যাণকামী লোক নাকি ক্রুসেডারদের গুপ্তচর ছিলো? কিন্তু এখানে ড্রাইভার মুরব্বীর সন্দেহ হলো যে, আমরা সত্যিই তালেবান কি না? কিন্তু তিনি তা আমাদের কাছে প্রকাশ করেননি। আমরা আরো কিছুদূর যেতেই এক খোলা ময়দান আসে। যার একপাশে গাছের ছায়ায় বাড়ির সাথে কিছু লোক বসে ছিলো। তাদের সাইকেল তাদের পাশেই দাঁড় করানো ছিলো। আমরা যখন ট্রলিতে করে তাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলাম তখন তাদের একজন হাত উঠিয়ে আমাদেরকে সালাম দিলো। সে আব্দুল করিম, আমাদের সাথী ছিলো। কোয়েটা থেকে সে আমাদের সাথে এসেছিলো। আজ-কালের মধ্যে তার বিয়ে হওয়ার কথা।

ঘটনাক্রমে এই আব্দুল করিম সাদা দাড়িওয়ালা ড্রাইভার বাবাজির নাতি। এবার মুরব্বির সন্দেহ একিনে পরিণত হলো যে, এরা তালেবানই। আধা ঘণ্টার মধ্যে আমরা উসমানিয়া বসতিতে পৌছে যাই। ট্রাক্টরওয়ালা মুরব্বী সামনের গ্রামে যাবেন। তিনি আমাদেরকে উসমানিয়া বসতির নিকটে নামিয়ে বললেন, আব্দুর রহমানকে না পেলে আমার কাছে চলে এসো। পেরেশান হওয়ার কারণ নেই।

তালেবান আব্দুল করিম আমার নাতি। মোল্লা আব্দুশ শুকুরকেও আমি জানি। আমরা মুরুব্বীর শুকরিয়া আদায় করে পায়ে হেঁটে উসমানিয়া বসতির দিকে রওয়ানা হয়ে গেলাম। কিছুক্ষণ পায়ে হাঁটার পর আমরা উসমানিয়া বসতিতে প্রবেশ করলাম। একটা ছেলেকে দেখলাম গাছের নিচে বসে থাকতে। যার পাশেই কূপ খনন করা হচ্ছিলো। কিন্তু দাউদ আকার ভাইয়ের বলে দেয়া আলামত এই ছেলের জামাতে ছিলো না। আমি এই ছেলের নিকট আব্দুর রহমানের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম। সে বলল, তাকে তোমাদের কী দরকার? আমি তাকে জবাব দিলাম, আমরা আব্দুর রহমানের নিকটই বলবো। সে আমাদের তিনজনকেই একটি বাড়িতে নিয়ে গেলো এবং মেহমানখানায় বসালো। তারপর সে চা আনার কথা বলে বাইরে চলে যায়। আমি সেখানে থাকা পানি দিয়ে ওজু করলাম। সাথীরাও যোহর নামাজের প্রস্তুতি নিলো। আমরা জামাতের সাথে যোহর নামাজ আদায় করলাম। ইতোমধ্যে আফগানি রেওয়াজ অনুযায়ী চা এবং আনুষঙ্গিক দ্রব্য এসে গেলো। আমরা ওই ছেলের সাথে চা পান করলাম এবং আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করলাম। চা পান করে বসতেই আংটাওয়ালা জামা পরিহিত লোক এসে গেলো। আমি তাকে চিনে নিলাম নিশ্চয় তিনি আব্দুর রহমান। কারণ, তার জামাতে দাউদ আকার ভাইয়ের বলে দেয়া নিদর্শন ছিলো। তিনি আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করে আমাদেরকে অন্য একটি বাড়িতে নিয়ে গেলেন। আব্দুর রহমান বলছিলেন, যদি কেউ আপনাদেরকে এদিকে আসতে দেখে থাকে, তাহলে এ কথাই মনে করবে যে আপনারা আব্দুর রহমানের ঘরে আছেন। এ জন্যই আমি আপনাদেরকে এখান থেকে পরিবর্তন করে নিয়েছি, যাতে আপনারা নিরাপদ থাকেন। আমরা বাড়ির উঠোনে বানানো কূপ থেকে পানি উঠিয়ে গোসল করে কাপড় পরিবর্তন করলাম। ইতোমধ্যে আব্দুর রহমান খাবার নিয়ে এলেন। আমরা তার সাথে খাবার খেলাম এবং নিজেদের কারগুজারী বিস্তারিত শোনালাম। আব্দুর রহমান তার স্যাটেলাইট ফোনে কোয়েটায় মোল্লা আব্দুশ শুকুরের সাথে যোগাযোগ করেন এবং আমাদের হামলার ব্যাপারে অবগত করেন। মোল্লা আব্দুশ শুকুর মিডিয়াকে এই হামলার সংবাদ দিয়ে তালেবানের পক্ষ থেকে দায়িত্ব স্বীকার করে নেন। রাতে বিবিসিতে এই হামলার সংবাদ প্রচার করে। তারা পাঁচ আমেরিকান ফৌজ জাহান্নামী হওয়ার সংবাদ প্রচার করে। অথচ স্থানীয় মাধ্যমে ১৩ ফৌজ নিহত এবং বাকিরা গুরুতর আহত হওয়ার সংবাদ পাওয়া যায়। আমরা রাতে এই বাড়ির বাগানেই আরাম করি। গোটা বসতিবাসী পালাক্রমে আমাদেরকে পাহারা দিয়েছে। তাদের দাবি এই তালেবান আমাদের মেহমান

এবং আমাদের উপর অনুগ্রহকারী। কারণ, তারা ক্রুসেডারদের সাথে লড়াই করার জন্য নিজের ঘরবাড়ি ছেড়ে এখানে এসেছে।

ক্রুসেডারদের জুলুম নির্যাতন

কুফর, শিরক ও জুলুম-নির্যাতনের ঝাণ্ডাবাহীদের পৃষ্ঠপোষকের নাম আমেরিকা। আমেরিকার নেতৃত্বেই সম্মিলিত ক্রুসেডার বাহিনী আফগানিস্তানে জুলুম নির্যাতনের বাজার গরম করছে। ক্রুসেডারদের যুদ্ধ তালেবানের সাথে। আমেরিকান ফৌজের ট্রাকের উপর হামলা করেছি আমরা। সুতরাং তাদের উচিত আমাদের সাথে লড়াই করা। কিন্তু আমরা আমেরিকানদের হাতে পড়িনি। নিরাপদেই বের হয়ে এসেছি এবং বিজয়ী হয়েছি। কিন্তু আমেরিকানরা এলাকাতে ভয় ভীতি ছড়ানো এবং স্থানীয় আবাদীকে তছনছ করার জন্য এলোপাথাড়ি মর্টার ও ট্যাংকের গুলি মারতে শুরু করে দিয়েছে। পাহাড়ি এলাকা বিকটসব আওয়াজে কেঁপে উঠছে। আমরা যখন সেখান থেকে বের হয়ে আসি তখন আমেরিকান হেলিকপ্টার আকাশে চক্কর দিচ্ছিলো এবং ব্যাপক গুলি বর্ষণ করছিলো।

উসমানিয়া বসতিতে এসে আব্দুর রহমানের মেজবানিতে ২/৩ দিন থাকার পর মোল্লা মিলাঙ্গের সাথে যোগাযোগ করি। তিনি বললেন, আমি আপনাদের নিকট একজন লোক পাঠাচ্ছি, আপনারা তার সাথে চুনার বসতিতে চলো আসুন। আমরা ৩ ঘণ্টা পায়ে হাঁটার পর চুনার পৌঁছি। মোল্লা মিলাঙ্গের সাথে সাক্ষাতের পর আমেরিকানদের আরো জুলুম নির্যাতন ও সাথীদের গ্রেফতারি সম্পর্কে জানতে পারি। এতে অন্তর পেরেশান হয়। কমান্ডার মিলাঙ্গ আমাদেরকে সফল অভিযানের জন্য মোবারকবাদ জানান। আমেরিকান হেলিকপ্টার থেকে সৈন্যরা গুলি করে কম বয়সের দুটি বাচ্চাকে শহীদ করে দেয়। এরা ওই এলাকাতেই ভেড়া চড়াচ্ছিলো। আমেরিকানরা তাদের সন্ত্রাসী স্বভাবের প্রশান্তির জন্য ভেড়ার উপরও এলোপাথাড়ি গুলি ছোড়ে। যারফলে পঞ্চাশেরও অধিক ভেড়া ধ্বংস হয়ে যায়। আমেরিকানদের দ্বিতীয় হেলিকপ্টার বসতির নিকটে অবতরণ করে। সেখানকার অধিকাংশ বাসিন্দা দুর্ভিক্ষের কারণে এলাকা ছেড়ে চলে গিয়েছিলো। একটি বাড়িতেই আবাদি ছিলো। তাদের কাছেই মোল্লা আব্দুল কাদীর এবং দাউদ আকা খাবার আনতে গিয়েছিলেন। তাদের দু'জনকেই গ্রেফতার করে এবং জিজ্ঞাসাবাদ করে। মোল্লা আব্দুল কাদীর এবং দাউদ আকা বলেন, আমরা শাহ আগা খানের দরবারে যাচ্ছিলাম। বাড়ির মালিককে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, এরা আমার আত্মীয়। উভয়ের কথায় মিল না থাকায় আমেরিকানরা

তল্লাশি নেয়। এতে দাউদ আকার পকেট থেকে ওয়ারলেস সেটের এন্টিনা বের হয়ে আসে। ফলে আমেরিকানরা তাদের উভয়কে কঠিন শাস্তি দিতে দিতে হেলিকপ্টারের দিকে নিয়ে আসে। হেলিকপ্টারের নিকট এসে গ্রেফতারকারী এবং হেলিকপ্টারের সৈন্যরা মিলে মোল্লা আব্দুল কাদীর, দাউদ আকা এবং বাড়ির মালিকের উপর ঘুষি ও লাথির বৃষ্টি বর্ষায়। তাদেরকে কঠিন শাস্তি দিতে দিতে হেলিকপ্টারে করে কান্দাহার এয়ারপোর্টে নিয়ে যায়। এয়ারপোর্টের জিজ্ঞাসাবাদ সেল এবং বাগরাম জেলের রিমাণ্ড সেলে তারা ছয়মাস পর্যন্ত বন্দি থাকেন। এই ছয় মাস তদন্তের পর কোনো তথ্য না পেয়ে নির্দোষ বলে মুক্তি দেয়। আমেরিকান হেলিকপ্টারের গুলিতে যে দুটি বাচ্চা শহীদ হয়েছিলো তারা এই পরিবারেরই ছিলো। এই নিষ্পাপ পরিবার আমেরিকান জুলুমের জ্বলন্ত প্রমাণ। এই পরিবারের দু'টি বাচ্চা শহীদ হয়, নিষ্পাপ বাবা ছয় মাস পর্যন্ত সংকীর্ণ ও অন্ধকার যিন্দানখানায় বন্দি থাকে। যার ফলে ঘরে একা মহিলা আড়াই বছরের বাচ্চা নিয়ে খুবই করুণ অবস্থায় জীবন-যাপন করতে বাধ্য হয়। মুক্তির পর বাড়ির মালিকের সাথে আমার কথা হয়। আমি তাকে তার শহীদ দুই সন্তানের ব্যাপারে সান্ত্বনা দেই এবং আর্থিক ক্ষতির জন্য আফসোস করি। তার বন্দী জীবনের মসিবতের উপর দুঃখ প্রকাশ করি। সে জবাব দেয়, ইসলামের জন্য এটা তো খুবই সামান্য। আমাদের বড়রা ইসলামের জন্য বড় বড় কুরবানী দিয়েছেন। যার বদৌলতে এই দীন আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে। এমনকি আল্লাহর শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রক্তও ইসলামের ভিত্তিতে শামিল হয়েছে। তিনি আরো বললেন, আমার যদি আরো ছেলে থাকতো তাহলে আমি ইসলাম প্রতিষ্ঠার এই জিহাদে কুরবানী করে দিতাম। এই মহান ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া শুনে এবং তার অবিচল স্পৃহা দেখে আমার চোখ ভিজে ওঠে। আমি বললাম, যতদিন পর্যন্ত এমন লোক তালেবানের জিহাদে সৈনিক হিসেবে থাকবে, আল্লাহর কসম! আমেরিকা এবং তাদের সাঙ্গপাঙ্গরা নিজেদের জুলুম ও সাম্রাজ্যবাদী হিংস্রতা দিতে না তালেবানের রাস্তা আটকাতে পারবে, না ইসলাম প্রতিষ্ঠার রাস্তায় অধিক সময় বাধা হয়ে থাকতে পারবে।

স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

কমান্ডার মোল্লা মিলাঙ্গ, আমি, সাঈদ জান, আজমরে, সাঈদ মল, আব্দুল করিম এবং মুসা একসাথে আগামী টার্গেটের ব্যাপারে পরামর্শ করছিলাম। সিদ্ধান্ত হলো, যে মাইন আমি কান্দাহার টু উর্জেগান রোডে পুঁতেছিলাম তা বের করা

হবে। কারণ, এদিকে এখন আমেরিকানদের আসা প্রায় অসম্ভব। এলাকার ব্যাপারে অধিক ধারণা নিয়ে জানা গেলো, আমেরিকানরা খুবই ভীত-সন্ত্রস্ত। উল্লেখযোগ্য কোনো টার্গেটও পাওয়া গেলো না। এর কারণ এটাই ছিলো যে, গত অভিযানে আমেরিকানদের উপর কার্যকরী আঘাত লেগেছে। তাদের অনেক ক্ষতি হয়েছে। এখন আমেরিকান সৈন্য যথেষ্ট পরিমাণ সতর্ক হয়েছে। পাঁচদিন পর আমরা ওই এলাকায় গেলাম, যেখানে আমেরিকান ট্রাক ধ্বংস হয়েছিলো। রাস্তায় অনেক বড় গর্ত হয়ে আছে। বিধ্বস্ত ট্রাকের কেবল ফ্রেম এবং সিটই বাকি ছিলো। অবশিষ্ট উল্লেখযোগ্য সবকিছু স্থানীয় জনগণ গনিমতের মাল হিসেবে নিয়ে গেছে। তারপর আমরা গর্তে লুকানো অস্ত্রশস্ত্র এবং কান্দাহার টু উর্জেগান রোডে ফিট করা মাইন উঠিয়ে সংরক্ষণের জন্য তালেবান জিম্মাদারদের নিকট জমা করে দেই।

অভিযানের উপযুক্ত স্থান ও সুযোগ না পাওয়া এবং রমজান মাস নিকটবর্তী হওয়ায় আমি আমিরের নিকট দেশে ফিরে আসার অনুমতি চাই। তিনি সানন্দে অনুমতি দেন। আমি, আজমরে এবং সাঈদ জান সিরাচাহ গাড়িতে চড়ে কান্দাহার স্টেশনে পৌছি। কান্দাহার ষ্টেশনে বেশিক্ষণ অবস্থান করা বিপজ্জনক মনে করে আমরা তিনজন স্পেন বুলদাকের দিকে রওয়ানা হয়ে যাওয়া উপযুক্ত মনে করলাম। আসরের সময় আমরা স্পেন বুলদাক পৌছি। আসর নামাজ আদায় করে আমাদেরকে কোয়েটা পৌছানো এবং বর্ডার ক্রস করানোর ব্যাপারে গাড়িওয়ালার সাথে কথা বলি। কারণ, আমাদের নিকট কোনো পরিচয়পত্র ছিলো না। ড্রাইভার স্বাভাবিকের চেয়ে কিছু বেশি টাকা চাইলো। আমরা টাকা পরিশোধ করে চমনের রাস্তায় সাড়ে তিন ঘণ্টার মধ্যে কোয়েটায় পৌছে যাই। কোয়েটায় পৌছে রমজানের প্রস্তুতিতে সময় কেটে যায়। কারণ তখন রহমত, মাগফেরাত ও নাজাতের মাস রমযান আসি আসি করছিলো।

আফগান বাকি, পাহাড়ি অঞ্চল বাকি

২০০৬ সালের বসন্তকাল আগত প্রায়। চারদিকে সবুজের ছড়াছড়ি। গাছে গাছে নতুন পাতা গজিয়েছে। মনে হচ্ছে গাছগুলো নতুন কাপড় পরিধান করেছে। চারদিকে কলির প্রস্ফুটন এবং ফুলের সুঘ্রাণ আবহাওয়াকে সুগন্ধময় করে রেখেছে। শুহাদাদের পুণ্যভূমির কঠিন বরফপূর্ণ আকাশ ও বরফ মিশ্রিত শীতল হাওয়া স্বাভাবিক মওসুম এবং আরামদায়ক রাতে পরিবর্তন হয়েছে। চারদিকে বসন্তের জোয়ার। শুহাদাদের পুণ্যভূমির মাঠগুলো সবুজ ও ফুলে সজ্জিত মনে হচ্ছে। সেই সাথে আফগানের শিকড় এবং আত্মমর্যাদাশীল তালেবান সম্মিলিত

বাহিনীর উপর হামলে পড়ার জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি নিচ্ছে। তালেবানরা জমিনের নিচে পুঁতে রাখা অস্ত্র বের করছে। বিভিন্ন উপায়ে নতুন অস্ত্র ক্রয় করছে। আফগান ন্যাশনাল আর্মির ঘুষখোর অফিসাররাও আমেরিকান অস্ত্র চুরি করে তালেবানের নিকট বিক্রি করছে।

তালেবানরা পাহাড়ে তাদের আস্তানা বানাচ্ছে। নতুন প্রস্তুতি চলছে। আমেরিকান এবং সম্মিলিত ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে তালেবানরা নিজেদের শক্তি নতুন পরিকল্পনায় সাজাচ্ছে।

তালেবানরা আফগান জনসাধারনের জন্য এক বড় কুদরতি নেয়ামত। আফগান জনগণও রবের এই নেয়ামতের পূর্ণ শুকরিয়া আদায় করেছে। আফগান জনগণের মধ্যে আল্লাহর দয়ার বর্ষণও খোলা চোখে দেখা যায়। এই মোল্লারা আফগানিদের দীনি মর্যাদাবোধের প্রকৃত রক্ষক। এসব (তালেবান) মোল্লাদেরকে সংবর্ধনা জানিয়ে আল্লামা ইকবাল রহ. বলেন–

افغانیو کی غیرت دین کا ہے یہ علاج

ملا کو ان کے کوہ و دمن سے نکال دو

আফগানিদের দীনি মর্যাদাবোধের একটাই চিকিৎসা,
মোল্লাদেরকে পাহাড়ের আঁচল থেকে বের করে দাও।

শহীদদের পুণ্যভূমি আফগানের আকাশচুম্বি পাহাড়ি অঞ্চল আফগান মুজাহিদীনের সাহসিকতা, অবিচলতা, তাকওয়া-পরহেজগারি ও বীরত্ব-বাহাদুরীর আসল ঠিকানা। যেখানে মজবুত হয়ে তারা বৃটেনকে টুকরো টুকরো করেছে, রাশিয়াকে টুকরো টুকরো করে বিক্ষিপ্ত হতে বাধ্য করেছে। তালেবান আজ পুনরায় সেই পাহাড়ি অঞ্চলে মজবুত হয়ে ইমারাতে ইসলামিয়ার ভিত্তিতে নিজেদের তপ্ত খুন প্রবাহিত করছে। সম্মিলিত ক্রুসেডার এবং ইসলামের দুশমন মুনাফিক শক্তিগুলোকে নাকানি-চুবানি খাওয়াচ্ছে। প্রাচ্যের কবি আল্লামা ইকবাল রহ. এর ভাষ্য অনুযায়ী–

افغان باقی، کہسار باقی

الحکم للہ! الملک للہ

আফগান বাকি, বাকি পাহাড়
হুকুম আল্লার! রাজত্ব আল্লার।

আফগানে যাত্রা

কান্দাহারে ২০০৫ সাল আমেরিকান ফৌজের জন্য ধ্বংসাত্মক প্রমাণিত হয়। তালেবানের শানদার রণকৌশল এবং সাহসি হামলার কারণে আমেরিকানরা কান্দাহার থেকে পালিয়ে যাওয়ার মধ্যেই কল্যাণ খুঁজে পেলো। আমেরিকান ফৌজ কান্দাহার থেকে গজনী চলে যায় এবং কান্দাহারে কানাডিয়ান সৈন্য মোতায়েন করে।

আমি ঘরে ছিলাম। আমার নিকট মোল্লা আব্দুশ শুকুরের সংবাদ আসে, আমরা চারদিন পর শহীদের পুণ্যভূমি আফগানিস্তানে রওয়ানা হচ্ছি, আপনিও আসুন। আমি ব্যক্তিগত ব্যস্ততার জন্য চারদিন পর নয়, দশদিন পর যখন সেখানে পৌছলাম তখন কোনো আফগানি তালেবান কোয়েটায় ছিলো না। সবাই ক্রুসেডার সৈন্যদের উপর হামলা করতে আফগানিস্তানে চলে গেছে। অল্প কিছুক্ষণ তালাশ করার পর আমার পুরাতন সফরসঙ্গী এবং সহমুজাহিদ আজমরের সাথে সাক্ষাৎ হয়। সে কয়েকটি যুদ্ধে আমার সঙ্গী ছিলো। আজমরের সাক্ষাৎ পেয়ে আমি খুব খুশি হই। সেও খুব মহব্বত প্রকাশ করলো। আজমরের সাথে দীর্ঘক্ষণ তালেবানের যুদ্ধকৌশল এবং আমেরিকানদের সম্মিলিত ফৌজের অসহায় অবস্থা নিয়ে আলাপ করছিলাম। সেও আফগানিস্তানের অবস্থার উপর আলোচনা করলো। সাহসিকতা, বাহাদুরি, হিম্মতদার জোয়ান আজমরেকে খুব উৎসাহিত ও উচ্ছল মনে হচ্ছিলো। শীতকাল চলে যাওয়াতে সে খুব আনন্দিত ছিলো। কারণ, এখন থেকে পুনরায় পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে ক্রুসেডারদের সম্মিলিত বাহিনীর উপর হামলে পড়ার সুযোগ আসছে।

جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا

لہو گرم رکھنے کا ہے اک بہانہ

অতর্কিত হামলা করা, চক্কর দিয়ে হামলে পড়া

রক্ত গরম রাখার এক কৌশল।

কোয়েটায় এমন কোনো তালেবান রাহবর ছিলো না যে আমাদেরকে শহীদদের পুণ্যভূমি আফগানিস্তানে নিয়ে যাবে। আমি স্যাটেলাইট ফোনে মোল্লা আব্দুশ শুকুরের সাথে যোগাযোগ করি। কমান্ডার সাহেব বললেন, আপনি কান্দাহার পর্যন্ত আসুন। যেসব গাড়ি চুনার থেকে কান্দাহার যায় সেগুলোর মধ্যে কোনো নির্ভরযোগ্য ড্রাইভারকে আমি বলে দিবো, সে আপনাকে নিরাপদে কান্দাহার থেকে চুনার বসতিতে নিয়ে আসবে।

কোয়েটার করুণ অবস্থা

২০০৬ সালের কোনো এক দিন। সংবাদপত্র এবং টিভি না থাকায় দেশি এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির কোনো অনুমান করা যাচ্ছিলো না। আমরা রেডিওতে সংবাদও শুনিনি। আমি এবং আজমরে যখন সকাল বেলা আফগানিস্তানে যাওয়ার জন্য বাইরে এলাম তখন কোয়েটার রাস্তাঘাটে সুনসান নীরবতা বিরাজ করছিলো। সব ধরনের ছোট-বড় ট্রাফিক বন্ধ। জায়গায় জায়গায় জ্বলন্ত টায়ার। সরকারি মালিকানা এবং বেসরকারি মালিকানার ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। ট্রাফিক সিগনাল ভেঙ্গে পড়ে আছে। মোড়ে মোড়ে জ্বলে যাওয়া বাসের বডি বিক্ষিপ্ত ছড়িয়ে আছে। ব্যাংকগুলো লুটে নেয়া হয়েছে। রেল স্টেশন পাঞ্জাবের লোকজনে ভরপুর। গাড়িতে যাদের জায়গা হয়েছে তারা তো পাঞ্জাব রওয়ানা হয়ে গেছে, বাকিরা পাক ফৌজের পাহারায় স্টেশনে আশ্রয় নিয়েছে।

গোটা শহর জুড়ে পুলিশ এবং সেনাবাহিনীর ভারি হস্তক্ষেপ পরিলক্ষিত হচ্ছিলো। আমি কোয়েটার এই করুণ অবস্থা দেখে খুবই পেরেশান হলাম। আমি এই সংবাদের তালাশে থাকলাম যে, কোন কারণে কোয়েটার এই করুণ দিনের মুখ দেখতে হলো। আমি আমার সাথী আজমরেকে সাথে নিয়ে স্টেশনের দিকে হেঁটে যাচ্ছিলাম। রেডিওতে বেলুচিস্তানের সাবেক গভর্নর এবং প্রধানমন্ত্রী নওয়াব আকবর খান বাগটিকে পকিস্তানের আর্মি কর্তৃক গুলি করার সংবাদ প্রচার হচ্ছে, যেখানে আকবর খান বাগটি তার ২০ জন সঙ্গীসহ নিহত হয়।

এ জন্যই বেলুচিস্তানিরা কোয়েটায় জ্বালাও-পোড়াও এবং ভাংচুরের তাণ্ডব চালিয়ে নিজেদের ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। যার শিকার হয়েছে বহু নিরপরাধ মানুষ। আমি চিন্তা করলাম, নওয়াব মুহাম্মাদ আকবর খান বাগটি একজন সাহসী এবং বাহাদুর নেতা ছিলেন। তার চিন্তা-প্রচেষ্টা ছিলো স্বজাতি ও গোষ্ঠীকে ঘিরে। এমনকি এর জন্য সে বৃদ্ধ বয়সেও পাহাড়ে যেতে দ্বিধা করেনি। হায়! যদি নওয়াব আকবর খান বাগটির চেষ্টা-তদবির ইসলাম এবং মুসলমানের জন্য হতো, সে যদি মুজাহিদীনের সাথে মিলে আমেরিকানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতো, মুজাহিদীনকে সহযোগিতার জন্য ময়দানে আসতো, কাফেরদের কয়েদখানায় বন্দী মুসলিম মেয়েদের মুক্তির জন্য চেষ্টা-তদবির করতো তাহলে আজ ইসলামী বিশ্ব তার নাম হিরো এবং বড় মুজাহিদ হিসেবে জানতো। শত শত বছর পর্যন্ত ইতিহাস তার সোনালি অবদান নিয়ে ঈর্ষা করতো। নওয়াব আকবর খান বাগটির ধ্বংস পারভেজ মোশাররফ এবং তার সাঙ্গপাঙ্গদের অহংকার ও গরিমার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

'সবার আগে পাকিস্তান' শ্লোগান দিয়ে ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের উপর রক্তরঞ্জিত রাত নিক্ষেপকারীরাই ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তানের সম্মানিত নাগরিক এবং পার্লামেন্টের সদস্য, বেলুচিস্তানের সাবেক গভর্নর ও প্রধানমন্ত্রীকে মিসাইলের টার্গেট বানিয়েছে। দুঃখের কথা হলো, যদি নওয়াব আকবর বাগটির কোনো অপরাধ থাকতো তাহলে তাকে গ্রেফতার করে আদালতে পেশ করা যেতো। আদালতকে পিছনে রেখে তাকে হত্যা করে দেশে ফেতনা ফাসাদের পরিবেশ সৃষ্টি করার কোনো প্রয়োজন ছিলো না।

ডিউরেন্ড বর্ডার ক্রসিং

আমরা গাড়িতে চড়ে তিন ঘন্টারও বেশি সময় পর চমন বর্ডারে পৌঁছি। এখন আমাদের ডিউরেন্ড বর্ডার[৭] ক্রস করতে হবে। আমি আমার সফরসঙ্গী আজমরের সাথে পরামর্শ করলাম। সিদ্ধান্ত হলো, আমরা পালাক্রমে বর্ডার ক্রস করবো। আমরা যখন এ ব্যাপারে চেষ্টা করলাম তখন বর্ডার মিলিশিয়ারা আমাদের পরিচয়পত্র চাইলো এবং কাগজপত্র না থাকায় ফেরত পাঠিয়ে দিলো।

এরপর আমি এক মোটর সাইকেলওয়ালার সাথে যোগাযোগ করলাম। যার কাজই হলো বর্ডার মিলিশিয়াদের সাথে মিলে টাকার বিনিময়ে বর্ডার ক্রস করানো। আমি তাকে ২৫ রুপিয়ার বিনিময়ে স্টেশনে রেখে আসার কথা বললাম। সে আমাকে পাঞ্জাবি বলে সন্দেহ করলো এবং ৫০ রুপিয়া চাইলো। আমি তাকে বললাম যদি তুমি আমাকে স্টেশনে নিরাপদে রেখে আসো তাহলে আমি তোমাকে ৫০ রুপিয়া-ই দেবো। মোটর সাইকেলওয়ালা পখতুনের লোক ছিলো। সে আমাকে এবং আজমরেকে নিয়ে ডিউরেন্ড বর্ডারের দিকে রওয়ানা হলো এবং ১০ মিনিটের মধ্যে প্রথম চেকপোস্টে পৌঁছে গেলো, যেখান থেকে আমাদেরকে কাগজপত্র না থাকায় ফিরিয়ে দিয়েছিলো। কিন্তু এখন আমরা আরামে মোটর সাইকেলে চড়ে বর্ডার মিলিশিয়াদের মাঝখান দিয়ে চলে আসি। কেউ কাগজপত্র চাওয়া তো দূরের কথা, থামানোর চেষ্টাও করেনি। সবকিছু বর্ডার মিলিশিয়া এবং মোটর সাইকেল ওয়ালাদের ভাগ ভাটোয়ারার জিন্দা কারামতি। সামনেও পাকিস্তানি এলাকার জায়গায় জায়গায় বর্ডার মিলিশিয়াদের চেকপোস্ট ছিলো। পথচারি লোকজনের খুব জোরেশোরে তল্লাশি চলছিলো। আর আমরা মোটর সাইকেলে চড়ে গন্তব্যের দিকে ছুটছিলাম।

এসব তল্লাশি এবং চেকপোস্ট পাকিস্তানের পক্ষ থেকেই ছিলো। আফগানিস্তানের ভেতরে বর্ডারের কাছে কোনো চেকপোস্ট বা তল্লাশি নেই।

---

[৭]. পাকিস্তান ও আফগানিস্তান বর্ডার।

আমরা যখন স্টেশনের একদম নিকটে চলে আসি তখন সেখানে আফগান ন্যাশনাল আর্মির সদস্যরা চেকপোস্ট দিয়ে রেখেছিলো। তারা আমাদেরকে থামিয়ে হালকা পাতলা তল্লাশি নিলো এবং আমাদেরকে যেতে দিলো।

মোটর সাইকেলওয়ালা আমাদেরকে স্টেশনে রেখে ফিরে আসে। 'ভেশ' হল পাকিস্তানের বর্ডারে আফগানিস্তানের সর্বশেষ বসতি। 'ভেশ' এর অর্থ হলো বিভাজন। এখানকার বর্ডার আফগানিস্তান এবং পাকিস্তানকে পৃথক করেছে, তাই একে ভেশ বলা হয়। এখানে একটি কালোবাজার আছে, যাতে চুরিকৃত মালামাল যেমন, গাড়ি, টিভি, মোবাইল, টেলিফোন এবং দৈনন্দিন ব্যবহৃত সামগ্রী সস্তায় বিক্রি হয়। কম্পিউটার, ল্যাপটপ, স্যাটেলাইট ফোন এবং স্যাটেলাইট সীমও ব্যাপকভাবে পাওয়া যায়। গোটা পৃথিবীর চুরি হওয়া দ্রব্যের কেন্দ্র এই ভেশ বাজার। পাকিস্তান থেকে চুরি করা গাড়িও প্রশাসন এবং সরকারি কর্মকর্তাদের তত্ত্বাবধানে এনে এখানে বিক্রি করা হয়। আমি স্টেশন থেকে কান্দাহারের গাড়ির ব্যাপারে তথ্য নিলাম এবং কান্দাহার স্ট্যান্ড থেকে কান্দাহারের টিকেট নিলাম। গাড়িতে বসার কিছুক্ষণ পরই গাড়ি রওয়ানা হয়। যোহরের নামাজ আমরা রাস্তাতেই আদায় করি। দুই ঘণ্টা পথ চলার পর আমরা কান্দাহার পৌঁছি। কান্দাহার স্টেশন থেকে সিরাচা গাড়িতে চড়ি এবং কান্দাহারের 'সবুজ গম্বুজ' নামক এলাকায় পৌঁছি। সবুজ গম্বুজ কান্দাহার শহরেরই একটি বাণিজ্যিক কেন্দ্র। এখানে বেচাকেনা করার দোকানপাট আছে, যেখানে নিত্য প্রয়োজনীয় (হরেক রকম) মুদি এবং পাইকারি মাল সহজে পাওয়া যায়। বাদাম, কিশমিশ, আখরোট এবং শুকনো খাবারের আরতও আছে। এখানে কান্দাহারের পার্শ্ববর্তী এলাকার বাগানের মালিকেরা নিজেদের প্রস্তুত করা শুকনো খাবার বেচাকেনা করে। এখানে বড় বড় হোটেল এবং শানদার রেস্টুরেন্টও আছে। যেগুলোতে বাহির থেকে আগত কান্দাহারের মুসাফিরগণ নিজেদের প্রয়োজন পূরণ করেন।

আমি আমার সাথী আজমরেকে সাথে নিয়ে এক হোটেলে খাবার খেয়ে মোল্লা আব্দুশ শুকুরের বলে দেয়া জায়গায় চলে যাই। যেখানে আমাদেরকে চুনার বসতিতে নিয়ে যেতে ড্রাইভার আসার কথা। আমরা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলাম, কিন্তু ড্রাইভারের সাথে সাক্ষাৎ হয়নি। আমি ড্রাইভারের ফোন নম্বরে যোগাযোগ করলাম। নম্বরটি মোল্লা আব্দুশ শুকুর আমাদেরকে রওয়ানা হওয়ার আগেই দিয়েছিলেন। ড্রাইভার আমাদেরকে আগের জায়গাতেই দেখা করতে বলল। আমরা বাজারের সেই জায়গায় পৌঁছে গেলাম যেখানে আমরা অপেক্ষা করছিলাম। কিছুক্ষণ পরই ড্রাইভার আসে। আমরা ড্রাইভারের সাথে মোল্লা

আব্দুশ শুকুরের রেফারেন্সে কথা বলি এবং চুনার বসতিতে যাওয়ার ইচ্ছা পেশ করি।

ড্রাইভার তৎক্ষণাৎ তার সাথে আমাদেরকে চুনার বসতিতে নিয়ে যেতে অস্বীকৃতি জানালো এবং ওজর পেশ করতে লাগলো। আমরা কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বলল, চুনার বসতির রাস্তায় কানাডিয়ান ফৌজ চেকপোস্ট বসিয়েছে। তারা প্রত্যেকটি গাড়ি তল্লাশি করে। এখন যদি তারা আমার গাড়ি তল্লাশি করে এবং আপনাদেরকে নামিয়ে রেখে দেয় তাহলে আমি কমান্ডার আব্দুশ শুকুরকে কী জবাব দেবো? অথচ আপনারা মোল্লা সাহেব এবং আমাদের বিদেশি মেহমান। এই আশঙ্কায় আমি আপনাদেরকে আমার সাথে নিয়ে যেতে পারবো না।

ড্রাইভার যখন আমাদেরকে সাথে নিতে অস্বীকৃতি জানালো তখন আমি তাকে বললাম, তাহলে যাওয়ার কোনো ব্যবস্থা করো। কারণ মোল্লা সাহেবই তো তোমাকে আমাদেরকে নিয়ে যেতে বলেছেন। সুতরাং এখন এটা তোমার জিম্মাদারি। নাকি আমরা কমান্ডার মোল্লা আব্দুশ শুকুরের সাথে যোগাযোগ করবো? ড্রাইভার কিছুক্ষণ চিন্তা করলো এবং নিজের মোবাইল দিয়ে কোথায় যেনো ফোন করলো। তারপর সে তার ৪/৪ গাড়িতে করে কান্দাহারের ভিতরের গলিগুলোতে ১৫ মিনিট পর্যন্ত চক্কর দিলো। একপর্যায়ে সে গাড়িটি একটি বড় বাড়ির সামনে দাঁড় করিয়ে বাড়ির দরজার কড়া নাড়লো। ১০/১২ বছরের একটি বাচ্চা বের হলে সে তাকে কিছু একটা বললো। বাচ্চা ভিতরে যাওয়ার পর এক অর্ধবয়সী লোক বের হয়ে এলো। যার বয়স ৫০/৫৫ হবে। সে সাদা পোশাক পরিহিত ছিলো এবং কোমড়ে পিস্তলের খাপ বাঁধা ছিলো। ড্রাইভার তার সাথে কথা বলে আমাদেরকে গাড়ি থেকে নামতে বললো। তারপর আমাকে উদ্দেশ্য করে বলল, হাজি সাহেব আপনাদেরকে কানাডিয়ান ফৌজের চেকপোস্ট ক্রস করিয়ে আরগান্দাব শহরে রেখে আসবেন। সেখান থেকে আমি আপনাদেরকে চুনার বসতিতে নিয়ে যাবো।

পুলিশপ্রধান নজর আলী

আমি গাড়ি থেকে নেমে হাজি সাহেবের সাথে হাত মিলাই। ভারি শরীরের, দীর্ঘদেহী ব্যক্তি। তার চেহারা দাড়িতে সাজানো। মনে হচ্ছে যেনো দাড়িতে রূপা চমকাচ্ছে। আমার মনে হলো, এই লোককে আমি আগে কোথায় যেনো দেখেছি। কিন্তু এখন আমি তার ব্যাপারে চিন্তা করা উপযুক্ত মনে করলাম না। আমি এবং আমার সাথী আজমরেকেও পরিচয় করালাম না। হাজি সাহেব আমাদেরকে নিয়ে হেঁটে একটু সামনে আরেকটি বাড়িতে নিয়ে গেলেন।

আমাদেরকে বাইরে দাঁড়াতে বলে তিনি ভেতরে চলে গেলেন। তিনি একটি নতুন মডেলের সার্ফ গাড়ি বের করে নিয়ে এলেন। যখন সে গাড়ি বের করছিলো তখন আমি চিন্তা করছিলাম, এই চেহারা দেখে কেনো ভালো লাগছে? হঠাৎ তার নাম মনে পড়ল, নজর আলী। আমি মনের উপর জোর দিয়ে চিন্তা করলাম। মনে পড়লো, নিশ্চয় এ ব্যক্তিই কান্দাহার পুলিশের মহা পরিচালক নজর আলী। আমি আগের সফরে চুনার বসতিতে তার সাথে সাক্ষাৎ করেছিলাম। তখন সে মোল্লা আব্দুশ শুকুর থেকে অনুমতি নিয়ে নিজের পিতৃবসতি চুনারে নিজের সন্তান ও পরিবারের অন্যান্য লোকদের সাথে দেখা করতে গিয়েছিলো। আমি যখন আজমরের দিকে তাকালাম তখন বুঝতে পারলাম সেও নিজের চিন্তাশক্তিতে জোর দিয়ে নজর আলীকে চিনতে পেরেছে। সে খুব পেরেশান ছিলো। কিন্তু এ সময় নজর আলীর সাথে যাওয়া ছাড়া আমাদের অন্য কোনো উপায় ছিলো না। তবে আমাদের এতটুকু বিশ্বাস ছিলো, যদি সে আমাদের সাথে কোনো গাদ্দারি করে তাহলে তালেবানের প্রতিশোধ থেকে বাঁচতে পারবে না। ততক্ষণে নজর আলী গাড়ি বের করে এনেছে। সে গাড়ির দরজা খুললো এবং খুব সম্মানের সাথে গাড়িতে বসার দাওয়াত দিলো। আজমরে সামনের সিটে এবং আমি ড্রাইভিং সিটের পেছনে বসি। আজমরের চেহারায় পেরেশানির ছাপ স্পষ্ট ছিলো। আমি তাকে ইশারায় বুঝালাম, আমরা দু'জন আর নজর আলী একা। তাছাড়া চিন্তার কোনো কারণ নেই, তার পিস্তল আমার হাতের নাগালে। উল্টাপাল্টা করলে তা কাজে লাগানো যাবে। তখন আজমরে নিশ্চিন্ত হয়ে যায়।

নজর আলী খুব প্রশান্তির সাথে কান্দাহারের রোডগুলোর উপর গাড়ি চালাচ্ছিলো। পথিমধ্যে যখন হযরত আমিরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর দা.বা. এর বাড়ির পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলো তখন সে সেদিকে ইশারা করে বলল, এখন এর উপর নাপাক সম্মিলিত ক্রুসেডারদের কর্তৃত্ব।

আমরা পেরেশান ছিলাম কিন্তু অবস্থা এবং এলাকা গভীর দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণও করছিলাম। আমরা কান্দাহার থেকে বের হয়ে পাহাড়ের দিকে আরগান্দাব রোডে চলছিলাম। আরগান্দাবের আগে এক বড় পাহাড়ের কাছে কানাডিয়ান ফৌজ চেকপোস্ট দিয়ে রেখেছিলো। নজর আলী নিশ্চিন্তে গাড়ি সামনে বাড়ালো। রাস্তার দুই পাশে কাটাতারের ব্যারিকেড এবং মাঝখানে স্পিড ব্রেকার বানিয়ে রেখেছে। পাহাড়ের উপর মোর্চা বানানো রয়েছে, যেখানে কানাডিয়ান ফৌজ নিযুক্ত আছে। রাস্তায় গাড়ির লোক চিহ্নিতকারী হাত পা বাঁধা[৮] আফগান

---

[৮] অকার্যকর, হুকুমের দাস।

ন্যাশনাল আর্মি এবং তাদের অদূরেই কয়েকজন কানাডিয়ান ফৌজ দণ্ডায়মান। নজর আলী তার গাড়ির গ্লাস নিচু করলো এবং হাত নাড়লো। কান্দাহার পুলিশ গাড়িওয়ালাদের স্যালুট করলো। নজর আলী গাড়ি সামনে চালিয়ে গেলো। এভাবে আমরা সহিহ সালামতেই চেকপোস্ট ক্রস করে যাই।

যখন আমরা চেকপোস্ট অতিক্রম করে ফেলি তখন আমাদের বিশ্বাস দৃঢ় হয়। আমরা নজর আলীর সাথে গল্প করতে শুরু করি। সে নিজের ফোন নম্বর দিতে দিতে বললো, আল্লাহ না করুন যদি আপনাদের নিকট কেউ পরিচয়পত্র চায় অথবা অন্য কোনো জিজ্ঞাসাবাদ করে তাহলে আমার এই নম্বরে ফোন করে বলবেন। আমি যথাসম্ভব আপনাদের সহযোগিতা করবো। গাড়ি তখন আরগান্দাবের দিকে দ্রুত চলছিলো। আমি চিন্তা করছিলাম, আফগানিস্তানের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত তালেবানের নিয়ন্ত্রণ। এসব এলাকায় বসবাসকারী সরাকারী কর্মচারীগণ– চাই সে আফগান ন্যাশনাল আর্মির সদস্য হোক, আফগান পুলিশের সদস্য হোক কিংবা সংস্কৃতিক বিভাগের কর্মী বা অন্য যেকোনো বিভাগের সদস্য হোক, শহরের হোক বা গ্রামের হোক সকলেই নিজেদের ব্যাপারে তালেবানের ফায়সালাকে মনে প্রাণে মেনে নেয়। যদি কোনো সরকারি কর্মচারী অথবা সাধারণ লোক নিজের সীমা অতিক্রম করে কোনো প্রকার ঘুষ নেয় অথবা কোনো বৈধ কাজ করে দিতে অস্বীকার করে তাহলে তালেবান তার কান মলে দিতে হাজির হয়ে যায়।

হাজি নজর আলী এবং তার মতো ছোট বড় সরকারি কর্মচারী তালেবানের প্রভাব ও ভীতির কারণে সহযোগিতা করতে বাধ্য। নজর আলী চুনার বসতির নিকটের বাসিন্দা। কিন্তু বিশেষ কারণে কান্দাহারে বাস করে। সে তালেবান নেতাদের অনুমতি ছাড়া নিজের বাব-দাদার ভিটায় নিজের আত্মীয়স্বজন এবং নিকটাত্মীয়দের সাথে সাক্ষাৎ করতে কখনো সাহস করতে পারবে না।

এসব লোক নিজের লোভ লালসা মিটানোর জন্যই ক্রুসেডারদের সঙ্গ দেয় এবং সরকারি পদ নেয়। কোনো সেবার জন্য নয়। তাদের জীবনের নিরাপত্তার এই অবস্থা যে, নজর আলী এবং তার মতো লোকেরা নিজের জীবনের নিরাপত্তার জন্য তালেবানের সাথে নিয়মিত চুক্তি করে রেখেছে। যার বিপরীতে তারা তালেবানকে বড় অংকের আর্থিক বিনিময় দিয়ে থাকে। ক্রুসেডারদের অস্ত্রশস্ত্র এবং গোলাবারুদও তালেবানের কাছে বিক্রি করে। সবচেয়ে বড় কথা হলো, আমেরিকান এবং সম্মিলিত বাহিনীর যাতায়াতের সংবাদ দেয়া, তালেবানের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নেয়া টার্গেটসমূহের গোয়েন্দা তথ্য এবং মুজাহিদীনকে এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় যাওয়ার নিরাপদ পথ তৈরি করে দেয়া তাদের

দায়িত্বের অন্তর্ভূক্ত। এ জন্যই আফগানিস্তানে তালেবান নেতাদের উপর ড্রোন হামলা হয় না। আমরা আরগান্দাব থেকে আরো আধা ঘন্টার দূরত্বে ছিলাম। পথে একটি নদী আসলো। এই রাস্তা নদীর পাড় ধরে কান্দাহার থেকে আরগান্দাব এবং উর্জেগান যায়। এই সুন্দর পিচ ঢালা রাস্তা ইদানীং তৈরি করেছে। এটা পাকিস্তানের একটি বিল্ডার্স কোম্পানি 'আল হাসানাইন' এর ইঞ্জিনিয়াররা ২০০৩/০৪ সালে তৈরি করেছে। এই নদী পার হয়ে অল্প কিছুদূর যেতেই নদীর পুল দেখতে পেলাম। নজর আলী পুলের একটু আগে ঘন গাছের নিচে গাড়ি একদম থামিয়ে ফেলে। গাড়ি থেকে নেমে গাড়ির নেমপ্লেটের দিকে ইশারা করে আমাদেরকে বিনয়ের সাথে বলতে লাগলো, আমার গাড়ির নাম্বার মনে রাখবেন। অনুগ্রহ করে আমার গাড়িতে রিমোট কন্ট্রোল হামলা করবেন না। আমি কারজাইয়ের চাকরি করা সত্ত্বেও আপনাদের সহযোগিতা করছি। তারপর আমাদেরকে লক্ষ্য করে বলল, আপনারা এখানেই থামুন। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই চুনার বসতির ড্রাইভার এসে আপনাদেরকে নিয়ে যাবে। সে-ই আপনাদেরকে কমান্ডার মোল্লা আব্দুশ শুকুরের কাছে পৌছে দেবে। এখানে পৌছে দেয়া পর্যন্ত-ই আমার দায়িত্ব ছিলো। আমরা নজর আলীর দিকে তাকালাম এবং গাড়ি থেকে নেমে গেলাম। সে গাড়ি স্টার্ট করে গাড়ি ঘুরালো এবং কান্দাহার ফিরে গেলো। নজর আলী আমাদেরকে যেখানে নামিয়ে দেয় সেখানে নদীতে বাঁধ দিয়ে ড্যাম তৈরি করা হয়েছে। একে আরগান্দাব ড্যাম বলে। এটি রাশিয়ান দখলদারিত্বের সময় রাশিয়ান এক কোম্পানি নির্মাণ করেছে। এটি একটি বড় ড্যাম। যে নদীর পাশ দিয়ে আমরা এসেছি তা এই ড্যাম থেকেই প্রবাহিত হয়। নদীটি বড়, যা এক বিশাল এলাকা জুড়ে প্রবাহিত হয়। এছাড়াও এখানকার স্থানীয় বাসিন্দারা নদীর ভিতর বড় পাখা লাগিয়ে পারিবারিক বিদ্যুৎ উৎপাদন করে। যা দিয়ে তারা নিজেদের পারিবারিক চাহিদা পূরণ করে।

নদীর এক পাশে রাস্তা এবং অপর পাশে বসতি। রাস্তার বাম পাশে বিশাল এলাকা জুড়ে আনার বাগান বিস্তৃত, যা আরগান্দাব, পাঞ্জুয়াই এবং এড়ি– এই তিন জেলার বিস্তীর্ণ ভূমিকে বেষ্টন করে রেখেছে। এখানকার আনার খুবই মিষ্টি এবং সুস্বাদু। গোটা পৃথিবীতে যা কান্দাহারী আনার নামে প্রসিদ্ধ। এটি অত্র এলাকার সর্বোত্তম উপহার। এই বাগানগুলোও এই নদী এবং সমুদ্রের পানি দ্বারা সিঞ্চিত হয়। নজর আলী যখন আমাদেরকে রেখে যায় তখন আমি চিন্তা করলাম, তালেবানরা একসময় আমেরিকার জুলুম এবং নজর আলীর মতো লোভ লালসার গোলামদের কারণে পিছু হটেছিলো। আরব ও পাকিস্তানিসহ

অন্যান্য মুহাজির মুজাহিদীনের মাথা গোঁজার মতো কোনো জায়গা ছিলো না। কিন্তু এখন তালেবান পুনরায় ক্ষমতায় আছে এবং শানদার হামলা করে ক্রুসেডারদের সম্মিলিত বাহিনীকে নাকানি-চুবানি খাওয়াচ্ছে আর নজর আলীর মতো পুলিশ অফিসাররা বিদেশি মেহমানদের আশ্রয় দেয়া ছাড়াও নিরাপদ যাতায়াত ব্যবস্থা দিতে বাধ্য হচ্ছে। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন–

وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ.

আর আমি সেই দিনগুলো মানুষের মধ্যে পালাক্রমে আবর্তন করি। *[আলে ইমরান ৩:১৪০]*

কমান্ডার মোল্লা আব্দুশ শুকুরের সাক্ষাৎ

আমি আমার সাথী আজমরের সাথে সমুদ্রের পুল পার হই। অপর পাড়েও প্রচুর দোকানপাট এবং হোটেল রয়েছে। এখানে সমুদ্রের তাজা মাছও পাওয়া যায়। আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ক্রয় করে পুনরায় আগের জায়গায় ফিরে আসি। ততক্ষণে নজর আলী আমাদেরকে যেখানে নামিয়েছিলো সেখানে কান্দাহার থেকে মোল্লা আব্দুশ শুকুরের পাঠানো ড্রাইভারও চলে এসেছে। আমরা তার সাথে গাড়িতে উঠে চুনার বসতির দিকে রওয়ানা হই। অল্পদূর যেতেই ড্রাইভার গাড়ি থামালো এবং রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা কোনো একজনের সাথে সাক্ষাতের জন্য নিচে নামলো। আমি এবং আজমরে গাড়িতেই বসে ছিলাম। হঠাৎ কানাডিয়ান ফৌজের কনভয় চলে আসে। তারা উর্জেগান থেকে কান্দাহার[৯] পর্যন্ত সীমাবদ্ধ সফর করছিলো। যার মধ্যে চারটি ট্যাংক, দু'টি

---

৯. কান্দাহারঃ কান্দাহার এক ঐতিহাসিক শহর। নতুন আফগানিস্তানের স্থপতি আহমদ শাহ আব্দালী রহ.ও এই কান্দাহারের কৃতি সন্তান ছিলেন। আজও কান্দাহারের চক শহীদানের কাছে তার মাজার রয়েছে। প্রেক্ষাপট হিসেবে মনে রাখুন যে, পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে আহমদ শাহ আব্দালী মাত্র ৪০ হাজার সৈন্যের জানবাজ মুজাহিদীন নিয়ে মারাঠীদের প্রায় ৯ লাখ সৈন্যের বিশাল বাহিনীকে তছনছ করে দিয়েছিলেন। মাজারে আহমদ শাহ আব্দালী রহ. এর নামের সাথে সম্পৃক্ত অনেক জিনিস পত্রও আছে। সেগুলোর মধ্যে তলোয়ার, বর্শা এবং অন্যান্য যুদ্ধ সরঞ্জাম রয়েছে। তাছাড়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সম্পৃক্ত কাপড়ও সংরক্ষিত আছে। আহমদ শাহ আব্দালী রহ. এর নামের সাথে সম্পৃক্ত একটি বড় শানদার জামে মসজিদও মাজারের সাথে রয়েছে। কান্দাহারের মাঝখানে অবস্থিত চক শহীদান হল সেসব শহীদানের স্মৃতি, যাঁরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বীরত্বের সাথে শহীদ হয়েছেন। কান্দাহারে তালেবান আসার আগে স্থানীয় জঙ্গী কমান্ডারদের আবাসস্থল হওয়ায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো। তালেবান আসার পর এখানে শান্তি ও নিরাপত্তা ফিরে আসে। তারা শহর উন্নত করেছিলো। তালেবানরা ওমর হাসপাতাল নতুন করে চালু করে। এই হাসপাতালে সর্বোচ্চ পর্যায়ের সুবিধা এবং অপারেশনের নতুন যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা করে। তালেবান কান্দাহারে জামেয়ায়ে ওমর প্রতিষ্ঠা

লোহার কপাটবদ্ধ গাড়ি এবং একটি ট্রাক ছিলো। আমি খুব মনোযোগের সাথে কনভয় পর্যবেক্ষণ করি। আমাদের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু কথা নোট করে রাখি। যেমন, গাড়ি এবং ট্যাংকের মধ্যে দূরত্ব, সেগুলোর সিরিয়াল, চলার গতি, ট্রাকে আরোহিত সৈন্যসংখ্যা ইত্যাদি। এ জন্য আমি আমার রবের শুকরিয়া আদায় করলাম যে, আমরা এই সফরের শুরুতেই নিজেদের মিশনের প্রয়োজনীয় তথ্য পেয়ে গেছি। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই ড্রাইভার এসে যায় এবং আমরা চুনারের দিকে রওয়ানা হই। এটি কাঁচা সড়ক হওয়ায় গাড়ির গতি বেশি ছিলো না। আসর নামাজ রাস্তায়-ই আদায় করি। মাগরিবের কিছুক্ষণ পূর্বে আমরা চুনার বসতিতে পৌঁছে যাই। সেখানে তালেবান কমান্ডার মোল্লা আব্দুশ শুকুর আমাদের অপেক্ষায় ছিলেন। সালাম-মুয়ানাকার পর মোল্লা আব্দুশ শুকুর আমাদের ভালো-মন্দ খোঁজ নিলেন। তারপর ড্রাইভারেরও শুকরিয়া আদায় করলেন। ড্রাইভার চলে যাওয়ার পর আমরা কমান্ডার মোল্লা আব্দুর শুকুরের সাথে তার বাগানে চলে আসি এবং সেখানে মাগরিবের নামাজ আদায় করি। তারপর আমরা মোল্লা সাহেবের সাথে তার মেহমানখানায় চলে যাই। মেহমানখানা তিনি তার বাগানেই বানিয়েছিলেন। বাগানের অধিকাংশই বাদাম গাছ। এছাড়া আঞ্জির, সফেদা এবং আনারের গাছও ছিলো। মোল্লা আব্দুশ শুকুরের হিজরত করার কারণে প্রয়োজনীয় যত্ন না নেয়ায় বাদাম গাছগুলোর অবস্থা তেমন ভাল ছিল না। কিছু শুকিয়েও গিয়েছিলো। অথচ আঞ্জির, সফেদা এবং আনার গাছের অবস্থা ছিলো সতেজ এবং ফলজ। বর্তমানে বাগানে পানি দেয়ার জন্য কূপ খনন করা হচ্ছিলো। আফগানি পরিভাষায় যাকে বাওড়ি বলে। এই কূপে রিপায়ার ইঞ্জিন লাগিয়ে টিউবঅয়েলের মাধ্যমে পানি বের করে বাগান এবং ফসলের ক্ষেতে সেঁচ দেয়া হয়।

আমরা মেহমানখানায় বসে আফগানিস্তানের অবস্থার উপর আলোচনা করছিলাম। ইতোমধ্যে মোল্লা আব্দুশ শুকুরের বড় ভাই খাবার নিয়ে আসেন। আমরা সবাই মিলে খাবার খেলাম এবং কফি পান করলাম। এশার নামাজ আদায়ের পর আমরা বিছানায় গা এলিয়ে দেই। দিনভর ক্লান্তিকর সফরের দরুন

করে, যেটিকে ব্যাপক আকারে উন্নত করে নতুন জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্র করতে চেয়েছিলো। কান্দাহারে একটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর রয়েছে, যাকে তালেবানরা হাওয়ায়ী ময়দান বলে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে এটিকে বিমানবন্দর মনেও হতো না, কিন্তু অভ্যন্তরীণ কার্যক্রম এবং নীতিমালা দেখার মতো ছিলো। ১৯৯৯ সালে হাইজাকাররা ভারতের বিমান ছিনতাই করে এখানে এনেছিলো এবং এর বদলায় ৩ জন বন্দীর মুক্তির দাবি করেছিলো। বাহ্যিক দৃষ্টিতে অশিক্ষিত, মূর্খ, গোয়ার এবং দুনিয়াবি কাজ-কামে জাহেল মনে করা এসব তালেবান এমন সুন্দরভাবে এই বিষয়টি সমাধান করে যে, গোটা পৃথিবী অবাক হয়ে যায়।

শুতেই ঘুমের জগতে হারিয়ে যাই। আমরা সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে ফজর নামাজের প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। ততক্ষণে মোল্লা সাহেবের ঘর থেকে কফির বড় কেটলি এবং নাশতা চলে আসে। আমরা ফজর নামাজ আদায় করে নাশতা করি। আফগানিস্তানের মানুষ সকাল সকালই নাশতা করে থাকে। আমাদের বড় বড় শহরের মতো দুপুর ১২ টায় নাশতা করে না।

আফগানিস্তানে আমি কফি পানের অভ্যাস প্রচুর দেখেছি। বিশেষত কমান্ডার মোল্লা আব্দুশ শুকুরের হাতে। তিনি সকাল সকাল নাশতার সময় থেকে কফি পান করা শুরু করতেন এবং সেই ধারা সারাদিন চলতো। আমরা আফগানিস্তানের যেখানেই গিয়েছি, এই কফিকে আফগানিদের হাতে একই অবস্থায় পেয়েছি। রাতে ঘুমে যখন চোখ বন্ধ হয়ে আসতো তখন কফি বড় মুশকিল অবস্থা থেকে মুক্তি পেতো। নাশতার পর আমরা মোল্লা সাহেবের সাথে দু'টি মোটর সাইকেলে চড়ে নিকটবর্তী এক বসতিতে যাই। সেখানে আমাদের পঞ্চাশের অধিক মুজাহিদ সাথী অবস্থান করছিলো। তাদের সাথে আমাদের সাক্ষাৎ এবং পরিচয় হলো। তারপর মোল্লা সাহেব কাজের ব্যাপারে সকলের মতামত নিলে সকলকেই পূর্ণ আগ্রহী পেলেন। সকল মুজাহিদীন ক্রুসেডারদের থেকে শহীদানের বদলা নিতে তাদের উপর কার্যকর হামলা করতে প্রস্তুত ছিলো।

তালেবানের রণপ্রস্তুতি

হযরত আমিরুল মুমিনীন দা.বা. যুদ্ধ বিষয়ক কার্যক্রমের সাধারণ দায়িত্ব মোল্লা আব্দুল গনী বেরাদারের উপর দিয়েছিলেন। আফগানিস্তানের যুদ্ধ সংক্রান্ত সকল কাজ মোল্লা বেরাদারের তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়। ২০০৬ সালের বসন্তকালে তিনি তালেবান কমান্ডারদের জন্য এক উপদেশ জারি করেন। যাতে তিনি তালেবানের এ বছর ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছিলেন। আল্লাহ তায়ালা তার পবিত্র কিতাব, কুরআন মাজিদে মুসলমানদের উপর এক ফরজ দায়িত্ব অর্পণ করেছেন–

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ

আর সেসব কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য তোমাদের সাধ্য অনুযায়ী শক্তি অর্জন কর। *[আনফাল ৮:৬০]*

শক্তির মধ্যে যুদ্ধাস্ত্র এবং যুদ্ধ সংশ্লিষ্ট সকল সরঞ্জাম অন্তর্ভূক্ত। নিজের শারীরিক কসরত, রণকৌশল শেখা এবং সেগুলোর প্রাকটিস করাও শক্তি অর্জনের অন্তর্ভূক্ত। আর এই ফরজকে সামনে রেখে হযরত আমিরুল মুমিনীন দা.বা. এর

যুদ্ধ সংক্রান্ত উপদেষ্টা মোল্লা বেরাদার তালেবানদেরকে যুদ্ধের পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করতে আদেশ জারি করেন।

কারী ফয়জুল্লা সাহেব[১০] মোল্লা আব্দুশ শুকুরকে মোল্লা বেরাদারের এই হুকুমনামা সম্পর্কে অবগত করেন এবং ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণের হুকুম দেন। তিনি এ কথাও বলেন, এ বছর কানাডিয়ান ফৌজের যাতায়াত বন্ধ করাসহ আফগান ন্যাশনাল আর্মির ঠিকানাগুলো ধ্বংস করতে হবে। নিজেদের বন্দী মুজাহিদীনকেও মুক্ত করতে হবে। যেসব লোক ক্রুসেডারদের হাত হয়ে আছে এবং আফগানিস্তানে ক্রুসেডারদের শক্তিশালী করার কারণ হয়ে আছে তাদেরকেও টার্গেট করতে হবে।

মোল্লা আব্দুশ শুকুর নিজের সাথীদেরকে সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করেন এবং মোল্লা বেরাদারের পক্ষ থেকে আগত পরামর্শ সম্পর্কেও অবগত করেন। তিনি বলেন, আমাদের হাতে ১৫/২০ দিন সময় আছে। এর মধ্যেই আমাদেরকে প্রস্তুতি শেষ করতে হবে। তারপর সিদ্ধান্ত হলো, এবার প্রথমে খাকরিজ জেলায় এক সম্মিলিত আক্রমণ পরিচালনা করা হবে। যার মধ্যে অন্যান্য জেলার তালেবানরাও শরীক হবে। এই হামলায় খাকরিজের জেল, থানা, আফগান ন্যাশনাল আর্মির ঠিকানা এবং অন্যান্য সরকারি সম্পদকে টার্গেট বানানো হবে।

অল্প কিছুদিনের মধ্যেই অন্যান্য জেলার মুজাহিদীনের প্রস্তুতির সংবাদ আসতে থাকে। তারপর একদিন তারা কমান্ডার মোল্লা আব্দুশ শুকুরের নিকট সংবাদ পাঠালো, আমাদের প্রস্তুতি শেষ। এখন আপনি আমাদেরকে নিয়ে যাওয়ার জন্য লোক পাঠিয়ে দিন।

বিভিন্ন জেলার তালেবানের আগমন

নিশ জেলার তালেবান কমান্ডার ছিলেন মৌলভী বায মুহাম্মাদ। তিনি স্যাটেলাইট ফোনের মাধ্যমে কমান্ডার মোল্লা আব্দুশ শুকুরকে নিজের প্রস্তুতির সংবাদ দিয়ে বললেন, আমাদের প্রস্তুতি শেষ, আমাদেরকে নিয়ে যাওয়ার জন্য সাথী পাঠিয়ে দিন। তিনি তার ওয়ারলেস সেটের নাম্বার দিয়ে বললেন, নিশ জেলার কাছাকাছি এসে এই নম্বরে যোগাযোগ করবেন। আমি, আজমরে এবং মুসা, কমান্ডার মোল্লা আব্দুশ শুকুরের নেতৃত্বে নিশ জেলার মুজাহিদীনকে আনতে রওয়ানা হলাম। আমরা চারজন দু'টি মোটর সাইকেলে চড়ে নিজেদের গন্তব্য

[১০] তিনি তালেবানের কেন্দ্রীয় শুরার রোকন, হিসাব বিভাগের জিম্মাদার, মিএগ্রাশিন, শাহ ওলিকোট, খাকরিজ এবং নিশ জেলার সাধারণ যুদ্ধ কমান্ডার।

নিশ জেলার দিকে যাচ্ছিলাম। সামনের রাস্তা খুবই সংকীর্ণ এবং কঠিন ছিলো। যার উপর দিয়ে মোটর সাইকেল চালানো অসম্ভব। আমরা পাহাড়ের পাদদেশে বানানো এক বাড়িতে মোটর সাইকেল রেখে পায়ে হেঁটে রওয়ানা হলাম। রওয়ানা হওয়ার আগে মোল্লা আব্দুশ শুকুর বাড়িওয়ালার কাছ থেকে চেয়ে দুই ফ্লাস্ক কফি নেন। কিন্তু কষ্টের বিষয়, অল্পদূর যেতেই পাথরের সাথে ধাক্কা লেগে একটি ফ্লাস্কের গ্লাস ভেঙ্গে যায় এবং কফি নষ্ট হয়ে যায়। যারফলে মোল্লা সাহেবের নিয়ে আসা কফির একটি মাত্র ফ্লাস্ক বাকি থাকে। আমরা আধা ঘণ্টারও বেশি রাস্তা সফর করেছিলাম। সেখানে একজন রাখালের দেখা পাই। সে এসে মোল্লা অব্দুশ শুকুরকে বলল, আমাকে আমেরিকানরা ছয় মাস পর্যন্ত কান্দাহার এয়ারপোর্ট এবং বাগরাম জেলে বন্দি রাখে। সেখানে আমাকে কঠিন শাস্তির টার্গেট বানায়। তারপর এই সতর্কবাণীসহ ছেড়ে দেয় যে, দ্বিতীয় বার যদি তালেবানকে আশ্রয় দেই এবং সহযোগিতা করি তাহলে এরচেয়েও কঠিন ব্যবহার করা হবে। সে আরো বলল, কিন্তু তালেবানের জন্য আমার জান এবং মাল সবকিছু হাজির। ইসলাম প্রতিষ্ঠার এই পবিত্র আন্দোলনে ক্রুসেডার এবং ইসলামের দুশমন গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যে কোনো কুরবানী দিতে সামান্যতম দ্বিধা করবো না। আমি এই গরিব এবং ফকির রাখালের অবিচলতা দেখে হয়রান হচ্ছিলাম। তার বুকের পাটা দেখার মতো! আমি বললাম, যদি মুজাহিদীনের সাথে এ ধরনের লোক সঙ্গী থাকে, তাহলে ক্রুসেডার সম্মিলিত বাহিনীর যে পরাজয় হবে, তা হবে দেখার মতো এবং দৃষ্টান্তমূলক। কমান্ডার মোল্লা আব্দুশ শুকুর তালেবান মুজাহিদীনের খেদমত করার জন্য তার প্রশংসা করলেন এবং তার অবিচলতার জন্য দোয়া করে বিদায় নিলেন। আমরা পাহাড়ের উপর দুর্গম রাস্তা দিয়ে দুই থেকে আড়াই ঘণ্টা পর্যন্ত চলার পর পাহাড়ের চূড়ায় পৌছি। সাথীরা খুবই ক্লান্ত হয়ে যায়। আমি নিজের ওয়ারলেস সেট অন করে নিশ জেলার তালেবানের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করি। পাহাড়ের চূড়া থেকে নিচে নিশ জেলা স্পষ্টই দেখা যাচ্ছিলো। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই নিশ জেলার মুজাহিদীনের সাথে লাইন পেয়ে যাই। আমরা যেখানে অবস্থান করছিলাম, আমি সেখানকার পরিচয় দেই এবং মোল্লা আব্দুশ শুকুরের পক্ষ থেকে সংবাদ দেই, তারা যেনো খুব দ্রুত রওয়ানা হয়ে উপরে চলে আসে।

আমরা আমাদের কাছে থাকা পানি দিয়ে অজু করি এবং যোহর নামাজ আদায় করে মুজাহিদীনের কামিয়াবির জন্য দোয়া করি। আমরা নামাজ থেকে ফারেগ হতেই এক রাখাল উপরে চলে আসে। তার সাথে দুই-আড়াই শত ভেড়া ছিলো। আমি তার সাথে গল্প জুড়ে দেই। তার অবস্থাদি জানতে চাই এবং এলাকা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি। আমাদের পানি শেষ হয়ে গিয়েছিলো। আমরা

তার নিকট ঋর্ণার ব্যাপারে জানতে চাই। সে বলল, কাছাকাছি কোনো ঝর্ণা নেই। কিন্তু আমার নিকট পান করার মতো অল্প পানি আছে। সে তা-ই আমাদেরকে দিয়ে দেয়।

এই রাখালের নিকট একটি পুরাতন ডিজাইনের থ্রি-নট-থ্রি গান ছিলো। যা নন-অটোমেটিক। এতে এলএমজির গুলি ব্যবহার করা হয়। এটির নিশানা খুবই ভালো। এমন কি মুজাহিদীন এটিকে স্নাইপ (Snipe) তথা আড়াল হতে গুলি করার কাজেও ব্যবহার করে থাকে। এটির রেঞ্জও অনেক বেশি। আমি নিজেও এমন গান দিয়ে নিশানা প্রাকটিস করেছি। ইসলামী তালিম-তারবিয়াতেও টার্গেটিং শেখার হুকুম রয়েছে। কুরআনের আয়াত–

وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ.

এই আয়াতে শক্তি অর্জনের হুকুম দেয়া হয়েছে। আয়াতের তাফসীরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ.

জেনে রাখো! শক্তি হলো নিক্ষেপন শক্তি। জেনে রাখো! শক্তি হলো নিক্ষেপন শক্তি। জেনে রাখো! শক্তি হলো নিক্ষেপন শক্তি। *[মুসলিম শরীফ, কিতাবুল ইমারাহ, হাদীস নং ১৯১৭]*

اَلرَّمْيُ শব্দের অর্থ নিক্ষেপ করা অথবা নিশানা ঠিক করা। সুতরাং জানা গেলো, কুরআন মাজিদে এমনিতেই সব ধরনের অস্ত্র এবং সরঞ্জাম প্রস্তুত করাকে মুসলমানদের জন্য শরয়ীভাবে ফরজ করেছে। সেগুলোর সবকিছুই اَلْقُوَّةَ এর অন্তর্ভূক্ত, কিন্তু এসবের মধ্যেও যেসব অস্ত্র নিক্ষেপ করে মারতে হয় ইসলামে সেসবের বিশেষ এবং অত্যধিক গুরুত্ব রয়েছে। বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে তো সকল যুদ্ধ, চাই তা স্থল, নৌ কিংবা বিমানযুদ্ধ হোক, সবই এই اَلرَّمْيُ এর অন্তর্ভূক্ত।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বাণীসমূহের মধ্যে নিশানা ঠিক করতে খুবই গুরুত্ব দিয়েছেন। এমনকি নিরাপদ সময়ের জন্যও বলেছেন–

سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ أَرَضُونَ وَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ فَلَا يَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَلْهُوَ بِأَسْهُمِهِ.

> অচিরেই তোমরা ভূখণ্ডসমূহ বিজয় করবে এবং আল্লাহ তায়ালাই তোমাদের জন্য যথেষ্ট হবেন। সুতরাং তোমাদের কেউ তখন (নিরাপদ সময়ে) তীরন্দাজি ছেড়ে দিও না। *[মুসলিম শরীফ, কিতাবুল ইমারাহ, হাদীস নং ১৯১৮]*

কুরআন মাজিদ হিফজ করে ভুলে যাওয়া যেমন গুনাহের কাজ, তেমনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিশানাবাজি শিখে ভুলে যাওয়াকেও গুনাহ বলেছেন। তিনি বলেন–

> مَنْ عَلِمَ الرَّمْيَ ثُمَّ تَرَكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا أَوْ قَدْ عَصَى.
>
> যে নিশানাবাজি শিখলো এবং তারপর ভুলে গেলো, সে আমাদের অন্তর্ভূক্ত নয়, অথবা সে গুনাহ করলো। *[মুসলিম শরীফ, কিতাবুল ইমারাহ, হাদীস নং ১৯১৯]*

আল্লাহ তায়ালার দয়া এবং অনুগ্রহে আমি শুরু থেকেই নিশানাবাজির প্রতি আগ্রহী ছিলাম। বিভিন্ন অস্ত্র চালনা বিভিন্ন সময়ে শিখেছি। আমি সর্বদাই নিশানাবাজি প্রাকটিস করতে প্রস্তুত থাকি। এখানেও আমার নিকট গুলি ছিলো, যেগুলো দিয়ে আমি টার্গেট বোর্ডে নিশানাবাজি করি এবং ঠিক ঠিক নিশানায় লাগাই। সকল প্রশংসা আল্লাহরই জন্য।

যাই হোক, আমি রাখালকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি এই গান দিয়ে কী করো? সে বলল, এই পাহাড়ে খাটাশ, নেকড়ে ইত্যাদি আছে। সেগুলো ভেড়ার উপর আক্রমণ করে। আমি এই গান দিয়ে সেগুলোকে নিশানা বানাই। তাছাড়া নিজের নিরাপত্তার জন্যেও এটাকে ব্যবহার করি। আমি তাকে বললাম, এটা একটি ভালো অস্ত্র। এর নিশানাও নির্ভুল। ইতোমধ্যে আমি নিশ জেলা থেকে আগত সাথীদেরকে উপরে উঠতে দেখলাম। তাদেরকে দেখে নিরাপত্তার খাতিরে রাখালকে বিদায় করে দেই। কারণ, সেও নিশ জেলার বাসিন্দা ছিলো। তখন যোহর এবং আসরের মধ্যবর্তী সময় ছিলো। সাথীরা যখন আমাদের একেবারে নিকটে চলে আসে তখন আজমরে তাদেরকে আওয়াজ দিতে থাকে। তারা ইচ্ছাকৃতই আওয়াজ না শোনার ভান করছিলো। আজমরে যখন এটা বুঝতে পারলো, তখন দুষ্টুমির ছলে একটি বড় পাথর তাদের দিকে ছেড়ে দেয়। তারা নিজেদের দিকে পাথর আসতে দেখে ডানে বামে ছুটে জান বাঁচায়। আর আজমরে এই অবস্থাকে হ্যান্ডিক্যাম ভিডিও ক্যামেরা দিয়ে ভিডিও করতে থাকে।তখনই ক্রুসেডার সম্মিলিত বাহিনীর হেলিকপ্টার পাহাড়ের উপর চক্কর দিতে শুরু করে। আমরা লুকিয়ে যাওয়াকেই নিরাপদ মনে করি। হেলিকপ্টার এক দু'বার চক্কর দেয়ার পর চলে যায়। ততক্ষণে নিশ জেলার তালেবান সাথী

রহমতুল্লাহ, গুল আগা, শের খান, লুয়ি দরাজ, নূর আলম এবং অন্যান্যরা উপরে পৌঁছে যায়। নিশ জেলার কমান্ডার মৌলভী বায মুহাম্মাদও তাদের সাথে ছিলেন। সাথীরা সফর করে খুবই ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিলো। তারা অল্প কিছুক্ষণ আরাম করলো। তারপর আমরা পুনরায় মেহমান সাথীদেরকে নিয়ে ফিরতি সফর শুরু করলাম। তখন আমাদের নিকট পান করার মতো কোনো পানি ছিলো না। কাছাকাছি কোনো ঝর্ণাও ছিলো না, যা থেকে আমরা পানি সংগ্রহ করবো। পাহাড়টিও পানি এবং গাছশূন্য শুকনো ছিলো। দিনভর ক্লান্তিকর সফরের কারণে খুবই পিপাসা অনুভব হচ্ছিলো। জিহ্বা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। গলায় সুঁইয়ের মতো বিঁধছে। আমরা পাহাড় থেকে নিচের দিকে নামছিলাম, হঠাৎ পাহাড়ের পাদদেশে ঠাণ্ডা এবং মিষ্টি পানির একটি ঝর্ণা দেখতে পেলাম। আল্লাহ রব্বুল ইজ্জতের কুদরতের এক বড় প্রদর্শনী, চারদিকে শুকনো পাথরখণ্ড এবং প্রাণহীন পাহাড়, আর তারই মাঝে যিন্দেগির আত্মার হাতছানি। যেখান থেকে কীট-পতঙ্গ, পাখি, মানুষ ও চতুষ্পদ প্রাণী সবাই পানি পান করে। আল্লাহ রব্বুল ইজ্জতের যবানে–

وَاللّٰهُ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ.

আল্লাহ তায়ালাই সর্বোত্তম রিযিকদাতা। *[জুমুয়া ৬২ : ১১]*

আয়াতের বাস্তবতা এভাবেই সকলের সামনে ফুটে ওঠে। আমরাও ঝর্ণা থেকে পানি পান করি এবং আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করি। ঝর্ণার চারপাশে খুব সুন্দর ঘাসের গালিচা বিছানো ছিলো। তারই গা-ঘেষে জন্মেছে জংলী পুদিনা পাতা। সেসবের সতেজ খুশবুতে আবহাওয়া ছিলো সুগন্ধিযুক্ত। সাথীরা পানি পান করলো এবং কিছুক্ষণ আরাম করার পর আসর নামাজের জন্য অযু করে আল্লাহ রব্বুল ইজ্জতের সামনে সেজদায় নত হয়ে গেলো।

আসর নামাজ আদায়ের পর হাত উঠিয়ে সকল সাথী আল্লাহ তায়ালার নিকট তালেবানের ইসলামী আন্দোলনের কামিয়াবি, বন্দীদের মুক্তি এবং মুজাহিদীনের সাহায্য সহযোগিতার জন্য দোয়া করতে থাকে। সকল সাথী দিনভর ক্লান্তিকর সফরের কারণে ক্লান্ত ছিলো। তাই সিদ্ধান্ত হলো, বাকি সফর সকালে করা হবে এবং রাত এখানেই কাটানো হবে। কারণ, এটি একটি খোলামেলা এবং সম্পূর্ণ নিরাপদ জায়গা। কিছু সাথীকে নিচে খাবারের জন্য পাঠানো হলো। আমরা জামাতের সাথে মাগরিবের নামাজ আদায় করলাম। খাবার আনতে যাওয়া সাথীরা তিন ঘণ্টা পর আমাদের কাছে পৌঁছে। আমরা খাবার খেয়ে এশার নামাজ আদায় করি এবং পাহারার পালা ঠিক করে ঘুমিয়ে যাই।

আমরা সকালে জাগ্রত হই। ফজর নামাজ আদায় করে কফি আর শুকনো রুটির টুকরো দিয়েই নাশতার পর্ব শেষ করি। তারপর নিজেদের অস্ত্রাদি ঠিক করে অন্ধকার থাকতেই সফর শুরু করি। দুই-আড়াই ঘন্টার উৎড়াই (নিচে নামার) সফর প্রায় সোয়া ঘন্টার মধ্যে শেষ করে আমরা সেখানে পৌছে যাই, যেখানে একটি বাড়িতে মোটর সাইকেল রেখে গিয়েছিলাম। আমরা সেখানে পানি পান করলাম। তারপর মোটর সাইকেল নিয়ে বাড়ির মালিকের শুকরিয়া আদায় করে সেখান থেকে চলে আসি এবং আধা ঘন্টার মধ্যে লুড়াওয়ালা বসতিতে পৌছি। আমরা সেখানে দুপুরের খাবার খাই। সাথীরা বিশ্রাম করতে থাকে আর আমি শাহ ওলিকোট জেলার মুজাহিদীনের সাথে যোগাযোগে ব্যস্ত হয়ে যাই। বহু কষ্টে লাইন পাই এবং তাদের সামনে অবস্থা তুলে ধরি। তারা বলল, আমরা ৪/৫ দিনের মধ্যে পৌছে যাবো, আর মিঞ্জাশিন জেলার তালেবান মুজাহিদীনও আমাদের সাথেই আসবে। শাহ ওলিকোটের তালেবান কমান্ডার ছিলেন মোল্লা আব্দুল হাকিম এবং মিঞ্জাশিন জেলার কমান্ডার কারী ফয়জুল্লাহ। ছয়দিনের মধ্যে খাকরিজ, নিশ, মিঞ্জাশিন এবং শাহ ওলিকোট জেলার মুজাহিদীন আমাদের নিকট চুনার বসতিতে একত্রিত হয়ে যায়।

শাহ ওলিকোটের মুজাহিদীন বলল, রাস্তায় আমরা এক বিদেশি কন্সট্রাকশন কোম্পানিকে টার্গেট বানিয়েছি। আমরা কোম্পানির লোকদেরকে আগেই বলেছিলাম, এই এলাকা ছেড়ে দাও, ক্রুসেডার বাহিনীর জন্য থাকার ঘর এবং অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণ করো না। তাদেরকে এও বলেছিলাম যে, তোমাদের সাথে আমাদের কোনো দুশমনি নেই এবং তোমাদেরকে নিশানাও বানাতে চাই না। কিন্তু এই বিদেশি কন্সট্রাকশন কোম্পানির দায়িত্বশীলরা এর কোনো গুরুত্ব দেয়নি। এগুলোকে পাগলের প্রলাপ মনে করে ফিরিয়ে দেয় এবং ক্রুসেডারদের জন্য জোরেশোরে স্থাপনা নির্মাণ করতে থাকে। নিরাপত্তার জন্য আফগান ন্যাশনাল আর্মির পাহারা নিযুক্ত করে নেয়। তারপরই আমরা এই কন্সট্রাকশন কোম্পানিকে নিশানা বানানোর সিদ্ধান্ত নেই। তারা আরো বলেন, আমাদের জিম্মাদার মোল্লা আব্দুল হাকিম খাকরিজ যাওয়ার পথে এই কন্সট্রাকশন কোম্পানিকে নিশানা বানাতে হুকুম দিয়েছেন। আমরা কন্সট্রাকশন কোম্পানির বেজ ক্যাম্পের উপর আক্রমণ করি। এতে নিরাপত্তায় নিযুক্ত আফগান ন্যাশনাল আর্মির বারোজন সদস্য আত্মসমর্পণ করে এবং বাকিরা পালিয়ে যাওয়ার মধ্যে নিরাপত্তা মনে করে। ছোট-বড় ১৯টি গাড়ি ধ্বংস হয় এবং কন্সট্রাকশনের কাজে ব্যবহৃত মেশিনারিও ধ্বংস হয়। কোম্পানির ইঞ্জিনিয়াররা নিজেদের হটকারিতার কারণে ক্ষমা চেয়ে বলে, আমরা এখানে আর কাজ করবো না। আমরা নিজেদের

দেশে ফিরে যাবো। এসব ছাড়াও আফগান ন্যাশনাল আর্মির অস্ত্রাগার থেকে ১৫টি কালাশনিকভ এবং প্রচুর পরিমাণ গুলি গনিমত হিসেবে হাতে আসে। এভাবেই তালেবানরা নিজেদের সফল এবং সময়োপযোগী আক্রমণের মাধ্যমে এলাকাতে জুলুমের ঝাণ্ডাবাহী ক্রুসের পূঁজারীদের নির্মাণাধীন এক আড্ডা হওয়ার আগেই ধ্বংস করে দেয়। এতে এলাকার লোকেরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

গোয়েন্দার দৃষ্টান্তমূলক পরিণতি

যখন আমাদের নিকট মিঞাশিনের তালেবান সাথীরা আসে তখন থেকে আমাদের সাহায্য সহযোগিতার উপর গোপনে এবং আড়ালে কাজ চলতে থাকে। তৃতীয় দিন কমান্ডার মোল্লা আব্দুশ শুকুর আমাকে বললেন, হায়াতুল্লাহ! তোমার ভিডিও ক্যামেরা সঠিকভাবে কাজ করে? আমি বললাম, মানে? মোল্লা সাহেব স্পষ্ট করে বললেন, তোমার ক্যামেরা রাতে ঠিকঠাক কাজ করে তো? আমি বললাম রাতে খুব ভালো কাজ করে। তিনি বললেন, দ্রুত প্রস্তুত হও, আজ মোল্লা হায়দারের সাথে তোমাকে এক জরুরি কাজে যেতে হবে। কিন্তু তিনি আমাকে কাজের ব্যাপারে কিছুই বললেন না। আমি ক্যামেরার ফিতা পরিবর্তন করে নতুন ক্যাসেট ঢুকাই এবং নিজের গান নিয়ে বাইরে আসি। গাড়ি আগে থেকেই প্রস্তুত ছিলো। গাড়িতে মোল্লা হায়দার, খলিফা ভাই (মোল্লা আব্দুল হাকিমের নিকটতম সাথী) এবং ড্রাইভার বসা ছিলো। আমি সফরের দোয়া পড়ে গাড়িতে উঠে বসি। গাড়িতে উঠে এক লোককে চোখে পট্টি বাঁধা অবস্থায় বসে থাকতে দেখি। উভয় হাত পিছনে বাঁধা ছিলো। আমি এই লোকের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, এর নাম ফজলে রাব্বি। সে সম্মিলিত ক্রুসেডার বাহিনীর গুপ্তচর। তালেবানরা তাকে একবছর আগেও গুপ্তচর সন্দেহে গ্রেফতার করেছিলো। তার আত্মীয়-স্বজন এবং এলাকার লোকদের সুপারিশের ভিত্তিতে ছেড়ে দেয়া হয়েছিলো। কারণ, সাক্ষীও পুরোপুরি ছিলো না। এর জন্য তাকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছিলো। সে প্রতিজ্ঞা করেছিলো, দ্বিতীয় বার তালেবানের বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তি করবে না। লোকটি কান্দাহার এয়ারপোর্টে ক্রুসেডারদের চাকুরি করে। সে গুপ্তচরবৃত্তির মাধ্যমে পাঁচজন তালেবানকে শহীদ এবং কয়েকজনকে গ্রেফতার করিয়েছে।

কিন্তু এবার আমরা পুরোপুরি তদন্ত করে তাকে গ্রেফতার করেছি। এর মজবুত সাক্ষীও তালেবান কাজির সামনে পেশ করা হয়েছে। তারপর তিনি ফিকহে হানাফীর দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে তার শিরচ্ছেদের রায় দিয়েছেন।

আজমরে এবং আল্লাহ তায়ালার রহমত

গুপ্তচরকে তার পরিণাম পর্যন্ত পৌছানোর পর আমরা চুনার বসতিতে পৌছে যাই। রাতের খাবার খেয়ে রাত কাটানোর জন্য নিকটবর্তী বসতি তাম্বিল চলে যাই। সকালে ফজর নামাজ আদায়ের পর মোল্লা আব্দুশ শুকুর ওয়ারলেসের মাধ্যমে আমাকে জানালেন, আমি যেন দ্রুত চুনার বসতিতে চলে আসি। ফজর নামাজের পর আমি নাশতা করি এবং চুনার বসতিতে চলে আসি। মোল্লা সাহেব আমাকে খরতুত বসতিতে নিযুক্ত করেন। যেটি কান্দাহার টু গম্বুজ রোডে অবস্থিত। গম্বুজ বসতিতে কানাডিয়ান সৈন্যরা ক্যাম্প করেছিলো। তালেবান গুপ্তচরের সংবাদ অনুযায়ী প্রতি মাসের ৪ তারিখে কানাডিয়ান আর্মির ডিউটি পরিবর্তন হয়। তারা কাফেলাবদ্ধ হয়ে কান্দাহার থেকে গম্বুজ বসতিতে আসে এবং কাফেলাবদ্ধ হয়েই ফিরে যায়। তাই কাফেলার রাস্তায় মাইন বিছানোর জন্য আমাকে এবং আজমরেকে নিযুক্ত করা হয়। আমরা দশটার দিকে রওয়ানা হই। দুই ঘণ্টা মোটর সাইকেলে সফর করার পর মোল্লা আব্দুশ শুকুরের বিশেষ ব্যক্তি গোলাব খানের কাছে পৌছি। গোলাব খানকে আমাদের পরিচয় দেই এবং মোল্লা আব্দুশ শুকুরের সংবাদ পৌছে দেই। গোলাব খান আমাদেরকে তার মেহমানখানায় নিয়ে যান এবং আফগানি কফি দিয়ে আপ্যায়ন করেন। তিনি আমাদেরকে এলাকা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দেন। আমরা প্রথমে এলাকা ও রাস্তা সম্পর্কে উপযুক্ত রেকি এবং জায়গা তালাশ করে মাইন বিছানোর সিদ্ধান্ত নেই। আমরা তখনই মোটর সাইকেল নিয়ে এলাকা রেকির জন্য বের হয়ে যাই। রেকির পর আমরা জানতে পারলাম আগামী কাল এখান দিয়ে কানাডিয়ান ফৌজের কাফেলা যাওয়ার পালা। তাই আমরা উপযুক্ত জায়গা তালাশ করি এবং আজ রাতই মাইন বিছানোর সিদ্ধান্ত নেই।

রেকি থেকে ফিরে এসে আমরা সামান্য সময়ের জন্য শুয়ে ছিলাম। তখনই মুয়াজ্জিনের হাইয়া আলাস সলাহ, হাইয়া আলাল ফালাহ-এর উদ্যোমী আওয়াজ আমাদের কামিয়াবি ও কাজ করার দাওয়াত দিতে থাকে। আমরা দ্রুত বিছানা থেকে পৃথক হই এবং গোলাব খানের বাগানে থাকা পুকুর থেকে অজু করে আল্লাহর দরবারে সেজদায় অবনত হই।

আসর নামাজ আদায়ের পর আমরা গোলাব খানের বাগানে পায়চারি করার জন্য বের হই। বাগানটি প্রায় তিন একর জমি নিয়ে বেষ্টিত ছিলো। এতে আনার, আঞ্জির, শাহতুত এবং বাদামের গাছ ছিলো। বাগানে পানি দেয়ার জন্য একটি বড় পুকুর বানানো হয়েছে। সেই পুকুরে একটি ছোট ঝর্ণা থেকে পানি আসে। পুকুরটি রাতে ভরে যায় এবং সকালে গোলাব খান পুকুরের পানি থেকে বাগান

ও তার পাশেই চাষ করা গম ক্ষেতে পানি দেন। পানি শেষ হয়ে গেলে তিনি সেই নালাটি বন্ধ করে দেন, যেটি দিয়ে পুকুরের পানি বের হয়। তারপর সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করেন এবং পরদিন পুকুর যখন আবার ভরে যায় তখন বাকি ফসলে পানি দেন। এভাবে চলতে থাকে। আমরা মাগরিবের নামাজ বাগানেই আদায় করে মেহমানখানায় ফিরে আসি। তারপর আমরা খাবার খেয়ে সারা দিনের রেকির উপর চিন্তা করতে থাকি। এরই মধ্যে মুয়াজ্জিনের জাদুকরি আওয়াজ আমাদেরকে এশার নামাজের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আমরা এশার নামাজ আদায় করি এবং নিজেদের জিহাদী মিশনের কামিয়াবি, নিজেদের নিরাপত্তা আর কাফেরদের ধ্বংসের জন্য দোয়া করি।

এবার আমাদের প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন। আমরা খোদাই করার সরঞ্জাম, টর্চ লাইট এবং দু'টি মাইন সাবধানে মোটর সাইকেলে বাঁধি। মুশকিল হলো, আমরা ছিলাম তিনজন। সাথে আক্রমণের সরঞ্জামও ছিলো। কিন্তু মোটরসাইকেল ছিলো মাত্র একটি। বসতি নিকটবর্তী থাকায় হেডলাইটও বন্ধ করে নেয়া প্রয়োজন। তাই সিদ্ধান্ত হলো, একজনকে রেখে যাওয়া হবে। আজমরে আমাকে থেকে যাওয়ার জন্য চাপাচাপি করতে লাগলো। সে বললো, তুমি থেকে যাও, আমি আক্রমণে যাবো। সুতরাং আমি সন্তুষ্টচিত্তে থেকে গেলাম। সেদিন ছিলো চাঁদের প্রথম তারিখ। চারদিকে হালকা আলো বিরাজ করছে। সাথীদেরকে চিন্তিত দিলে বিদায় দিয়ে আমি চলে আসি। এসে রাহমানুর রহীমের সামনে আঁচল বিছিয়ে সাথীদের নিরাপত্তা এবং কামিয়াবির জন্য দোয়া করতে থাকি। রাত আড়াইটার দিকে সাথীরা ফিরে আসে। তখন আমি ঘুমন্ত ছিলাম। মোটর সাইকেলের আওয়াজ আমাকে জাগ্রত করে দেয়। আমি সাথীদেরকে কাজের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে অন্ধকারে দাঁড়ানো গোলাব খান বললেন, মাইন ফেটে গেছে।

মাইন ফেটে গেছে

আমি এই অস্বাভাবিক আওয়াজ এবং দুঃখজনক কিছু শুনতে মোটেও প্রস্তুত ছিলাম না। আমি দ্বিতীয়বার জোর দিয়ে গোলাব খানকে জিজ্ঞেস করলাম, কী হয়েছে? আজমরে 'কোথায়? গোলাব খান জবাব দিলেন, মাইন ফেটে গেছে এবং আজমরে আহত। আমি এরই মধ্যে ইমারজেন্সি লাইট জ্বালাই। কামরায় হালকা আলো ছড়িয়ে পড়ে। গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখি আজমরে চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে। তার চেহারা জখমি ছিলো। ডান পা এবং ডান হাতে জ্বলে যাওয়ার স্পষ্ট নিদর্শন বিদ্যমান। তার কাপড়ও জ্বলে গেছে। আমি তৎক্ষণাৎ

তাকে ধরে বিছানায় শুইয়ে দেই। তার চেহারা থেকে ধুলোবালি পরিষ্কার করি। তারপর জখম পরিষ্কার করে ঔষধ লাগাই এবং তার শরীর থেকে জ্বলে যাওয়া কাপড় চোপড় পরিবর্তন করি। আজমরে ব্যথায় তখনো কাতরাচ্ছিলো। কিন্তু সবচেয়ে বেশি পেরেশানির কারণ ছিলো, আজমরে তখনো চোখ খুলছিলো না। মনে মনে এজন্য খুবই ভয় পাচ্ছিলাম যে, আল্লাহ না করুন চোখ নষ্ট হয়ে গেছে কি না? কিন্তু আমি এ সমস্ত ধারণা ঝেড়ে ফেলে আজমরেকে চোখ খুলতে বলি। সে বলল, যখন মাইন ব্লাস্ট হয় তখন অধিক আলো এবং মাটি চোখে ঢুকে যায়, যারফলে চোখে খুবই চোট লাগে। তাই চোখ খুলতে পারছি না। আমি তাকে প্রশ্ন করলাম এই ঘটনা কিভাবে ঘটলো? সে কাতরাতে, কাতরাতে বললো, আমি সারাদিনের রেকির পরিপ্রেক্ষিতে মাইন বিছানোর জন্য একটি উপযুক্ত জায়গা নির্বাচন করি। সেখানে খোদাই করার যন্ত্র দিয়ে বড় গর্ত করি এবং তারমধ্যে ডবল মাইন উপর দিকে ফিট করি। যাতে বিকট ও ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণে কানাডিয়ান আর্মির সর্বাধিক ক্ষতি হয়। এর সাথে নিরাপত্তা সিস্টেম এবং রিমোট কন্ট্রোলও ফিট করি, যাতে অপ্রয়োজনীয় ফ্রিকোয়েন্সিজ টোন থেকে নিরাপদ থাকে। তারপর আমার একদমই নিকটে বসে থাকা গোলাব খানকে বললাম, তিনি যেনো একটু দূরে চলে যান। কারণ, তখন আমি ব্যাটারি সেল লাগাচ্ছিলাম। যদি এর ইলেকট্রিক সিস্টেমে সমস্যা থাকে তাহলে আল্লাহ না করুন, বিস্ফোরণ হয়ে গেলে আমরা দু'জনই শহীদ হয়ে যাবো। গোলাব খান একটু দূরে সরে যান। আমি এটির নিরাপত্তা সিস্টেমের সাথে ব্যাটারি সেল ফিট করে দেই এবং এর ইলেক্ট্রনিক সিস্টেম ঠিক করে দেই। এবার আমি ক্যামোফ্লাজ[১১] করছিলাম যাতে কেউ খালি চোখে দেখে তার বের করতে না পারে। যখন আমি মাটি ঢালা শেষ করে মাটি সমান করতে থাকি তখনই তেজস্ক্রিয় আলোর সাথে বিকট বিস্ফোরণ হয়। সেই সাথে আমি জোরে ধাক্কা খাই এবং ১০ ফুট পেছনে ছিটকে পড়ি। জমিন থেকে উড়ে আসা পাথর আমার উপর পড়তে থাকে। গোলাব খান দৌড়ে আমার কাছে আসে। আমাকে ধরে উঠিয়ে সে নিজের হাতে আমার হাত পা চেক করে এবং আমাকে চোখ খুলতে বলে। আমি চোখ খুললে সে বলল, তুমি দেখতে পাচ্ছ? বললাম, হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি। তখন সে বললো, আল্লাহর শুকর, আল্লাহ তায়ালা তোমাকে নিরাপদ রেখেছেন। অন্যথায় যে মাইন ইস্পাতের ট্যাংক ধ্বংস করে দেয় এবং তার পুরো খাচা উড়িয়ে দেয়, আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত তা থেকে তোমাকে হেফাজত

---

[১১]. শত্রুচক্ষুকে ফাঁকি দেয়ার জন্য কোনো কিছুর সাহায্যে আড়াল করা বা পরিবেশের সাথে মিলানোর সাজে সজ্জিত হওয়া। –অনুবাদক।

করেছেন। তুমি সাধারণ জখমি হয়েছো। ইনশাআল্লাহ তা দ্রুতই ঠিক হয়ে যাবে। এরই মধ্যে একটি ভারি জিনিস পড়ার শব্দ এলো। গোলাব খান দেখলো, এটি দ্বিতীয় মাইন ছিলো। একটি তো ব্লাস্ট হয়েছে, দ্বিতীয়টি তার ধাক্কায় উপরে উঠে গেছে, যা কিছুক্ষণ পর নিচে নেমে আসে। আমি গোলাব খানকে বললাম, সরঞ্জাম গোছাও, ফিরে যাই। কারণ, বিকট বিস্ফোরণ হয়েছে। এতে এলাকায় থাকা ক্রুসেডার সৈন্যরা তদন্ত এবং তল্লাশি করতে চলে আসার আশঙ্কা রয়েছে। গোলাব খান দ্রুত সামানপত্র গুছিয়ে মোটর সাইকেলে রেখে আমাকেও উঠায়। তারপর ফিরতি পথে রওয়ানা হয়ে যাই। কিছু দূর যেতেই আমরা আক্রান্ত জায়গার আকাশে হেলিকপ্টারের আওয়াজ শুনতে পাই। কিন্তু কিছুই না পেয়ে তারা ফিরে যায়।

আমি আজমরের জ্বালা-যন্ত্রণা কমার জন্য ঔষধ লাগিয়ে দেই। তারপর ব্যথা কমা ও ঘুমের জন্য ট্যাবলেট খাইয়ে শুইয়ে দেই। পরদিন আমরা আজমরেকে নিয়ে চুনার বসতিতে চলে আসি। সেখানে ডাক্তার তাকে বিস্তারিত পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ঔষধ দেন। তারপর আমরা আজমরেকে উসমানিয়া বসতিতে পাঠিয়ে দেই। সেখানে তাকে ধারাবাহিক পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং চিকিৎসা করতে থাকে। এভাবে পূর্ণ সুস্থ হওয়া পর্যন্ত তার চিকিৎসা অব্যাহত থাকে। হিম্মতওয়ালা নওজোয়ান এবং উদ্যোমী আজমরের চেহারা সব রকমের ভয় ভীতি থেকে মুক্ত এবং গোলাব খানের মতোই তরতাজা ছিলো। তার স্পৃহাও জোয়ান ছিলো। তার মধ্যে আমি ঈর্ষা করার মতো এক গাজির চমক দেখতে পাই। যার সৌন্দর্য এবং সান্ত্বনায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

مِنْ خَيْرِ مَعَاشِ النَّاسِ لَهُمْ رَجُلٌ مُمْسِكٌ عِنَانَ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَطِيرُ عَلَى مَتْنِهِ كُلَّمَا سَمِعَ هَيْعَةً أَوْ فَزْعَةً طَارَ عَلَيْهِ يَبْتَغِي الْقَتْلَ وَالْمَوْتَ مَظَانَّهُ

মানুষের জীবনের সর্বোত্তম সময়ের মধ্যে একটি হলো, কেউ আল্লাহর রাস্তায় নিজের ঘোড়ার লাগাম বেঁধে তাতে সাওয়ার হয়। অতপর যখনই কোনো দুশমনের হুংকার অথবা মজলুমের আহ ধ্বনি শুনতে পায়, তখনই কতল এবং মৃত্যুর স্থান খুঁজে বাতাসের বেগে সেখানে ছুটে চলে।
[মুসলিম শরীফ, কিতাবুল ইমারাহ, হাদীস নং ১৮৮৯]

খাকরিজ জেলে হামলা

কানাডিয়ান আর্মির রাস্তায় মাইন বিছানোর জন্য আমাকে দায়িত্ব দেয়া হলো। এরই মধ্যে চুনারে তালেবানের সাধারণ মজলিসে শুরার বৈঠক হয়। তালেবানের মধ্যে মজলিসে শুরার এক অবধারিত নিয়ম আছে। সেটি হলো, সম্মিলিত মাশওয়ারা বা পরামর্শের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। কারণ, পরামর্শ হল ঐক্যের প্রাণ। এটি ছাড়া কোনো আন্দোলন বেঁচে থাকে না। মাশওয়ারা ছাড়া যেমন কোনো ঐক্য সম্ভব নয়, ঠিক তেমনি কোনো ঐক্য টিকেও থাকে না। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সলা-পরামর্শ পরস্পরের প্রতি নির্ভরতা এবং বিশ্বাস বাড়িয়ে দেয়। এতে অন্তরও পরিষ্কার থাকে। ইসলামে মাশওয়ারার গুরুত্ব এ থেকেই বুঝা সম্ভব যে, কুরআন মাজিদে এ বিষয়ে একটি পূর্ণ সুরা অবতীর্ণ হয়েছে। যার নাম সুরায়ে শুরা। এতে সত্যিকারের মুসলমানের গুনাবলি বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত একটি গুণ এমন বর্ণনা করেন–

وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

আর তাদের প্রত্যেক কাজ পারস্পরিক পরামর্শের মাধ্যমে হয়ে থাকে। *[শুরা : ৪২ : ৩৮]*

অন্য এক জায়গায় আল্লাহ তায়ালা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর জানবাজ এবং একান্ত অনুগত সাহাবায়ে কেরামের প্রতি অধিক অনুগ্রহ, দয়া প্রদর্শন এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজে তাদের সাথে পরামর্শ করতে তাকিদ দেন–

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ○

আল্লাহ তায়ালার রহমতের কারণে আপনি তাদের প্রতি বিনম্র। আপনি যদি শক্ত প্রকৃতির হতেন তাহলে তারা আপনার কাছ থেকে বিক্ষিপ্ত হয়ে যেতো। সুতরাং আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিন এবং তাদের জন্য ইস্তেগফার করুন। তাদের সাথে গুরুত্বপূর্ণ কাজে পরামর্শ করুন। আর যখন আপনি অটুট সিদ্ধান্ত নিয়ে নিবেন তখন আল্লাহ তায়ালার উপর ভরসা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা ভরসাকারীদেরকে ভালোবাসেন। *[আলে ইমরান : ৩ : ১৫৯]*

যাই হোক, শুরার বৈঠকে খাকরিজ জেলায় বন্দী আব্দুল হান্নানের মুজাহিদ সাথীদের মুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। কারণ, অন্যান্য এলাকার তালেবান মুজাহিদীনকে গ্রেফতার করে এখানে বন্দী করা হয়েছিলো। তাই আমাদের দায়িত্ব ছিলো তাদেরকে মুক্ত করা। এমনিতেই ইসলামী শিক্ষায় মুজাহিদীন এবং বন্দীদের মুক্ত করার অনেক ফজিলত এসেছে। সর্বপ্রথম থানার পাশে অবস্থিত জেল ও তার চারপাশের অবস্থা এবং তাদের নিরপত্তা ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে মোল্লা কাসেম, মুহাম্মাদ হাশেম এবং আব্দুল্লাহকে খাকরিজ পাঠানো হয়।

খাকরিজ শহর একটি পাহাড়ের সাথে অবস্থিত। সেখানে দাঁড়িয়ে শহরের 'এয়ার ভিউ' (আকাশ চিত্র) একদমই স্পষ্ট দেখা যায়। এই পাহাড় খাকরিজ থেকে শুরু হয়ে হেলমন্দের দিকে গিয়েছে। খাকরিজ ও চুনারের মাঝখানে কোনো পাহাড় নেই, বরং এটি বালুময় পাথুরে এলাকা। এর মধ্য দিয়ে বহু ছোট-বড় পানির নালা প্রবাহিত হয়েছে। সেগুলোকে বরফ গলার সময় এবং বর্ষার মৌসুমে নদীর মতো মনে হয়।

খাকরিজ শহরে দশ হাজারের মতো আবাদী রয়েছে। এর অধিকাংশ বাসিন্দা রাখালির মাধ্যমে জীবন-যাপন করে। খাকরিজের পাশে অবস্থিত পাহাড় থেকে এর উপরের চিত্র স্পষ্ট দেখা যায় এবং যে কোনো অস্বাভাবিক কার্যক্রম এখান থেকে সহজেই নোট করা যায়।

পর্যবেক্ষণকারী দল শহরের নিকটে পৌঁছে সিদ্ধান্ত নিলো, একজন পাহাড়ের উপর থেকে শহরের দিকে দৃষ্টি রাখবে। সে যে কোনো অস্বাভাবিক নড়া চড়ার প্রতি লক্ষ্য রাখবে এবং ওয়ারলেসের মাধ্যমে চুনার বসতিতে অবস্থানরত জিম্মাদারদের সাথে যোগাযোগ রাখবে। এই কাজের জন্য মোল্লা মুহাম্মাদ কাসেমকে পাহাড়ের উপর নিযুক্ত করে মুহাম্মাদ হাশেম এবং আব্দুল্লাহ মোটর সাইকেলে সওয়ার হয়ে শহরের দিকে যেতে থাকেন। আব্দুল্লাহ একটি পানির নালাতে মোটর সাইকেল থেকে পড়ে গিয়ে আহত হন। মুহাম্মাদ হাশেম তাকে এক ডাক্তারখানা থেকে ব্যান্ডেজ করায় এবং সারাদিন শহরে থেকে রেকি সম্পন্ন করে সন্ধ্যায় ফিরে আসেন।

তারা এসে বললেন, শাহ আগা এর দরবারের দক্ষিণ পাশে থানা। থানা ডাবল গুদাম বিশিষ্ট বিল্ডিংয়ের মাঝখানে অবস্থিত। বাইরের চার দেয়াল এবং বিল্ডিংয়ের মাঝখানে একটি আঙিনা আছে। বিল্ডিংয়ের ছাদে দু'জন সৈন্য পাহারায় নিযুক্ত। তারা কালাশনিকভে সজ্জিত। থানার পেছন দিকে আফগান ন্যাশনাল আর্মির ইউনিট (শাখা) আছে। সেখানে কমপক্ষে পঞ্চাশেরও অধিক কর্মচারী থাকে। জেলের নিরাপত্তার জন্যই কর্মচারীদের ডিউটির প্রয়োজন।

থানার দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ২০০ মিটার পর্যন্ত পাথুরে এলাকা। এতে কোনো বিল্ডিং নেই। এখানে রয়েছে বড় বড় পাথর, যা যুদ্ধের সময় খুব সহজেই মোর্চার কাজ দেবে। এর সামনে থেকে শুরু হয়েছে জেলের দেয়াল, যা ১৫ ফুট উঁচু। এটি একটি ছোট জেল। এতে প্রায় ১০০ কয়েদি রাখার সুযোগ রয়েছে। নিরাপত্তার দায়িত্ব ও অন্যান্য কাজে নিযুক্ত মোট কর্মচারীর সংখ্যা প্রায় ১২০ জনের মতো। বাকি নিরাপত্তা রক্ষীরা থানায় থাকে। এই জেলখানা আইনমন্ত্রনালয় এবং কারাগার অফিসার নিয়ন্ত্রণ করে।

মুহাম্মাদ হাশেম এবং আব্দুল্লাহ এসব কিছু মোল্লা আব্দুশ শুকুর এবং কারী ফয়জুল্লাহ সাহেবের নিকট বর্ণনা করেন। মোল্লা আব্দুশ শুকুর কারী ফয়জুল্লাহ সাহেবের পরামর্শ অনুযায়ী মোল্লা কাসেমকে ওয়ারলেসের মাধ্যমে পরামর্শ দিয়ে বলেন, তুমি পাহাড়ের উপরই অবস্থান করো এবং শহরের উপর দৃষ্টি রাখো। পুলিশ, আফগান ন্যাশনাল আর্মি অথবা সম্মিলিত ক্রুসেডারদের কোনো কনভয় এলে তৎক্ষণাৎ সংবাদ দেবে। কারী ফয়জুল্লাহ সকল সাথীকে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে বলেন। আমাদের সাথে প্রায় ১০০ তালেবান মুজাহিদ যুদ্ধে যেতে প্রস্তুত ছিলো। লুড়াওয়ালা, চুনার এবং তাম্বিল বসতির বেশকিছু নওজোয়ান আমাদের সাথে ছিলো। তারা আমাদের সাথে যুদ্ধে যেতেও প্রস্তুত ছিলো। এর জন্য স্থানীয় লোকেরা আমাদেরকে তিনটি গাড়ি দেয়ারও ওয়াদা করে, যেগুলোতে সর্বোচ্চ ২৫ জন সাথী আরোহন করতে পারবে। কিন্তু যুদ্ধে যাওয়ার জন্য প্রায় ১০০ সাথী প্রস্তুত ছিলো। এ জন্য কিছু সাথী একটি ট্রাক্টর ট্রলির ব্যবস্থা করে সাথীদেরকে নিয়ে যাওয়ার পক্ষে মত দিলো। কিন্তু পাথুরে, বালুময় দুর্গম পথ হওয়ায় ট্রাক্টর ট্রলির গতি কম হবে এবং যুদ্ধের পর দ্রুত এলাকা ছাড়া যাবে না। এতে আমেরিকান বিমানের বোম্বিং এবং হেলিকপ্টারের ফায়ারিংয়ের আশঙ্কা রয়েছে। যারফলে অযথায় ট্রলিতে আরোহিত মুজাহিদীনের জীবন বিপন্ন হওয়ার ভয় উপেক্ষা করা যায় না। তাই এই মতামত গ্রহনযোগ্য হয়নি।

আমি যখন আজমরেকে উসমানিয়া বসতিতে রেখে ফিরে আসি, তখন চুনার বসতিতে তালেবানের গমগম আওয়াজ আসছিলো। সকল মুজাহিদীন যুদ্ধে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলো। কারী ফয়জুল্লাহ সাহেব হাতে আসা গাড়ির হিসেবে ২৫ জন সাথীকে খাকরিজ জেলে আক্রমণের জন্য নির্বাচন করেন এবং মোল্লা আব্দুশ শুকুর ও শাহ ওলিকোটের মোল্লা মুহাম্মাদ আব্দুল হাকিমকে কমান্ডার নিযুক্ত করেন। কারী সাহেব জিম্মাদারদেরকে সাথীদের সাথে ভালো ব্যবহার এবং খেয়াল রাখতে বলেন। তিনি বলেন, সাথীদের জীবনের প্রতি অবশ্যই লক্ষ্য রাখবেন। কারণ, একজন সাথীও যদি আমাদের অসাবধানতার কারণে সমস্যায়

পতিত হয় তাহলে আল্লাহ তায়ালার দরবারে আমাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে। এসব কথা বলে কারী সাহেব মুজাহিদীনের কামিয়াবি এবং সফলতার জন্য মহান করুণাময়ের দরবারে হাত উঠান। তার সাথে সাথীরাও হাত উঠিয়ে নিজেদের গুনাহ থেকে তাওবা করছিলো এবং উম্মাতে মুসলিমার আরেক প্রশান্তি; বন্দীদের মুক্তি এবং নিজের শাহাদাতের জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করছিলো।

جس منزل دشوار پہ اب دل کا گزر ہے

ایک ایک قدم پر وہاں آتا ہے خدا یاد

যে মঞ্জিল কঠিন, দিল আজ সেথায় যাচ্ছে

প্রতি কদমে কদমে খোদার কথা স্মরণ হচ্ছে।

এসব দোয়া-ই প্রকৃত পক্ষে মুজাহিদীনের সবচেয়ে বড় ও কার্যকর হাতিয়ার। তাদের কামিয়াবির গোপন রহস্য এরই মধ্যে নিহিত রয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

اَلدُّعَاءُ سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ وَعِمَادُ الدِّيْنِ وَنُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ.

দোয়া মুমিনের হাতিয়ার, দীনের ভিত্তি এবং আসমান-জমিনের নূর। *[মুসতাদরাকে হাকিম, কিতাবুদ দোয়া।]*

ভেজা চোখ ও দিলের গভীর থেকে আল্লাহর রাস্তায় এই দোয়ার প্রতিক্রিয়া আমাদের ঈমান এবং একিনে বিস্ময়কর শক্তি যোগাচ্ছিলো। সাথীরা মোল্লা আব্দুশ শুকুর এবং মোল্লা আব্দুল হাকিমের পাশে অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যাদের মধ্যে ২৫ জনের নিকট কালাশনিকভ, গুলি ভর্তি চারটি করে ম্যাগজিন এবং চারজনের নিকট একটি করে জাড়কাঈ। তাদের ছাড়াও অন্য দুইজন মুজাহিদের নিকট রকেট লাঞ্চার এবং মোল্লা আব্দুশ শুকুর, মোল্লা আব্দুল হাকিম ও অন্যান্য সাতজনের নিকট যোগাযোগের জন্য ৮টি ওয়ারলেস সেট ছিলো। এগুলোকে মুজাহিদীন মুখাবেরাহ বলে। আমিও আমার কালাশনিকভে গুলি ভর্তি ম্যাগজিন লাগাই। বক্ষবন্ধনী বুকের উপর বাঁধি। এতে ৩টি ম্যাগজিন, ৪টি হ্যান্ড গ্রেনেড ও একটি রাশিয়ান খঞ্জর ছিলো। তাছাড়া আমার হ্যান্ডিক্যাম ভিডিও ক্যামেরাটিও সাথে নিয়ে মোল্লা আব্দুশ শুকুরের সাথে যুদ্ধে যেতে প্রস্তুত হয়ে যাই।

যখন গাজি এবং মুজাহিদীনের কাফেলা গন্তব্যের দিকে রওয়ানা হচ্ছিলো তখন নিরাপত্তার জন্য মোল্লা আব্দুশ শুকুর 'নামে শব' ঠিক করে দেন। এটি একটি নিরাপত্তা কোড। যেটি গেরিলা যুদ্ধে নিজের সাথী এবং দুশমনের পরিচয়ের জন্য

ব্যবহার করা হয়। নামে শবের ব্যবহার রিসালাতের যুগেও হতো। একে পশতু ভাষায় শপানম এবং আরবীতে শেয়ার বলা হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

إِنْ بَيَّتَكُمُ الْعَدُوّ فَقُولُوا: حم لا يُنْصَرُونَ.

যদি দুশমন তোমাদের উপর আজ রাতে আক্রমণ করে তাহলে তোমাদের শেয়ার হবে– حم لا يُنْصَرُونَ *[তিরমিযী শরীফ, ফাযায়েলে জিহাদ।]*

অন্য হাদীসে এসেছে–

كَانَ شِعَارُ الْمُهَاجِرِينَ عَبْدُ اللهِ وَشِعَارُ الأَنْصَارِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ.

একবার মুহাজিরীনের শেয়ার নির্ধারণ করা হয় 'আব্দুল্লাহ' এবং আনসারদের 'আব্দুর রহমান'। *[আবু দাউদ শরীফ।]*

একই অধ্যায়ে হযরত সালামাহ বিন আকওয়া রা. বর্ণনা করেন–

أَمَّرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَغَزَوْنَا نَاسًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَبَيَّتْنَاهُمْ نَقْتُلُهُمْ وَكَانَ شِعَارُنَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ أَمِتْ أَمِتْ.

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে আমরা সিদ্দিকে আকবর রা. এর সাথে জিহাদে যাই এবং দুশমনের উপর রাতে আক্রমণ করি। সে রাতে আমাদের শেয়ার ছিলো 'আমিত আমিত'। *[সুনানে আবু দাউদ।]*

মোল্লা আব্দুশ শুকুর নিরাপত্তার জন্য 'নামে শব' ঠিক করলেন 'আব্দুল্লাহ'। রওয়ানা হওয়ার আগে আমি কমান্ডার আব্দুশ শুকুরকে বললাম, আমাদের সাথে এন্টি-ট্যাংক মাইন এবং বারুদ নিয়ে যাওয়া উচিত, যাতে আমরা দুশমনের সর্বাধিক ক্ষতিসাধন করতে পারি। আমি আরো বললাম, আমরা বারুদ এবং মাইন লাগিয়ে থানা ও জেলের বিল্ডিং ধ্বংস করে দেবো, যাতে পুনরায় ক্রুসেডাররা এখানে ঠিকানা বানাতে না পারে। আমার এই পরামর্শের সাথে অনেক সাথী একমত পোষণ করেন। কিন্তু মোল্লা আব্দুশ শুকুর গাড়িতে জায়গা কম থাকার কারণে বিপজ্জনক বারুদ জাতীয় জিনিস সাথে নিতে নিষেধ করেন এবং সাথীদেরকেও কঠোরভাবে নিষেধ করেন, কেউ যেনো সাথে বারুদ না নেয়। আমাদের সাথীদের এ সিদ্ধান্ত পছন্দ হয়নি, যার প্রভাব তাদের চেহারায় বিরাজ করছিলো। আমি তাদের এই অবস্থা দেখে বুঝাতে চেষ্টা করলাম,

আমিরের আনুগত্য সৈনিকের নিয়ম হওয়ার পাশাপাশি শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত একটি ফরজও। কুরআন মাজীদ এবং হাদীস শরীফে এ বিষয়ে অনেক গুরুত্ব এসেছে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ○

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর এবং তার আনুগত্য কর যিনি তোমাদের মধ্যে দায়িত্বশীল। *[নিসা ৪:৫৯]*

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدَّعٌ حَسِبْتُهَا قَالَتْ أَسْوَدُ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا

যদি কোনো কালো কৃতদাসও তোমাদের উপর দায়িত্বপ্রাপ্ত হন এবং তিনি আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী তোমাদেরকে পরিচালনা করেন তাহলে তোমরা তার কথাই মেনে চলো এবং তার আনুগত্য করো। *[মুসলিম শরীফ, কিতাবুল ইমারাহ, হাদীস নং ১২২৯ ।]*

বহু সংখ্যক হাদীসে আমিরের অসম্মান ও অবাধ্যতার ব্যাপারে খুবই অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা হয়েছে। এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

وَمَنْ يُطِعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي

যে ব্যক্তি আমিরের আনুগত্য করলো সে আমার আনুগত্য করলো, আর যে আমিরের অবাধ্যতা করলো সে আমার অবাধ্যতা করলো। *[মুসলিম শরীফ, হাদীস নং ১২২৮ ।]*

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ.

মুসলমানদের জন্য প্রত্যেক কাজে আমিরের আনুগত্য কর্তব্য। চাই সেটি তার পছন্দ হোক বা না হোক। তবে তাকে কোনো গুনাহের কাজে আদেশ করা হলে সেটা ভিন্ন। সুতরাং তাকে যদি কোনো গুনাহের আদেশ করা হয়,

তাহলে এ ব্যাপারে কারো আনুগত্য করা জায়েয নেই।
[মুসলিম শরীফ, হাদীস নং ১২৩১ ।]

রাত ৯ টায় সাথীরা গাড়িতে সওয়ার হয়। আমিও আমার গান সামলিয়ে মোল্লা আব্দুশ শুকুর এবং মোল্লা সরদারের সাথে গাড়িতে উঠি। চাঁদ তার ভরা যৌবনে ছিলো। চারদিকে জোছনা বিলাচ্ছিলো। তিনটি গাড়িতে সওয়ার হওয়া গাজি এবং মুজাহিদীনের এই কাফেলা খাকরিজের দিকে সফর করছে। কিছু দূর পর্যন্ত গাড়ির লাইট জ্বালিয়ে রাখার পর বাকি সফর লাইট নিবিয়ে চলতে থাকে। আমাদের কাফেলা ধীরে ধীরে খাকরিজের দিকে এগুচ্ছে। সামনের গাড়িতে কমান্ডার মোল্লা আব্দুশ শুকুর, আমি এবং মোল্লা সরদার বসে ছিলাম। আর সবার শেষের গাড়িতে কমান্ডার মোল্লা আব্দুল হাকিম সাহেব তার সাথীদের সাথে বসে ছিলেন। কাঁচা রাস্তা এবং বালিময় এলাকা। রাতের বেলা লাইট ছাড়া সফরের কারণে আমরা কয়েকবার রাস্তা থেকে সরে যাই। চুনার বসতি থেকে খাকরিজ পৌছা পর্যন্ত আমাদের সাড়ে চার ঘন্টা সময় লেগে যায়। আমরা এখন সেই পাহাড়ি এলাকায় পৌছে গেছি, যার সাথে খাকরিজ শহর অবস্থিত। এ পাহাড়েই আমরা মোল্লা মুহাম্মাদ কাসেমকে পর্যবেক্ষণের জন্য নিযুক্ত রেখেছিলাম।

আমরা রাস্তায় গাড়ি রেখে মোল্লা কাসেমকে ডাক দেই। মোল্লা মুহাম্মাদ কাসেম আমাদেরকে সন্তোষজনক তথ্য দেন। আমরা মোল্লা মুহাম্মাদ কাসেমকে সাথে নিয়ে শহরের দিকে রওয়ানা হই। শহরের আগে একটি পানির নালাতে আমরা গাড়ি থামিয়ে এক পার্শ্বে দাঁড় করিয়ে রাখি। মোল্লা মুহাম্মাদ কাসেমকে গাড়ির কাছে রেখে যাই এবং ওয়ারলেসে যোগাযোগ রাখতে বলি। এখানে সাথীরা দুই গ্রুপে ভাগ হই। এক গ্রুপ মোল্লা আব্দুল হাকিমের কমাণ্ডে পূর্ব দিক থেকে শহরে প্রবেশ করবে এবং জেলখানাকে টার্গেট করবে। আর দ্বিতীয় গ্রুপ কমান্ডার মোল্লা আব্দুশ শুকুরের নেতৃত্বে দক্ষিণ দিক থেকে শহরে প্রবেশ করবে এবং থানাকে টার্গেট করবে। সামনের সফর পায়ে হেঁটে হবে এবং পরস্পরে ওয়ারলেস সেটের মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করবে।

মোল্লা আব্দুল হাকিম সাথীদেরকে নিয়ে প্রথমে রওয়ানা হন এবং এর কিছুক্ষণ পর আমরাও রওয়ানা হই। যখন আমরা পানির নালা থেকে বের হই তখন সামনে একটি প্রাইমারি স্কুল ছিলো। সেখানে স্থাপন করা হাত-পাম্প থেকে আমরা পানি বের করি এবং সবাইকে পান করাই। যখন আমরা শহরে প্রবেশ করছিলাম তখন ঘড়িতে রাত আড়াইটা বেজেছিলো। এ সময় শহরের রাস্তাঘাট এবং আবাদীগুলোতে সুনসান নীরবতা বিরাজ করছিল। রাস্তায় আমরা কোনো

সাধারণ মানুষ বা ডিউটিরত কোনো পুলিশ কর্মী পাইনি। আমরা খুবই প্রশান্তির সাথে নিশ্চিন্তে সামনে এগিয়ে চলছি। যা এক মনোলোভা দৃশ্যের অবতারণা করে। সাথীদের চেহারা জিহাদী নূরে চমকাচ্ছিলো। চাঁদের আলো যেনো সেই নূরকে আরো বাড়ানোর প্রচেষ্টায় লিপ্ত ছিলো। কারো মনে কোনো ভবিষ্যতের চিন্তাও ছিলো না, অতীতের কোনো স্মৃতিও ছিলো না। এমন অবস্থার কল্পনাও দুনিয়াতে অসম্ভব। মানুষ যখন চূড়ান্ত পর্যায়ের নিরাপত্তা ও আনন্দের মাঝে স্বজ্ঞানে বেঁচে থাকে তখনও তাকে না জানি কতো চিন্তা এবং ফিকির ঘিরে থাকে। কিন্তু এটা জিহাদের ময়দানের বরকত ছিলো যে, প্রত্যেক সাথীর উপর আশ্চর্য ধরনের প্রশান্তি এবং নিশ্চয়তা ছেয়ে ছিলো। গোটা জিন্দেগিতে এর উপমা মনে পড়ে না। আমি আমার চিন্তা শক্তিতে জোর দিতেই মনে পড়ে কুরআন মাজিদে আল্লাহ তায়ালা জান্নাতীদের এক অবাক করা বিরল নেয়ামতের কথা বর্ণনা করেন–

لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.

তাদের কোনো চিন্তা থাকবে না এবং থাকবে না কোনো পেরেশানির কারণ। *[বাকারা ২:৩৮]*

কিছুটা একই অবস্থা জান্নাতের সংক্ষিপ্ত এই পথ অর্থাৎ জিহাদের পথে অনুভব হচ্ছিলো। যাই হোক, আমরা প্রায় ১৫ মিনিট হাঁটার পর নিজেদের টার্গেটের সামনে পৌঁছে যাই। আমাদের সামনেই থানার বিল্ডিং ছিলো, যেটি আমাদের টার্গেট। চাঁদনী রাতে থানার ছাদে সক্রিয় পাহারাদার কালাশনিকভে সজ্জিত ছিলো। আমি অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছিলাম। আমার পাশে দাঁড়ানো সাথী উঁচু আওয়াজে কুরআন মাজিদের এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন–

وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ○

আর আমি তাদের সামনে ও পেছনে এক দেয়াল আচ্ছাদিত করে দেই, ফলে তারা কিছুই দেখতে পায় না। *[ইয়াসিন ৩৬:৯]*

আমিও এই পবিত্র আয়াত পড়তে থাকি। দুশমনের দৃষ্টি থেকে বাঁচার একটি পরীক্ষিত আমল এটি। জিহাদের প্রতিটি ক্ষেত্রে উপযুক্ত দোয়াসমূহ মুজাহিদীনের মুখ মনে পড়ে। আমি এই আয়াত পড়তে পড়তে পাহারাদারের দিকে তাকিয়ে দেখি সে আমার দিকেই তাকিয়ে আছে। আমি দ্রুত দেয়ালের আড়ালে চলে আসি এবং পাহারাদারের ব্যাপারে সাথীদেরকে অবগত করি। দেয়ালটি শাহ ইশা এর মাজারের দেয়াল ছিলো, যেটি প্রায় চার ফুট উঁচু। আমি দেয়ালের

উপর দিয়ে দরবারের দিকে ঝুকে দেখি তার সবুজ প্রান্তরে বহু নারী-পুরুষ ও শিশু ঘুমাচ্ছে। চিন্তা করলাম, যদি যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় তাহলে এই নিরপরাধ লোকগুলো গুলির টার্গেটে এসে যাবে এবং তাদের কারো কারো জীবন-প্রদীপ নিভে যাবে। তাই তাদেরকে আস্তে আস্তে আওয়াজ দিয়ে সতর্ক করার চেষ্টা করি। আমি তাদেরকে বললাম, এখানে বিপদ আছে, যুদ্ধ হবে, আপনারা দরবারের ভেতরে চলে যান। চারদিকে সশস্ত্র লোক দেখে নারী ও শিশুরা চিৎকার ও ডাকাডাকি শুরু করে দেয়। এদিক সেদিক তাকিয়ে তারা দরবারের ভেতরের অংশে চলে যায়। দরবারে শোরগোল শুরু হওয়ার কারণে থানার ছাদে নিযুক্ত পাহারাদার ভয় পেয়ে যায় এবং 'দারিশ'[১২] বলে উঠে। যখনই পাহারাদার দারিশ বলে ওঠে এবং জিজ্ঞেস করে তোমরা কারা? তখন সে থানার চার দিকে তাকিয়ে দেখে সশস্ত্র তালেবানরা থানা ঘেরাও করে আছে। যা মূলত তাদের কৃতকর্ম, ক্রুসেডারদেরকে সহযোগিতা এবং ইসলামের দুশমনির ভয়ঙ্কর পরিণতি ছিলো।

ঠিক তখনই মোল্লা আব্দুল হাকিমের সাথীরা ওয়ারলেস সেটের মাধ্যমে জেলখানার মোকাবিলায় যাওয়ার সংবাদ দেয়। ততক্ষণে সেই সময় এসে গেছে যার জন্য গত দুই মাস যাবত প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছিলো। আমি আমার গান লোড করলাম এবং ভিডিও ক্যামেরা অন করলাম। মোল্লা আব্দুশ শুকুর সাথীদেরকে হামলা করার হুকুম করার সাথে সাথে সাথীরা ফায়ারিং শুরু করে। পাহারাদারসহ সকল কর্মচারী ভিতরে চুপ করে বসে যায়। দ্বিতীয় গ্রুপও ফায়ারিংয়ের আওয়াজ শুনে জেলখানার উপর আক্রমণ শুরু করে। এখন চারদিকে তুমুল ফায়ারিংয়ের আওয়াজ আকাশে শো শো শব্দ সৃষ্টি করছে। আর.পি.জি এর রকেটের জোরধার বিস্ফোরণ হচ্ছে। যারফলে খাকরিজের পাহাড় কম্পিত হচ্ছে এবং শহরের বাড়ি-ঘরগুলো প্রতিধ্বনি করছে। আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই পবিত্র বাণীর ঘ্রাণ অনুভব করলাম। গুলি এবং ফায়ারিংয়ের তীব্রতায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই সুসংবাদ মনে পড়লে উদ্যমতায় আরো ঝিলিক খেলে যায়–

وَاعْلَمُوْا اَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوْفِ.

তোমরা জেনে রাখো, নিশ্চয় জান্নাত তরবারির ছায়ার নিচে। *[মুসলিম শরীফ, কিতাবুল জিহাদ।]*

---

[১২]. দারিশ পশতু ভাষার শব্দ। এর অর্থ দাঁড়াও। এটি পুলিশ এবং সৈনিকেরা সন্দেহযুক্ত লোকদের থামানোর জন্য ব্যবহার করে থাকে। ইংরেজিতে একে হোল্ড বলে।

আমাদের বিপরীত দিক থেকে বেশি কোনো বাধা আসছিলো না। আমরা পুরো থানা বেষ্টন করে রেখেছিলাম। থানার কর্মচারীরা ভেতরে বন্দী ছিলো। যখন আমরা থানার বিল্ডিংয়ের কাছে গেলাম তখন আমাদের সাথীরা ২০ মিনিট ফায়ারিং করার পর থেমে যায়। কিন্তু আমাদের এক সাথী হাজি মুহাম্মাদ তখনো থানার ছাদের উপর ফায়ারিং করছিলো। আমি হাজি মুহাম্মাদকে জিজ্ঞেস করলাম কেনো ফায়ারিং করছেন? সে বলল, থানার ছাদের উপর দুই পুলিশ কর্মী দেয়ালের উপর দিয়ে বার বার উঁকি দিচ্ছে। আমি হাজি মুহাম্মাদকে নিষেধ করলাম, এখন কোনো ফায়ারিং করবেন না। আমি নিজে নিশানা করলাম এবং যখনই পুলিশ কর্মী দেয়ালের উপর দিয়ে তাকালো আমি তৎক্ষণাৎ ফায়ার করে দেই এবং তা ঠিক নিশানা ভেদ করে। গুলি তার মাথাকে ফেড়ে বের হয়ে যায়। সিপাহী লাফিয়ে উঠে পিছনে আছড়ে পড়ে। দ্বিতীয়বার আর উঠতে পারেনি। এবার দ্বিতীয় কর্মী অন্য জায়গা দিয়ে মাথা উঠায়। তারও একই পরিণতি হয়। তারপর আমরা থানা ওয়ালাদের আত্মসমর্পন করতে বলি। কিন্তু তারা উত্তরে কিছুই বললো না। দ্বিতীয়বার বলার পরও যখন কোনো উত্তর এলো না তখন আমি গ্রেনেডের পিন বের করি এবং তা থানার ভিতর নিক্ষেপ করি। ফলে এক বিকট বিস্ফোরণ হয় এবং তারপর চারদিকে নিরবতা ছেয়ে যায়। এমনিভাবে আমাদের দ্বিতীয় গ্রুপ যেটি কমান্ডার আব্দুল হাকিমের নেতৃত্বে জেলখানায় আক্রমণ করেছিলো তারাও কোনো বাধার সম্মুখীন হয়নি। কারণ, জেলের কর্মচারীরা ততক্ষণে পরিস্থিতি বেগতিক দেখে জেলখানার গোপন রাস্তা দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার মধ্যেই কল্যাণ খুঁজে পেয়েছে।

সাথীরা জেলখানার সামনের গেট ভেঙ্গে ভিতরে প্রবেশ করলে জেলে বন্দী তালেবানরা তুমুল তাকবীর দিতে থাকে। ততক্ষণে আমরাও সেখানে পৌঁছে যাই। আমরা জেলের তালা ভেঙ্গে বন্দী সাথীদের মুক্ত করতে শুরু করি, যাদেরকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গা থেকে গ্রেফতার করেছিলো। বন্দী সাথীদের মধ্যে তালেবান কমান্ডার মোল্লা আব্দুল হান্নানের সাথীই বেশি ছিলো। আমরা জেলের ভেতরে ব্যাপক তল্লাশি চালাই। জেলের কর্মচারীরা সকলেই পালিয়ে গেছে। জেলের মোর্চার ছাদের উপর এন্টি এয়ারক্রাফট গান লাগানো ছিলো, আমরা সেটিকে বেকার করে দেই। বন্দীদেরকে মুক্ত করা পর্যন্ত আমরা সর্বমোট এক ঘন্টার আক্রমণ পরিচালনা করি। থানা ওয়ালাদেরকে স্ব-অবস্থায় রেখে আমরা গাড়ির দিকে ফিরে আসি। আমি খুব খুশি ছিলাম এজন্য যে, আমি বন্দী মুজাহিদীনকে মুক্ত করার সৌভাগ্য লাভ করেছি। যার ব্যাপারে হাদীসসমূহে অনেক বড় ফজিলত বর্ণিত হয়েছে।

চৌকি ঘেরাও

খাকরিজ জেলে আক্রমণ করে আমরা খুব নিশ্চিন্তে হেঁটে শহর থেকে বের হই। আমাদের সামনে কেবল শহরের শেষ অংশ ছিলো। এর একটু সামনেই পানির নালাতে আমরা মোল্লা কাসেমের তত্ত্বাবধানে গাড়িগুলো রেখেছিলাম। আমরা খুবই নিশ্চিন্ত, প্রশান্তি এবং চিন্তামুক্ত হয়ে পথ চলছিলাম। আচানক এক জোরদার দারিশ আওয়াজ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আমরা এদিক সেদিক তাকাতে থাকি। দ্বিতীয় বার আবারো এই আওয়াজ আসে এবং আমাদেরকে নামে শব জিজ্ঞেস করে। আমরা বুঝতে পারলাম এরা আমাদেরই সাথী যারা আমাদের আগে এখানে পৌছে গেছে অথবা যে গাড়ির কাছে ছিলো সে। আমরা নামে শবের জবাবে আব্দুল্লাহ বলি। নামে শব আব্দুল্লাহ ঠিক করেই আমরা রওয়ানা হয়েছিলাম। কিন্তু যখনই আমরা নামে শবের জবাবে আব্দুল্লাহ বলেছি তখনই তুমুল ফায়ারিং শুরু হয়ে যায়। এটি খাকরিজ পুলিশের একটি চৌকি ছিলো। আমরা যখন রওয়ানা হই তখন তারা ঘুমিয়ে ছিলো। তাই যাওয়ার সময় কোনো সমস্যা হয়নি। খাকরিজে হামলার কারণে গোটা শহর প্রতিধ্বনিত হচ্ছিলো। ফলে তারাও ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে যায়। চৌকির সামনে কংক্রিটের তৈরি একটি মজবুত মোর্চা রয়েছে। সেখান থেকেই ফায়ারিং হচ্ছিলো। এখনো সাথীরা সামলে উঠতে পারেনি। এরই মধ্যে এক পুলিশ কর্মী মোর্চা থেকে আর.পি.জি এর রকেট নিক্ষেপ করে যা আমাদের দুই সাথী মোল্লা সরদার এবং ওলী মুহাম্মাদের মাঝখান দিয়ে চলে যায়। যার ছোঁয়া লেগে উভয়ে সামান্য আহত হন। তারা উভয়ে জমিনে পড়ে যায়। রকেট অন্য সাথীদের কোনো ক্ষতি না করেই ময়দানে আছড়ে পড়ে এবং বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হয়। আমরা জবাবি ফায়ারিং শুরু করি। সাথীরা পাথরের আড়াল নিয়ে ফায়ারিং করতে থাকে। সামনে থেকে শাঁ শাঁ শব্দে আগত গুলি আমাদের ডানে বামে দিয়ে চলে যাচ্ছে। হঠাৎ একটি গুলি আমার কালাশনিকভের ক্লিঙ্ক রডকে ভেঙ্গে চলে যায়। মোল্লা আব্দুশ শুকুর আমাকে চৌকি ঘেরাও করতে আদেশ করেন। সাথীরা ধীরে ধীরে তিন দিক থেকে চৌকি ঘেরাও করে ফেলে। এরই মধ্যে হঠাৎ ফায়ারিং বন্ধ হয়ে যায়। কারণ দুশমনরা আমাদের সংখ্যাধিক্য দেখে পালিয়ে যাওয়ার মধ্যেই নিরাপত্তা খুঁজে পায় এবং তারা কংক্রিটের মোর্চার আড়াল থেকে পালিয়ে যায়। যখন আমরা চৌকি এবং মোর্চা তল্লাশি নেই তখন সেখানে একটি চাটাই এবং ফেলে যাওয়া জুতা ছাড়া আর কিছুই পাইনি। সাথীরা ঘেরাও উঠিয়ে নেয় এবং গাড়ির দিকে রওয়ানা হয়ে যায়। যখন আমরা গাড়ির কাছে পৌছি তখন একজন

অপরজনকে দেখে সান্ত্বনা দেন এবং পরস্পরের অবস্থা জিজ্ঞেস করতে থাকেন, কেউ গুলির আওতায় এসে আহত হয়নি তো? যখন সাথীদের গণনা পূর্ণ হয়ে যায় তখন সবাই গাড়িতে উঠে ফিরতি পথে রওয়ানা হয়ে যাই।

ফিরে আসার সফর এবং আজমরের শুশ্রূষা

আমরা দ্রুত এই এলাকা ছেড়ে নিরাপদ জায়গা যেতে চাচ্ছিলাম। কারণ, যে কোনো সময় ক্রুসেডার বিমান এসে বোম্বিং করতে পারে। তাছাড়া আমেরিকান হেলিকপ্টার, এমনকি ড্রোন বিমানও আসতে পারে। মোল্লা আব্দুল হাকিম অন্ধকারের সুযোগে ড্রাইভারকে জলদি বের হয়ে দ্রুত সফরের হুকুম দেন। তখন ভোর ৪টা বাজছিলো। চাঁদ তখন তার চেহারা মেঘের আড়ালে লুকিয়ে রেখেছে। কাঁচা রাস্তায় দ্রুত সফর করা এবং অন্ধকার থাকার কারণে তিনটি গাড়িই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আমাদের ড্রাইভারও সঠিক রাস্তা অনুমান করতে না পেরে অনেক দূর পর্যন্ত ভুল রাস্তায় চলে যায়। আমরা তখন খাকরিজ থেকে অনেক দূরে ছিলাম। ফজর নামাজের সময় শেষ হওয়ার প্রায় ২০ মিনিট বাকি ছিলো। চারপাশ বেশ আলোকিত হয়ে গেছে। আমি মোল্লা আব্দুশ শুকুরকে ফজর নামাজ আদায়ের প্রতি মনোযোগী করলাম এবং একজন অনুমতি নিয়ে তায়াম্মুম করে আযান দিলো।

یہ نغمہ فصل گل ولالہ کا نہیں پابند

بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ

এই সংগীত মৌসুমী ফুল পাখিদের অনুগত নয়

বসন্ত বা হেমন্ত হোক লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ কয়।

সাথীরা গাড়িকে একটি বড় জংলি গাছের নিচে রেখে নামাজ পড়ার জায়গা করে। সকলে তায়াম্মুম করে জামাতের সাথে নামাজ আদায় করি। ততক্ষণে চারদিক আলোকিত হয়ে গেছে। আমরা পুনরায় সঠিক রাস্তায় সফর শুরু করলাম। প্রায় সাড়ে আটটার দিকে আমরা উসমানিয়া বসতিতে পৌঁছে যাই। মোল্লা আব্দুশ শুকুর, আমি এবং আরো দু'জন সাথী আমাদের সাথে আজমরের শুশ্রূষা করতে উসমানিয়া বসতিতে নেমে যাই এবং অন্যরা চুনার বসতিতে চলে যায়। আমরা এখানে আজমরের শুশ্রূষা করি এবং অন্যান্য সাথীদের সাথেও সাক্ষাৎ হয়। আজমরে বেশ সুস্থ হয়ে উঠেছিল; যদিও জ্বলে যাওয়া স্থানে তখনো জখম ছিলো। তাছাড়া তার চোখ তখনো সূর্যের আলো দেখার উপযোগী ছিলো না। এ জন্যই ডাক্তার তাকে সূর্যের আলোতে বের হতে নিষেধ করেছেন।

বিশেষ প্রয়োজনে বাইরে বের হলে চোখে কালো চশমা ব্যবহার করতে বলেছেন। আমি আজমরের কাছে তার অবস্থা সম্পর্কে অবগত হই। তাকে গত রাতের ঘটে যাওয়া আক্রমণের কথা শুনাই। সে তালেবান সাথীদের মুক্তির কারণে খুবই খুশি হয়। কিন্তু হামলায় সে অংশগ্রহণ করতে না পেরে বার বার আফসোস করতে থাকে; হায় যদি আমিও আক্রমণে অংশ নিতে পারতাম, আমার সাথীদের মুক্ত করার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারতাম! মোল্লা আব্দুশ শুকুর আজমরেকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, ইনশাআল্লাহ তুমি দ্রুতই সুস্থ হয়ে যাবে এবং আল্লাহ তায়ালা অচিরেই ক্রুসেডার সৈন্য ও তাদের নিরাপত্তাদাতা ঠোলাদের বিরুদ্ধে অন্য কোনো আক্রমণে অংশগ্রহণের সৌভাগ্য দান করবেন। তিনি আরো বলেন, আল্লাহর রাস্তায় জখমি হওয়াও এক বড় সৌভাগ্যের ব্যাপার। কুরআন ও হাদীসে এরও অনেক ফজিলত বর্ণিত হয়েছে।

আজমরে মুহাজির এবং মুজাহিদ
মধ্য এশিয়ার রাষ্ট্রগুলোর অবস্থা এবং
দৃঢ়-ঈমান মুসলমানদের করুণ অবস্থা

আজমরে এক বড় খান্দানের চোখের মণি এবং চেরাগ ছিলো। তার পিতা একজন ধনি ব্যক্তি। তার পিতার বিস্তর ব্যবসা এবং কৃষি খামার রয়েছে। আজমরের আসল নাম ছিলো জামসেদ তাজুকী। আজমরে তাজিকিস্তানের রাজধানীতে জন্মগ্রহণ করে। মেধাবী এবং বুদ্ধিমান আজমরে ভালো রেজাল্টের সাথে এফ.আই পর্যন্ত পড়া লেখা করে। সে ছোট বেলা থেকেই স্বাধীনচেতা এবং ইসলামী শিক্ষার প্রতি মহব্বত রাখতো।

রাশিয়াতে জার শাহীর গদিকে উল্টে দিয়ে ১৯১৭ সালে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন প্রতিষ্ঠিত হয়। যা জুলুম ও বর্বরতার এমন এক প্রকম্পিত দাস্তান ছিলো, যার সামনে জার শাহীর জুলুম নির্যাতনের দাস্তানও হার মানে। রুশ কমিউনিস্টরা যেভাবে ইসলামী রাষ্ট্রগুলোকে ধ্বংস করেছে তাতে ধোঁকাবাজি এবং সীমাহীন খুনাখুনিই সবচেয়ে বড় কার্যকর চাবিকাঠি হিসেবে কাজ করে। রুশ সাম্রাজ্য যেসব ইসলামী ভূখণ্ড দখল করে সেগুলোতে জুলুমের কালো রাত কায়েম করে। যার অন্ধকারে কমিউনিস্টরা মুসলমানদের আরবি ও ফারসি লিখনপদ্ধতি পর্যন্ত পরিবর্তন করে ফেলে। তাদের সোনালি অতীত এবং ইসলামী রীতিনীতির সাথে তাদের সম্পর্ক কর্তনের কুৎসিত প্রয়াস চালায়। বংশীয় ভিত্তির উপর বিভক্ত করে তাদের সীমানা পরিবর্তন করে দেয়। ডাক ও টেলি যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়। ইসলামী বিশ্ব এবং স্বাধীন বিশ্ব থেকে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে একঘরে করে

রাখে। ইসলামী বিশ্বের বর্তমান প্রজন্ম সেসব মুসলমান বংশের অনেকগুলোর নাম-নিশানারও কোনো খবর রাখেনি। অবশ্য তাদের কোনো খবর রাখাও ছিলো অসম্ভব।

১৯৯০ সালের দ্বিতীয়ার্ধের শুরুর দিকে ২৯টি রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নের জবর দখল থেকে স্বাধীন হয়। এগুলোর মধ্যে ৫টি মধ্যএশিয়ার, ১৩টি কুহেকাফ এলাকার এবং বাকি ১১টি রাষ্ট্র এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চল ও ইউরোপের অন্তর্ভূক্ত।

মধ্য এশিয়ার আজাদ হওয়া রাষ্ট্রগুলো

১. উজবেকিস্তান

এর রাজধানী তাশকন্দ। মুসলিম আবাদির সংখ্যা ৮৮% এবং প্রসিদ্ধ শহর সমরকন্দ, বুখারা এবং ফরগানায়ে তিরমিজ।

২. তাজিকিস্তান

এর রাজধানীর নাম দুশোম্বাহ। মুসলিম আবাদির সংখ্যা ৯৮%।

৩. তুর্কমিনিস্তান

এর রাজধানীর নাম ইশকাবাদ। মুসিলম আবাদির সংখ্যা ৯০%। এর প্রসিদ্ধ শহর মরু। যেটি ইসলামী ইতিহাসের গর্ব, মুহাদ্দিসে আজম, ইমামে আজম আবু হানিফা রহ. এর বিশিষ্ট শাগরিদ মুজাহিদ ফি সাবিলিল্লাহ হযরত আব্দুল্লাহ বিন মোবারক রহ. এর জন্মস্থান এবং বাসস্থান।

৪. কাজাকাস্তান

এর রাজধানীর নাম আলমাতা। মুসলিম আবাদির সংখ্যা ৯৮%।

৫. কিরগিজিস্তান

এর রাজধানীর নাম, ফিরোঞ্জ। মুসলিম আবাদির সংখ্যা ৯১%।

এসব এলাকাকে 'মা অরায়ান নাহর' বলা হয়। এটি আরবি শব্দ। যার অর্থ হল 'নদীর অপর পাড়'। এমন নামকরণের কারণ হল, এই এলাকা আমু নদীর অপর পাড়ে অবস্থিত। আমু নদীর আগের নাম ছিলো জিহুন। রুশ জবর দখলের আগে এই পাঁচ রাষ্ট্র-সমষ্টিকে পশ্চিম তুর্কিস্তান বলা হতো। আর পুর্ব তুর্কিস্তানের বর্তমানে রাখা হয়েছে সিনজিয়াং। এটি চীনা কমিউনিস্টরা জবর দখল করে রেখেছে। এই পূর্ব তুর্কিস্তানেরই পুরাতন প্রসিদ্ধ শহর কাশগার ও খাতান। এর রাজধানীর নাম উরুমচি। বর্তমানে এটি চীনের সবচেয়ে বড় প্রদেশ। হাজ্জাজ বিন ইউসুফের জমানায় প্রসিদ্ধ সেনাপতি কুতাইবা বিন মুসলিম বাহেলি বিজয়

করেন। এখানের অধিকাংশ মুসলমানই তুর্কি বংশোদ্ভূত। এখানে মুসলিম আবাদীর সংখ্যা ৯০%। এরা চীনা কমিউনিস্টদের জুলুমের শিকার। তারা খুবই উদ্বিগ্নতায় দিন কাটায়। যা মানবতার ঝাণ্ডাবাহী, চীন এবং ইউরোপিয়ান সংগঠনগুলোর গালে তীব্র চপেটাঘাত। মুসলমান সংগঠন এবং মিডিয়ার উচিত এসব মজলুম নির্যাতিত মুসলমানদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসা। যদি বর্তমান সিনজিয়াংকেও হিসেব করা হয়, তাহলে এটি হবে কমিউনিস্টদের জুলুমের শিকার ৩০তম রাষ্ট্র। এসব দু'মুখো এবং চূড়ান্ত খুনপিপাসুকে বলা যায়,

یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت
پیتے ہیں لہو، دیتے ہیں تعلیم مساوات

এই জ্ঞান, এই প্রজ্ঞা, এই প্রচেষ্টা, এই ক্ষমতা
পান করে খুন আর সবক দেয় সমানাধিকারের।

যখন আফগান জিহাদের বদৌলতে রুশ জবর দখল থেকে এসব রাষ্ট্রের আজাদি নসিব হয়, তখন এসব রাষ্ট্রের জনগণের খুশি দেখার মতো ছিলো। মসিবত এবং কষ্টের অন্ধকার রাত কেটে যাওয়ার পর এই লোকগুলো আনন্দিত ছিলো এই আশায় যে এখন সকাল হবে।

মধ্য এশিয়ার জনগণের ধারণা ছিলো শত বছর ধরে বিরাজমান ভয়ানক নীরবতার অবসান ঘটেছে। ইথারে মন কাড়া আজানের ধ্বনি উচ্চারিত হবে। আজাদ মুসলমানদের ধারণা ছিলো, এবার ধোঁকাবাজ, নাস্তিক এবং খুনি রুশ প্রশাসকের জায়গায় নেককার, সৎ এবং খোদাভীরু প্রশাসক বসবে। তারা সহজে নিরাপদে ইসলামী শিক্ষার উপর আমল করতে পারবে। কিন্তু নবজন্মা এসব দেশের প্রশাসনের নেতৃত্ব রুশ গোয়েন্দা বিভাগ 'কেজিবি' তাদের গোপন কর্মীদের হাতে স্থানান্তর করে দেয় এবং স্বাধীন হওয়া দেশগুলোকে রাশিয়ান ফেডারেশনের অংশ করে রাখে। পররাষ্ট্র নীতি, প্রতিরক্ষা এবং মুদ্রার উপর জবর দখল বজায় রাখে।

প্রয়োজন ছিলো, আজাদির পরপর দেশের পরিস্থিতি পরিবর্তন করা এবং কমিউনিস্ট ও কমিউনিজমকে দেশ থেকে বিতাড়িত করে ইসলামী আইন বাস্তবায়ন করা। কিন্তু দেশগুলোর অবস্থার কোনোই পরিবর্তন হয়নি। যথা–

১. জালেম রুশদের যুগে কুরআন শরীফ প্রচার এবং শিক্ষার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি ছিল, যা এখনও বহাল আছে।

২. জালেম রুশদের যুগে নামাজ আদায় করতে বিধিনিষেধ ছিলো, আজাদ হওয়ার পরও তা বলবৎ আছে।

৩. জালেম রুশদের যুগে আল্লাহর নাম নিলে তাকে সাইবেরিয়ার শীতল জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতো, আজাদির পরও এই জুলুম রয়েগেছে।

৪. জালেম রুশরা আজান দিতে বিধিনিষেধ আরোপ করে রেখেছিলো, এই হুকুম আজাদির পরও চলমান আছে।

৬. জালেম রুশরা মসজিদগুলোকে ক্লাব, আস্তাবল এবং প্রমোদ ভবনে রূপান্তরিত করেছিলো। আজাদির পর সেগুলো পুনরায় মসজিদে রূপান্তরিত করার পরিবর্তে স্বঅবস্থায় রেখে দেয়া হয়েছে।

৭. জালেম রুশদের যুগে আরবি ও ফারসি লেখার উপর বিধিনিষেধ আরোপ ছিলো, আজাদির পরও তা নিষিদ্ধ রয়ে গেছে এবং রুশি লেখা প্রচলিত আছে।

৮. জালেম রুশদের যুগে হজ্ব এবং ইসলামী ইবাদাতের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ ছিলো, আজাদির পরও সে নিষেধাজ্ঞা জারি আছে।

৯. জালেম রুশদের যুগে ব্যাভিচারের ব্যাপকতা ছিলো। আজাদির পরও পতিতালয়গুলো সরকারি তত্ত্বাবধানে প্রতিষ্ঠিত আছে এবং ব্যাভিচারে অনিচ্ছুক মেয়েদেরকে জোর পূর্বক ব্যাভিচারে বাধ্য করা হচ্ছে।

৯. জালেম রুশদের যুগে মদ ব্যাপক ছিলো। পান করা এবং বিক্রি করার উপর নিষেধাজ্ঞা ছিলো না। আজাদির পরও মদ ব্যাপক হারে আছে এবং শরাবখানাগুলো সরকারি তত্ত্বাবধানে প্রতিষ্ঠিত আছে।

১০. জালেম রুশদের যুগে বাচ্চাদের লালন-পালন রুশি মাদাররা করতো এবং তাদেরকে শুকরের দুধ খাওয়াতো। আজাদির পরও একই অবস্থা বহাল আছে।

১১. জালেম রুশদের যুগে বাচ্চাদের শিক্ষাদীক্ষা কমিউনিস্ট শিক্ষকরা দিতো। আজাদির পরও মা তার বাচ্চাকে ইসলামী শিক্ষার উপর প্রতিপালন করতে পারে না। যদি কোনো মা এই সাহস করে এবং হুকুমতের কর্মচারীরা এ তথ্য পেয়ে যায়, তাহলে এ ধরনের মহিলার ঠিকানা হয়ে যায় সাইবেরিয়ার শীতল জাহান্নাম।

১২. জালেম রুশদের যুগে কমিউনিস্ট রুশি প্রশাসক ছিলো। আজাদির পর রুশদের গোয়েন্দা বিভাগ 'কেজিবি'-এর কর্মীরা প্রশাসক। আর আজাদ হওয়া ইসলামী রাষ্ট্রের মধ্যে সবচেয়ে বড় ইসলামী রাষ্ট্র হলো উজবেকিস্তান। এর প্রশাসক ইসলাম বিমুখ এবং 'কেজিবি'-এর এজেন্ট হওয়ার পাশাপাশি কট্টর ইহুদী। তার আসল নাম ইসহাক।

এসব হলো সেই অবস্থার বিবরণ, যার কারণে আজমরের মতো অনুভূতিশীল নওজোয়ান নিজের দম বন্ধ হয়ে আসার অনুভব করছিলো। কারণ, বাহ্যিক দৃষ্টিতে আজাদ হওয়া সত্ত্বেও রুশ কমিউনিজমই বাস্তবে প্রচলিত ছিলো। নতুন মিডিয়া এবং দ্রুত রিপোর্টিংয়ের এই যুগেও পত্রিকা, মিডিয়ার দৃষ্টি এবং ইন্টারনেটের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে এসব দেশের বাসিন্দাদের উপর এমন মজবুত লৌহ নির্মিত খোলস পরিয়ে দিয়েছে যে, ভেতরের আওয়াজ বাইরে এবং বাইরের আওয়াজ ভেতরে আসার কোনো সুযোগ নেই। এমন পরিস্থিতিতে সেসব মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর মুসলমান বাসিন্দারা বাধ্য হয়ে সশস্ত্র জিহাদ শুরু করে। তাজিকিস্তানে যার নেতৃত্ব দিচ্ছেন আব্দুল্লাহ নূরী এবং উজবেকিস্তানে কারী তাহের ইয়ালদশীফ। যখন উজবেকিস্তানের ইহুদী এবং ইসলাম বিদ্বেষী প্রশাসক জুলুম ও নির্যাতনের চূড়ান্ত পর্যায় অতিক্রম করেছিলো, তখন উজবেক মুজাহিদীন তাজিকিস্তান এবং উজবেকিস্তানের সীমান্তে অবস্থিত পাহাড়ে আশ্রয় নেয়। তারা আহমদ শাহ মাসউদের অধিনস্ত এলাকা তুখার ও চাহার আসিয়াবে নিজেদের কেন্দ্র স্থাপন করে এবং উজবেকিস্তান ও তাজিকিস্তানে রাষ্ট্রীয় সম্পদের উপর নিজেদের আক্রমণ জারি রাখে। যারফলে উজবেকিস্তান ও তাজিকিস্তান প্রশাসনের ভীতে কম্পন সৃষ্টি হয় এবং নিরাপত্তা কর্মীরা নাকানি-চুবানি খেতে থাকে। আজমরে সেই সময়েই হিজরত করে তাজিকিস্তানের পাহাড়ে অবস্থানরত মুজাহিদীনের কাতারে শামিল হয়।

তারপর আজমরে জুমা খান নমঙ্গানির বিশেষ বাহিনীতে যুক্ত হয়ে কেজিবি'র সেসব এজেন্টদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যায়। আমিরুল মুজাহিদীন হযরত মাওলানা কমান্ডার আব্দুল জাব্বারও এই জিহাদে শরীক হওয়ার জন্য তাজিকিস্তান সফর করেন। এই জিহাদে পাকিস্তানি জিহাদী সংগঠন হরকতুল জিহাদ আল ইসলামির গর্বিত কমান্ডার হেদায়াতুল্লাহ মানসুর করাচিভীও অংশ নেন এবং দীর্ঘদিন পর্যন্ত উজবেক মুজাহিদীনের সাথে জিহাদে সক্রিয় থাকেন। যখন তাজিকিস্তানের প্রশাসন আব্দুল্লাহ নূরীর উপর মুনাফেকি এবং আলোচনার জাল ফেলে, তখন এই আন্দোলনে কঠিন ধাক্কা লাগে। আব্দুল্লাহ নূরী সেই জালে ফেঁসে যায় এবং তাজিকিস্তানের কেজিবি'র এজেন্ট প্রশাসনের সামনে আত্মসমর্পণ করে। তারা তাকে ক্ষমতায় অংশীদার করার টোপ দিয়ে রেখেছিলো। এরই মধ্যে আহমদ শাহ মাসউদ মুজাহিদীনের সাথে গাদ্দারি করে তুখার এবং চাহার আসিয়াবে অবস্থিত কেন্দ্রগুলো বন্ধ করে দেয়। তখন এক কঠিন সময় ছিলো। মুজাহিদীনকে আল্লাহ তায়ালা সাহায্য করেন। ভাষাগত বৈষম্য ছেড়ে ইসলামের ভিত্তিতে তারা এক হয়ে যায়। কারী তাহের

ইয়ালদুশিফকে নিজেদের আমির বানিয়ে নেয় এবং কমান্ডার জুমা খান নমঙ্গানিকে যুদ্ধ কমান্ডার নিযুক্ত করে। তারা তাদের সশস্ত্র আক্রমণ চালু রাখে।

আহমদ শাহ মাসউদের গাদ্দারির কারণ

রুশদের ঐতিহাসিক এবং দৃষ্টান্তমূলক পতনের পর আফগানিস্তান ছিলো যুদ্ধক্ষেত্র। গুলবদ্দিন হেকমতিয়ার শিয়া সংগঠন 'হিজবে ওয়াহদাত' এর সাথে মিলে কাবুলের ক্ষমতা দখলের জন্য এক পায়ে দাঁড়ানো ছিলো। কিন্তু বাস্তবে হিজবে ওয়াহদাতের যুদ্ধবাজরা উজবুক লিডার আব্দুর রশিদ দোস্তামকে সঙ্গ দিচ্ছিলো। আর গুলবদ্দিন হেকমতিয়ার কান্তার, ভিরদাগ, সুরুবি, লুগমান, নঙ্গরহার এবং চাহার আসিয়াবে সীমাবদ্ধ ছিলো।

তাজুক লিডার প্রফেসর বুরহানুদ্দিন রব্বানী এবং আহমদ শাহ মাসউদ উত্তর-পূর্ব এলাকার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয় এবং দেশের বাকি অংশের উপর যুদ্ধবাজদের নিয়ন্ত্রণ ছিলো। যাদের মধ্যে ইসমাঈল তোরণ ও কারী বাবা উল্লেখযোগ্য।

আফগানিস্তানে এসব লোকের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ হচ্ছিলো এবং নিরপরাধ সাধারণ মানুষের রক্ত ঝরছিলো। অথচ আফগানের সাধারণ লোকেরা এসব লিডারদের নেতৃত্বে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ইসলাম এবং ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদ করেছিলো। আজ তারাই আফগান ভূখণ্ডে সেসব লিডারদের আমিত্বের শিকার হয়ে জুলুমের চাকায় পিষ্ট হচ্ছে। আফগানিস্তানের এই খুনরাঙা অবস্থায় তালেবানের নামে একটি গ্রুপ জনসম্মুখে আসে। তারা মাদরাসার তুলাবায়ে কেরাম ছিলো। যাদের অনেকেই পাকিস্তানের মাদরাসাগুলো থেকেও ইলম অর্জন করেছিলো। তাদের নেতৃত্বে ছিলেন মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর দা.বা.।

তালেবানের শ্লোগান ছিলো সেসব যুদ্ধবাজদেরকে নেতৃত্ব থেকে হটানো এবং শান্তি প্রতিষ্ঠা করে শরীয়ত বাস্তবায়ন করা। ১৯৯৪ সালে অক্টোবরে তালেবানরা কান্দাহার থেকে যুদ্ধবাজকে হটিয়ে নিয়ন্ত্রণ হাতে নেয় এবং তৎক্ষণাৎ শরীয়ত বাস্তবায়ন করে। তারা শহরে আদর্শ শান্তি প্রতিষ্ঠা করে। যারফলে তালেবানের জনসমর্থন বহুগুণ বেড়ে যায়। তালেবানরা ১৯৯৫ সালের মধ্যে হেলমন্দ, নিমরোজ, উর্জেগান, ফারাহ এবং হেরাত পর্যন্ত সকল প্রদেশের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে ফেলে। তখন পর্যন্ত আহমদ শাহ মাসউদের সাথে তালেবানের সরাসরি কোনো যুদ্ধ হয়নি। কিন্তু আহমদ শাহ মাসউদ বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যতের অবস্থা চিন্তা করে যখন দেখলো যে, তালেবানরা শুধু শরীয়তের শ্লোগানই দেয় না বরং বাস্তবেও শরীয়ত প্রতিষ্ঠা করছে। তাছাড়া

তালেবানদেরকে দেশি-বিদেশি সকল একনিষ্ঠ মুজাহিদ সহযোগিতা করছে। শরীয়ত প্রতিষ্ঠায় কোনো বাধাকে তারা সহ্য করছে না, চাই সে সাবেক সময়ের যতো বড় জিহাদী কমান্ডারই হোক না কেনো? ঠিক সে সময়েই আহমদ শাহ মাসউদ শরীয়তের নামে আফগান জনগণের সাথে ঠাট্টা করছে। নিজের নেতৃত্ব ডুবতে বসেছে দেখে সে ফ্রান্স এবং কেজিবি'র সাথে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য উজবুক, তাজুক এবং পাকিস্তানি মুজাহিদীনের সাথে গাদ্দারি করে তাদের কেন্দ্রগুলো বন্ধ করে দেয়। পাকিস্তানের যেসব মুজাহিদীন উজবেকিস্তান এবং তাজিকিস্তানে জিহাদের জন্য গিয়েছিলো, তাদের নেতৃত্বে ছিলেন আমিরুল মুজাহিদীন হযরত মাওলানা কমান্ডার আব্দুল জব্বার সাহেব দা.বা.। তাদেরকে আহমদ শাহ মাসউদ তালেকানে আটকে দেয়। তাদেরকে ফেরত পাঠানোর আগে জঘন্য প্রোপাগাণ্ডা চালায়। সে প্রচার করে দক্ষিণ আফগানিস্তানে ফেতনাবাজ একটি গ্রুপ প্রকাশ পেয়েছে। যারা নিজেদেরকে তালেবান বলে। প্রকৃত তালেবানের (মাদরাসার ছাত্র) সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই। তোমরা তাদের সঙ্গ দিও না।

কিছু দিন পর আমিরুল মুজাহিদীন হযরত মাওলানা কমান্ডার আব্দুল জব্বার দা.বা. ফিরে আসার রাস্তা খুঁজে পেয়ে কান্দাহার ফিরে আসেন এবং যাচাই করে তাদেরকে সত্যিকারের তালেবান ও শরীয়ত বাস্তবায়নে একনিষ্ঠ পান।

যেখানে তালেবানের হুকুমত ছিলো, সেখানে ইসলামও প্রতিষ্ঠিত ছিলো আবার নিরাপত্তাও পরিপূর্ণভাবেই ছিলো। তাই পূর্ণ নিশ্চিত হওয়ার পর হযরত মাওলানা কমান্ডার আব্দুল জাব্বার আমিরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর মুজাহিদের হাতে জিহাদের বায়াত গ্রহণ করেন। যার ফলে পাকিস্তানি মুজাহিদরা তালেবানের পূর্ণ সহযোগিতার ঘোষণা করে। এরই মধ্যে মাওলানা জালালুদ্দিন হক্কানী তার অধিনস্ত এলাকা পাকতিয়া, পাকতিকা, খোস্ত এবং লোগর কোনো প্রকার বিরোধিতা ছাড়া তালেবানের হাতে দিয়ে দেন। তিনি নিজেও তালেবানের সাথে মিলে শেষ পর্যন্ত তাদের অনুগত থাকেন এবং থাকবেনও ইনশাআল্লাহ।

১৯৯৬ সালে তালেবান কাবুল নিয়ন্ত্রণে নেয় এবং যুদ্ধবাজদের খতম করে দিয়ে আফগানিস্তানের নাম দেন 'ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান'। আর তালেবানের সর্বোচ্চ নেতা মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর দা.বা.কে আমিরুল মুমিনীন ঘোষণা করে। তারপরই তালেবানের সর্বাত্মক যুদ্ধ হয় আহমদ শাহ মাসউদের সাথে। ২০০১ সালে আমেরিকার অন্যায় আগ্রাসন পর্যন্ত তালেবানরা আফগানিস্তানের ৯৭% এলাকা নিয়ন্ত্রণ করছিলো। আর আহমদ শাহ মাসউদ

পাঞ্জশিরে সীমাবদ্ধ ছিলো। সে আমেরিকার অন্যায় আগ্রাসনের কিছুদিন আগে এক ফেদায়ী হামলায় নিহত হয়।

গাদ্দারি করার পরও আব্দুল্লাহ নূরী ক্ষমতার অংশীদার হতে পারেনি। কেজিবি'র এজেন্ট প্রশাসকরা তার প্রতি ভরসা করতো না, আবার গাদ্দারি করার কারণে মুজাহিদীনরাও তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করতো না। তাই সে ইরান পালিয়ে যাওয়ার মধ্যেই নিরাপত্তা মনে করে।

نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم

نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے

না খোদা পেলো, না মূর্তির দর্শন

না থাকলো এদিকের, না পেলো ওদিকের যতন।

যদি সে তাওবাও না করে তাহলে একেই বলে,

خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ.

দুনিয়া আখেরাত উভয়ই হারালো। *[হজ ২২:১১]*

মুজাহিদরা কারী তাহের ইয়ালদুশিফ এবং কমান্ডার জুমা খান নমঙ্গানী শহীদ রহ. এর নেতৃত্বে উজবেকিস্তান এবং তাজিকিস্তানের বিরুদ্ধে আক্রমণ অব্যাহত রাখে। আজমরেও তাদের সাথে জিহাদে শরীক থাকে। তাজিকিস্তানের হুকুমত সেনা অভিযান চালানোর পর দ্বিতীয়বার ব্যর্থ হয়ে মুজাহিদীনের সাথে আলোচনা করে। তখন উজবুক মুজাহিদীনরাও সঠিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে আলোচনা জারি রাখে।

এরই মধ্যে তালেবানরা কুন্দুজ বিজয় করে এবং উজবুক মুজাহিদীনের সাথে যোগাযোগ হয়। কারী সাহেব হযরত আমিরুল মুজাহিদীন মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর মুজহিদ-এর সাথে কথা বলার পর তাজিকিস্তান প্রশাসনের সাথে নিরাপত্তার শর্তে তাজিকিস্তান ছেড়ে যাওয়ার চুক্তি করে। যার মধ্যে তাজুক প্রশাসন মুজাহিদীনকে আফগানিস্তানের কুন্দুজ শহর পর্যন্ত নিরাপদে পৌছার নিশ্চয়তা দিতে অঙ্গীরাবদ্ধ ছিলো। যখন উজবুক মুজাহিদীন কুন্দুজ পৌছে তখন মোল্লা দাদুল্লাহ শহীদ রহ., মোল্লা ফজল আখুন্দ, মোল্লা বেরাদার এবং মোল্লা আব্দুশ শুকুর উজবুক সাথীদেরকে সাদরে গ্রহণ করেন। আমিরুল মুমিনীনের পরামর্শ অনুযায়ী তাদেরকে আফগানিস্তানের বিভিন্ন শহরে পূনর্বাসন করা হয়। কিছুদিন পরই আমিরুল মুমিনীন বিদেশি তালেবান মুজাহিদীনের মজলিসে সকল বিদেশি মুজাহিদীনের (উজবুক, তাজুক, পাকিস্তানি, আরব এবং আফ্রিকা) আমির নিযুক্ত করেন কমান্ডার জুমা খান নমঙ্গানীকে। তাদের নায়েবে কমান্ডার মোল্লা আব্দুল

জাব্বার আখুন্দকে এবং তাদের পর্যবেক্ষক সাথী সর্বোচ্চ কমান্ডার নির্ধারণ করা হয় ভাই ওমর ফারুককে। কমান্ডার জুমা খান নমঙ্গানী শহীদ রহ. ২০০১ সালে আমেরিকার আক্রমণের পর যখন তালেবান পিছু হটছিলো তখন মাজার শরীফে আমেরিকার বোম্বিংয়ে শহীদ হন।

আজমরে তাজিকিস্তান থেকে হিজরত করে আফগানিস্তানে চলে আসলে তার চেপে রাখা যোগ্যতা প্রকাশ পেতে থাকে। আজমরে তালেবান সেনাদলে শরীক হয়ে কুন্দুজ, তুখার এবং ফরখার পর্যন্ত বীরত্ব প্রদর্শন করতে থাকে। আজমরের বীরত্ব ও সাহসিকতার সাক্ষী বাগরামের মোর্চা এবং কুরাহবাগ রণাঙ্গন। কয়েকটি যুদ্ধে আজমরে উজবুক মুজাহিদীনের সাথে ছিলো। তার যুদ্ধের যোগ্যতার উপর কমান্ডার জুমা খান নমঙ্গানী রহ. এবং অন্যান্য কমান্ডারগণ ভরসা করতেন।

এরই মধ্যে ক্রুসেডাররা আফগানিস্তানে হামলা করে এবং তালেবানরা হুকুমত ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেয়। তখন আজমরে ফিরে যাওয়ার পরিবর্তে অগ্রগামী হয়ে জিহাদের ময়দানে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেয়। তারপর সে পাকতিকা, গারদিজ, গজনি পাকতিয়া এবং খোস্তে অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করে। যখন উজিরিস্তানে পাকিস্তানি প্রশাসনের ইঙ্গিতে পাকিস্তানি মুজাহিদীনের বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু করে তখন আজমরে কুফরের সংরক্ষক শক্তির বিরুদ্ধেও ময়দানে হাজির হয়। আজমরে একদিন মাইন ব্লাস্ট হওয়ার কারণে জখমি অবস্থায় আমার সামনে ছিলো। আমি তার বাবা-মা এবং ভাই-বোনের সাথে যোগাযোগ করতে বললাম। তাকে পরামর্শ দিলাম, কিছুদিন তোমার আত্মীয়-স্বজনের সান্নিধ্যে কাটিয়ে আসো। তখন সে উত্তেজিত হয়ে উচ্চ আওয়াজে বলতে থাকে–

আফগানিস্তান কি আজাদ হয়ে গেছে?

আমার জন্মভূমি তাজিকিস্তান এবং অন্যান্য দেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে?

আমার সেসব ইসলামী মা-বোন, যাদেরকে মুসলমান হওয়ার কারণে শহীদ করে দেয়া হয়েছে, তাদের রক্তের প্রতিশোধ নেয়া হয়ে গেছে?

কুফরের কয়েদখানায় বন্দী আমার ভাইয়েরা মুক্ত হয়ে গেছে?

ইহুদী, হিন্দু এবং খ্রিস্টানদের হাত থেকে ইসলামী রাষ্ট্রগুলো আজাদ হয়ে গেছে?

মুসলিম উম্মাহ তাদের হারানো ভূখণ্ডগুলো ফিরে পেয়েছে?

না, নিশ্চয় না। তাহলে আজমরে ফিরে যাবে না। আজাদি এবং আল্লাহর আইন বাস্তবায়ন দেখে আমার চোখকে শীতল করবো, নতুবা আমার গর্দানের তপ্ত খুন ইসলাম প্রতিষ্ঠার এই আন্দোলনে ঢেলে দেবো।

আজমরের এই সাহসিকতা এবং বাহাদুরী দেখে আমি তার প্রতিজ্ঞা এবং বড়ত্বের অনুরাগী হয়ে যাই। আমি বুঝে ফেলি, সে প্রতিজ্ঞার এমন চূড়ায় অবস্থান করছে যা দেখার জন্য মানুষের মাথার পাগড়ি পায়ে এসে পড়ে। হিমালয়ও নিজের উচ্চতার উপর লজ্জা অনুভব করে।

আজমরের সাহসিকতা এবং পাথরের টুকরো গলিয়ে ফেলার মতো জযবা দেখে আমি চিন্তা করতে লাগলাম, মুজাহিদীনের জন্য এসব দেশের নিকট অতীতের ইতিহাস অবশ্যই পড়া দরকার। কারণ, এখন ভাল-মন্দ এবং হক-বাতিলের যুদ্ধ উত্থানের উপর আছে। এর মাধ্যমে জানা যাবে কুফর মুসলমানদের কোন কোন দুর্বলতা থেকে ফায়দা উঠিয়েছে এবং কোন কোন কৌশলে তাদেরকে ধ্বংস করতে সফল হয়েছে।

একটা সময় এমন ছিলো, ইসলামী ইতিহাসের ক্ষণজন্মা ব্যক্তিত্বদের জন্মস্থান এবং বাসস্থান ছিলো এসব দেশে। এসব জনবহুল এলাকায় বড় বড় মুফাসসিরীন, ঈর্ষণীয় মুহাদ্দিসীন, ফুকাহায়ে উম্মত, অনলবর্ষী বক্তা, ঈর্ষণীয় মুসলিম বিজ্ঞানী ও দার্শনিক, প্রসিদ্ধ উলামায়ে কেরাম, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, সৈনিক, জেনারেল এবং বরকতময় ওলী-বুযুর্গ জন্ম নিয়েছেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাস্ত্র এবং জীবনের সকল অঙ্গনে অবদান রাখার ক্ষেত্রে এই এলাকার প্রসিদ্ধ উলামায়ে কেরামের তালিকা এতো দীর্ঘ যে, এ বিষয়ে কয়েকটি পুস্তক রচনা করা সম্ভব। তবু এই এলাকার ব্যক্তিত্বের অনুমান এসব উপমা থেকে করা যেতে পারে।

১. হযরত আব্দুল্লাহ বিন মোবারক রহ.। যিনি হাদীস ও ফিকাহ'র প্রসিদ্ধ ইমাম ও মুজতাহিদ। তিনি হযরত ইমামে আজম আবু হানিফা রহ. এর ফিকহি মজলিসে শুরার রোকন এবং বিশেষ শাগরিদও ছিলেন। তাঁর জন্মভূমি ছিলো তুর্কমেনিস্তানের প্রসিদ্ধ শহর মরু।

২. সহীহ মুসলিমের লেখক, ইমাম মুসলিম রহ. এর উস্তাদ মুহাম্মাদ বিন আব্দুলাহ কহযাদও এই মরু-এর ঈর্ষণীয় সন্তান।

৩. আমিরুল মুমিনীন ফিল হাদীস, বুখারী শরীফের লেখক, ইমাম বুখারী রহ. উজবেকিস্তানের বুখারা শহরে জন্ম গ্রহণ করেন। তার মাজারও সমরকন্দের পাশে খরতঙ্গ প্রদেশে রয়েছে।

৪. 'জামিউত তিরমিযী' এর লেখক ইমাম তিরমিযী রহ.-এর জন্মভূমিও উজবেকিস্তানের তিরমিয শহরে। যেটি আমু নদীর উত্তর পাড়ে আফগানিস্তানের একদমই নিকটে অবস্থিত।

৫. ফিকহে হানাফীর প্রসিদ্ধ কিতাব 'হিদায়াহ' এর লেখক আল্লামা মুরগিনানী রহ., ফিকহে হানাফীর আরো একটি বিখ্যাত গ্রন্থ 'বাদায়েউস সনায়ে' এর লেখক ইমাম কাসানী রহ. এর মত বিচক্ষণ হানাফী উলামায়ে কেরাম এবং ফুকাহায়ে যমানও উজবেকিস্তানের মাটিতেই জন্মেছিলেন।

৬. দার্শনিক আবু নসর আল ফারাবী, ইবনে সীনা, জ্যোতির্বিজ্ঞানী উলগ বেগের মতো ব্যক্তিত্বও এই ভূখণ্ড থেকে উঠে এসেছেন এবং জ্ঞান বিজ্ঞান দ্বারা দুনিয়া ভরে দিয়েছেন।

রুশ কমিউনিস্টদের জবরদখলের পর ইসলাম এবং মুসলমানদেরকে নিঃশেষ করার জন্য পূর্ণ চেষ্টা ব্যয় করা হয়েছে। রুশ এবং তাদের এজেন্টরা নেকড়ের মতো এসব এলাকায় ঝাঁপিয়ে পড়ে। কুরআন মজিদ ছাপা এবং প্রচার বন্ধ করা, কুরআনের শিক্ষা বন্ধ করা, আল্লাহর নাম নেয়া মুসলমানদেরকে রুহানী অপরাধী সাব্যস্ত করে সাইবেরিয়ার শীতল বরফের জাহান্নামে নিক্ষেপ করা থেকে নিয়ে এমন কোনো জুলুম নেই যা তাদের উপর প্রয়োগ করা হয়নি। কিন্তু খুশির কথা হলো, এসব মজলুম মুসলমানদের ঈমান এতই গভীর যে, কুফর, শিরক, জুলুম এবং অত্যাচারের অন্ধকারেও ইসলামের প্রদীপকে এক মুহূর্তের জন্যও নিভতে দেয়নি। তারা চুপি চুপি নামাজ পড়তো এবং বাচ্চাদেরকে শেখাতো। কুরআন মাজীদের কপি নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সংরক্ষণ করতো। জীবিত থাকা রব্বানী উলামায়ে কেরাম গোপনে দরসের ধারাবাহিকতা চালু রাখেন। যার বদৌলতে আজ সেখানে উলামায়ে কেরামও বর্তমান আছেন, মুজাহিদীনও আছেন। সাধারণ লোকদের একটা বড় সংখ্যা নামাজ রোযা এবং ইসলামী শিক্ষার অনুসরণ করছে। তাদের সেই ধারাবাহিক প্রচেষ্টার ফসল হিসেবেই সেই মজলুম জাতির নওজোয়ান আজমরে আজ জেনারেল হয়ে তাহরিকে ইসলামী তালেবানে শরীক আছে। যে নাকি নিজের তনুমন, ধ্যান-সাধনা এবং ভরা যৌবন আল্লাহর রাস্তায় বিলিয়ে দেয়ার তীব্র ইচ্ছা পোষণ করে চলছে। দুনিয়াদারিকে লাথি মেরে নিজের দৃঢ় স্পৃহার পক্ষ থেকে দুনিয়াকে বলছে–

مٹ نہیں سکتا کبھی مرد مسلمان کہ ہے
اس کی اذانوں سے فاش سر کلیم خلیل

মরদে মুমিন যায় না কভু, হয় না কভু শেষ
এযে তাহার কালিমুল্লাহর গোপন কথার লেশ।

তালেবানের সাথে খাকরিজ প্রশাসনের সন্ধি

আমরা মেজবান মোল্লা আব্দুর রহমানের সাথে দুপুরের খাবার খাই। আমি, মোল্লা আব্দুশ শুকুর এবং অন্য দুই সাথী যারা আজমরেকে দেখতে উসমানিয়া বসতিতে নেমেছিলাম। সারা রাতের সফরের কারণে আমরা খুবই ক্লান্ত। ক্লান্তি আমাদেরকে দ্রুতই বিছানার পথ দেখিয়ে দেয়। শুইতেই রাজ্যের ঘুম নেমে আসে। আমাদের মেজবান আমাদেরকে যোহর নামাজের আগে ডেকে দেন। তিনি আগেই আমাদের জন্য কাপড়ের ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। আমরা গোসল করে কাপড় পরিবর্তন করে মোল্লা আব্দুর রহীমের মেহমানখানাতেই যোহর নামাজ আদায় করি। যোহর নামাজের পর মোল্লা আব্দুর শুকুর অপর দুই সাথীকে নিয়ে চুনার বসতিতে চলে যান। আমি আজমরের নিকট উসমানিয়া বসতিতেই থেকে যাই। পর দিন ফজর নামাজের পর নাশতা করে মোল্লা আব্দুশ শুকুরের সাথে ওয়ারলেসের মাধ্যমে যোগাযোগ করি। সালাম ও দোয়ার পর মোল্লা আব্দুশ শুকুর বললেন, খাকরিজ প্রশাসন সন্ধি করার প্রস্তাব পাঠিয়েছে। তিনি বলেন, তালেবান মুজাহিদীনের গত রাতে খাকরিজ জেলে আক্রমণের ফলে খাকরিজ প্রশাসন খুবই ভয় পেয়েছে। আফগান ন্যাশনাল আর্মি এবং সম্মিলিত ক্রুসেডার সৈন্যের পক্ষ থেকে সময় মতো সহযোগিতা না পাওয়ায় নিজেদের জানের হেফাজতের জন্য তালেবানের সাথে চুক্তি করতে চুনার বসতিতে আমাদের নিকট সংবাদ পাঠিয়েছে। তিনি আরো বলেন, তারা চুক্তির বিস্তারিত বর্ণনা এবং শর্তাবলির ব্যাপারে লেনদেনের অনুমতি নিতে তালেবানের সাধারণ আমির কারী ফয়জুল্লার কাছে সুড়সেক যাচ্ছে।

তালেবানের শর্তাবলি

১. মাসিক অর্থ প্রদান।

২. তালেবান মুজাহিদীনকে নিরাপদ যাতায়াত ব্যবস্থা প্রদান।

৩. অস্ত্র ও মাইন সরবরাহ।

৪. বিদেশি মুজাহিদীনের নিরাপত্তা এবং আশ্রয় প্রদান।

৫. আমেরিকান ও সম্মিলিত সৈন্য আসার সময় সংবাদ দেয়া।

৬. গোয়েন্দাবৃত্তির সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের তথ্য প্রদান।

৭. অপারেশনের আগে তালেবানকে অবগত করা।

এ সবকিছুই খাকরিজ প্রশাসনের দায়িত্ব। মোল্লা আব্দুশ শুকুর আরো বলেন, এসব শর্তের উপর চুক্তি হয়ে যাওয়ার খুবই সম্ভাবনা রয়েছে। এর বিনিময়ে

খাকরিজ প্রশাসনকে জানের হেফাজত এবং আক্রমণ না করার প্রতিশ্রুতি দেয়া হবে।

আমি সন্ধ্যায় মাগরিবের নামাজের আগে চুনার বসতিতে পৌঁছি। তখন খাকরিজ প্রশাসনের প্রতিনিধি মোল্লা আব্দুশ শুকুর এবং অন্যান্য তালেবান নেতার সাথে আলোচনায় ব্যস্ত ছিলো। তারা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিষয়বস্তু নির্ধারণ করছিলেন। মাগরিবের নামাজের সময় মোল্লা আব্দুশ শুকুর বাইরে আসেন এবং সব সাথীদেরকে চুক্তি হয়ে যাওয়ার সুসংবাদ শোনান। সাথীরাও খুশি প্রকাশ করেন। মুজাহিদীনের সফল আক্রমণ এবং কৌশলী কর্মপদ্ধতির কারণে খাকরিজ জেলা সম্মিলিত ক্রুসেডার থেকে মুক্ত হয়ে যায়। আর খাকরিজ জেলার প্রশাসন তালেবানের হাতের পুতুল হয়ে থাকতে বাধ্য হয়।

সুড়সেক মুজাহিদীনের মারকাজে কানাডিয়ান আর্মির বিরুদ্ধে আক্রমণের জন্য উদ্বুদ্ধকরণ

যাই হোক খাকরিজ জেলার তালেবান এবং খাকরিজ জেলা প্রশাসনের মধ্যে চুক্তি হয়ে যায়। যার মধ্যে তারা বর্ণিত শর্তের ভিত্তিতে তালেবানের পক্ষ থেকে জানের নিরাপত্তার চুক্তি করে। তাই তাদের বিপক্ষে ততক্ষণ পর্যন্ত আক্রমণ পরিচালনা করা সম্ভব নয়, যতক্ষণ না তারা চুক্তি বিরোধী কোনো কাজ করে। সকল তালেবান সাথী চুক্তি হয়ে যাওয়াতে খুবই খুশি ছিলো। কারণ, তালেবানরা এলাকাতে প্রকাশ্যে যাতায়াত করতে পারবে। ক্রুসেডার সম্মিলিত বাহিনী খাকরিজ জেলার বালিময় প্রান্তর এবং জমিনের ধরন উপযুক্ত না হওয়ায় আগে থেকেই খাকরিজ জেলার ভিতরে তাদের কোনো ক্যাম্প রাখেনি। খাকরিজের পুলিশ এবং আফগান ন্যাশনাল আর্মি দিয়েই তারা খাকরিজে নিজেদের কার্যসিদ্ধি করতো। তবে বিশেষ প্রয়োজনে ক্রুসেডাররা নিজেরাই অভিযান পরিচালনা করতো। যার ফলে তালেবানরা সবসময় খাকরিজে প্রস্তুতি নিয়ে থাকতো। কিন্তু চুক্তি হয়ে যাওয়ার পর অবস্থা পাল্টে গেছে। এখন খাকরিজ প্রশাসন তালেবানের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ। ক্রুসেডারদের অপারেশনের আগেই তালেবানকে সে সম্পর্কে অবগত করা তাদের চুক্তির অন্তর্ভূক্ত দায়িত্ব। তাই খাকরিজে তালেবানের অতিরিক্ত শক্তি নিযুক্ত রাখার কোনো প্রয়োজন ছিলো না। তাই কারী ফয়জুল্লাহ সাহেব চুনারে যোগাযোগ করে আমাকে এবং মোল্লা আব্দুশ শুকুরকে মুজাহিদীনের মারকাজ সুড়সেকে তার কাছে ডেকে নেন। যখন আমরা সুড়সেকে পৌঁছি, তখন সেখানে মোল্লা আব্দুল হাকিম এবং মৌলভী বায মুহাম্মাদসহ প্রচুর সংখ্যক মুজাহিদীন উপস্থিত ছিলেন। তারা খাকরিজ চুক্তির

ব্যাপারে খুবই খুশি ছিলেন। আমাদেরকে দেখে তারা আনন্দে তুমুল তাকবির দিতে থাকেন। মনে হচ্ছিলো কোনো বড় মাহফিল চলছে। আফগানিস্তানের পাথুরে পাহাড়ে শাহী গুণবিশিষ্ট মুজাহিদীনের আনন্দ দেখার মতো ছিলো। যা তাদের দৃঢ়তার প্রমাণ বহন করছিলো। আর এসব মুজাহিদ-গাজিদের জন্যই আল্লামা ইকবাল বলেছেন–

یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے
جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی
دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا
سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی

এরা গাজি এরা তোমার, পূর্ণ গোপন বান্দা
যাদের হাতে দিয়েছ তুমি, শাহী মনের ঝাণ্ডা।
বজ্রাঘাতে তাদের হাতে মিলে স্থল ও জল
হবেই পাহাড় এটাই তাদের দৃঢ় রায়ের ফল।

আমরা যখন সুড়সেক পৌঁছি তখন সকাল সাড়ে দশটা বেজেছিলো। কারী ফয়জুল্লাহ, মোল্লা আব্দুল হাকিম এবং মৌলভী বায মুহাম্মাদ আগামী কর্মপদ্ধতি নিয়ে চিন্তা-ফিকির করছিলেন। তাদের সাথে মোল্লা আব্দুশ শুকুরও পরামর্শে শরীক হয়ে যান। কারী সাহেব আগামী অভিযান এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেন। বৈঠক যোহর নামাজের আগে শেষ হয়। বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আব্দুর রহমান, শায়খ উসমান এবং খলিফা ভাইকে শাহ ওলিকোট এলাকার শিনে নিযুক্ত করা হয়। আমাদের সহযোগিতা এবং অস্ত্রশস্ত্র যোগান দেয়ার জন্য মোল্লা সরদারকেও আমাদের সাথে দেয়া হয়। আমাদের দায়িত্ব হলো, গম্বুজ বসতিতে ক্যাম্প স্থাপনকারী কানাডিয়ান ফৌজের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করা এবং কানাডিয়ান ফৌজের রাস্তায় মাইন বিছানো। যাতে তাদের সর্বাধিক ক্ষতি করতে পারি। বাকি ৭০ জন সাথীকে কারী সাহেব শিন শহরে হামলা করতে নিযুক্ত করেন। তাদের মধ্যে মোল্লা আব্দুশ শুকুর, মৌলভী বায মুহাম্মাদ এবং মোল্লা আব্দুল হাকিমও শামিল হয়ে যান। তাদের নেতৃত্ব দিবেন কারী ফয়জুল্লাহ সাহেব নিজে।

সুড়সেক এবং নামকরণের কারণ

সুড়সেকে মুজাহিদীনের এই মারকাজ আবাদী থেকে একটু দূরে। কিছুটা প্রশস্ত, সবুজ-শ্যামল এবং প্রাঞ্জল পাহাড়ি টিলার মাঝখানে অবস্থিত। এখানে বড় বড়

পাথর আছে। যে কোনো কঠিন মুহূর্তে পাথরের মধ্যে লড়াই করা সহজ। আর এ জন্যই তালেবান মুজাহিদরা এই এলাকাকে তাদের মারকাজ হিসেবে ব্যবহার করতো। এই এলাকার চারদিকে কিছু ছোট ছোট পাহাড় রয়েছে, যেগুলো মারকাজকে একটি দূর্গ বানিয়ে রেখেছে। এখানে ছোট ছোট ঝর্ণা আছে, যেগুলো পাহাড়ের মাঝখানে এক সুন্দর দৃশ্যের অবতারণা করে। এসব পাহাড়ে বিভিন্ন ফলদার গাছও আছে, যেগুলোর মধ্যে আঞ্জির, বাদাম উল্লেখযোগ্য। আর ফুলের সমারোহ দেখে তো আনমনে যবান থেকে উচ্চারিত হয়–

فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

অতএব সর্বোত্তম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালা কতোই না বরকতময়! *[মুমিনুন ২৩:১৪]*

আর যখন বৃষ্টি হয় অথবা বরফ গলতে শুরু করে তখন পাহাড় থেকে আগত পানি একটি বড় নালায় জমা হয়ে যায়। যাকে দেখতে একটি বড় নদীর মতো মনে হয়। এ দৃশ্য বড়ই মনলোভা। এটি খুব সুন্দর একটি এলাকা। যাতে প্রচুর পরিমাণ পানি রয়েছে। যারফলে এর আশেপাশে বিভিন্ন জায়গায় প্রায় ৮-১০টির মতো বসতি আবাদ রয়েছে। কোন বসতিরই নির্দিষ্ট কোনো নাম ছিলো না। সবগুলোই 'শিলে' নামে পরিচিত ছিলো।

যখন আমরা কারী ফয়জুল্লাহ সাহেবের নিকট পৌঁছি, তখন আমাদেরকে লাচ্ছি এবং যবের রুটি দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়। আমি লাচ্ছির ব্যাপারে জানতাম পশতু ভাষায় একে শটরমুবে বলে। কিন্তু যবের রুটির ব্যাপারে মেজবানকে জিজ্ঞেস করলে, সে বলে এটিকে সুড়সেক বলে।

পার্শ্ববর্তী বসতিগুলোর কোনো নাম না থাকায় যে বসতিতেই যাই তাকে শীলে-ই বলতো। আমি চেনার জন্য কিছু সাথীকে জিজ্ঞেস করলে তারা এই বসতির নাম শীলে বলার পরিবর্তে কোড নম্বর হিসেবে সুড়সেক রাখে। তারপর ওয়ারলেসে এই কোডই প্রসিদ্ধ হয়ে যায় এবং তালেবানরাও এই কোডকে খুব পছন্দ করেন। আর কারী ফয়জুল্লাহ সাহেবের কাছে তালেবানের যাতায়াতের কারণে তালেবানের মধ্যে এই নাম খুব দ্রুত প্রসিদ্ধি লাভ করে। তালেবানের মধ্যে এই এলাকার পরিচিতি সুড়সেক নামে হওয়ায় দূর দূরান্তেও এই ডাক শোনা যেতে থাকে। যখন এলাকার লোকেরা এই নামের ব্যাপারে জানতে পারলো তখন তারা এটিকে খুব পছন্দ করলো এবং এই বসতিকে সুড়সেক বলতে থাকলো। এভাবেই এই সুড়সেক নাম ছোট বড় সবার মুখে উঠে যায়।

শিনের দিকে যাত্রা

তাশকীলের পর আব্দুর রহমান, শায়খ উসমান এবং খলিফা ভাই মোল্লা সরদারের সাথে ক্লে বারেকজাই চলে যান। কারণ, মাইন এবং অন্যান্য সরঞ্জাম যোগান দেয়া মোল্লা সরদারের জিম্মায় ছিলো। তাই এই তিন সাথী মোল্লা সরদারের সাথে মাইন, রিমোট কন্ট্রোল ইত্যাদি আনতে ক্লে বারেকজাই চলে যান। জানা যায় দু'দিন পর খরতুতে গোলাব খানের সাথে তাদের সাক্ষাৎ হয়।

আমি আমার প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম আনতে সুড়সেক থেকে লুড়াওয়ালা বসতিতে চলে আসি। আমি আমার হ্যান্ডিক্যাম ভিডিও ক্যামেরা, জি.পি.এস কম্পাস, রাশিয়ান খঞ্জর, চারটি ম্যাগজিন এবং দু'টি গ্রেনেড নিয়ে সেদিনই লুড়াওয়ালা থেকে খরতুতে গোলাব খানের নিকট চলে আসি। খরতুতে গোলাব খানের কাছে আসতে আমার কোনো কষ্টই হয়নি। কারণ, আমি ছয়দিন আগে আজমরের সাথে গোলাব খানের কাছে এসেছিলাম। যখন আজমরে মাইন বিছাতে গিয়ে জখমি হয়েছিলো তখন এই গোলাব খানই আজমরেকে মোটর সাইকেলে করে নিয়ে এসেছিলেন।

যখন আমি খরতুত পৌঁছি তখন এশার নামাজের সময় নিকটবর্তী ছিলো। গোলাব খান তার বাচ্চাদের সাথে বসে ছিলেন। মোটর সাইকেলের আওয়াজ শুনে বাহিরে এসে খুব আগ্রহভরে আমার সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং আমাকে তার বাগানে বানানো মেহমানখানায় নিয়ে যান। তার বাগানে আঞ্জির, বাদাম এবং আনার ইত্যাদির গাছ ছিলো।

গোলাব খান মোল্লা আব্দুশ শুকুরের খাছ লোক। তিনি শাহ ওলিকোট ও খাকরিজ এই দুই জেলার বর্ডারে বসবাস করেন। এ জন্য আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, আব্দুর রহমান, শায়খ উসমান এবং খলিফা ভাই মোল্লা সরদারের সাথে গোলাব খানের কাছে পৌঁছে যাবো এবং মাইন, রিমোট কন্ট্রোল, ডেটুভিটর টাইমার এবং মাইনের অন্যান্য সরঞ্জাম নিয়ে আসবো। এই দু'দিন আমি গোলাব খানের মেহমানখানায় কাটাই। তেলাওয়াত, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, ভবিষ্যতের চিন্তা-ফিকির এবং গোলাব খানের সাথে চারপাশে চাষ করা ফসল দেখাশোনা করে সময় কেটে যায়। দু'দিন পর আব্দুর রহমান, শায়খ উসমান, খলিফা ভাই এবং মোল্লা সরদার মাইন এবং অন্যান্য সরঞ্জাম নিয়ে চলে আসেন।

আমরা একটি মোটর সাইকেলে মাইন এবং অন্যান্য সরঞ্জাম বেঁধে খলিফা ভাইয়ের দায়িত্বে দিয়ে তাকে শিনে রওয়ানা করে দেই। মোল্লা সরদারের সাথে আব্দুর রহমান এবং আমার সাথে শায়খ উসমান আরোহণ করেন। খলিফা ভাই

রওয়ানা হওয়ার কিছুক্ষণ পর আমরাও শিনের দিকে রওয়ানা হয়ে যাই। রাস্তায় আমরা মোল্লা আব্দুর রহমানের ঘর থেকে আরো সরঞ্জাম নেই এবং এক ঘণ্টা দুর্গম ও কঠিন পথ অতিক্রম করে শিনে পৌঁছি। শিন বসতিতে মুসা খানের ঘরে বসার ব্যবস্থাপনা ছিলো। আমরা মুসা খানকে মাইন এবং অন্যান্য সরঞ্জাম ভালো করে হেফাজত করতে বলি। মোটর সাইকেল তিনটিও তার কাছে রাখি। আমরা দুপুরের খাবার মুসা খানের ঘরে খেয়ে একটু বিশ্রাম করি। যখন আমরা চোখ খুলি তখন আযানের সুমধুর আওয়াজ যোহরের পয়গাম শোনাচ্ছিলো। বসতির কোনো মুয়াজ্জিন হৃদয়ের গভীর থেকে আযান দিচ্ছিলেন।

وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان کا وجود
ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا

যে মন্ত্রে কেঁপে ওঠে হেরেমের তখ্ত
মুমিনের আযান-ই হলো সেই মন্ত্র।

যোহর নামাজ আদায়ের পর মোল্লা সরদার এই এলাকায় অবস্থিত তার দুই সাথীর সাথে যোগাযোগ করেন এবং তাদেরকে শিন বসতিতে আসতে বলেন। শিন হল শাহ ওলিকোট জেলায় অবস্থিত একটি বড় গ্রাম। যার একদিকে কাঁটাদার ঝাড় ও চোখ জুড়ানো বাদাম গাছ বিশিষ্ট পাথুরে পাহাড় এবং অপর দিকে সবুজ শ্যামল ক্ষেত আর বাগানের সারি দূর দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। পাহাড়ি নদী আর ঝর্ণা থেকে আগত পানি এখানে পর্যাপ্ত পরিমাণে রয়েছে। এখানকার চমৎকার ফসলের ক্ষেত এবং বাগানগুলো এই পানি থেকেই সিঞ্চিত হয়। সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো সুউচ্চ সাদাবাহার বৃক্ষগুলো না জানি কতো দীনি বাহাদুরের দীনি মর্যাদাবোধ, লজ্জা এবং মান-সম্মানের ফেরিওয়ালাদের সাক্ষ বহন করছিলো। ইসলামী আন্দোলনের আত্মা হযরত আমিরুল মুমিনীন-এর ডান হাত মোল্লা মুহিব্বুল্লাহ আখুন্দযাদাহ এর দাস্তান মুখস্ত শুনাচ্ছিলো।

دل کو تڑپاتی ہے اب تک گرمی محفل کی یاد
مل چکا حاصل، مگر محفوظ ہے حاصل کی یاد

এখনও দিল তড়পায় প্রাঞ্জল মাহফিলের ইয়াদে
ফল পেয়েছি তবে সে তো কেবলই স্মৃতির খেয়া যে।

মোল্লা মুহিব্বুল্লাহ আখুন্দযাদাহ এই গর্বিত এলাকা শিনেরই বাসিন্দা। তিনি চার বছর বীরত্ব এবং বাহাদুরির সাথে এই ফ্রন্টেই অতিবাহিত করেন। তারপর হযরত আমিরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর মুজাহিদ-এর ব্যক্তিগত পরামর্শে শিবারগান প্রদেশের গভর্নর নিযুক্ত হন। ২০০১ সালে ক্রুসেডারদের অন্যায়

আগ্রাসন এবং বর্বরতার সময় তালেবানের পিছু হটার পরিস্থিতিতে শিবারগান থেকে ক্রুসেডাররা তাকে গ্রেফতার করে শিবারগান জেলে বন্দী করে। তারপর দৃঢ়তার সাথে যুগের কলংক, কিউবার গোয়ান্তানামু বে এর জিন্দানখানায় ৩ বছর কাটানোর পর ইদানীং মুক্তি পান। তার ভাই এখনো কান্দাহার এয়ারপোর্টের তদন্ত সেলে বন্দী আছেন।

মোল্লা আব্দুল হাকিমও এই এলাকার গর্বিত ব্যক্তিত্ব। মোল্লা আব্দুল হাকিম অনেক বড় আলেম এবং মুহাদ্দিস। ইলমে ফেকাহতেও তার পূর্ণ গভীরতা রয়েছে। আফগানের শীর্ষস্থানীয় উলামায়ে কেরামের মধ্যে তাকে গণ্য করা হয়। এলাকাতে তিনি অনেক বড় প্রভাব রাখেন। আজ তিনি তালেবানের কাতারে শামিল হয়ে ক্রুসেডারদের উপর কার্যকর আঘাত হেনে যাচ্ছেন। তিনি ইলম ও জিহাদের এক শানদার এবং সুন্দরতম সংমিশ্রণ।

মোল্লা আব্দুল বাসির শহীদ রহ.ও শিন এলাকার উল্লেখযোগ্য উলামায়ে কেরামের একজন। তিনি পাকিস্তানের একটি বড় জামিয়া থেকে ফারেগ হয়েছেন এবং ইদানীং আমেরিকানদের সাথে এক যুদ্ধে শহীদ হন। তার শহীদ হওয়ার পর তার ছোট ভাই মোল্লা সরদারকে এই এলাকার কমান্ডার নিযুক্ত করা হয়। বর্তমানে সে এই এলাকার তালেবানের হামলার পর্যবেক্ষক।

আসর নামাজের কাছাকাছি সময়ে মোল্লা সরদারের ডাকা দুই সাথী শিন বসতিতে চলে আসে। তাদের চেহারা সুন্নাতে নববী; দাড়ি দ্বারা সজ্জিত। কপালে ঈমানের নূর চমকাচ্ছিলো। তাদের একজন সামনে এসে নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বললেন, আমি মহব্বত খান। মহব্বত খান আসলে মহব্বত খানই ছিলেন। তিনি শুধু নামে নয় কাজেও মহব্বত খান। মুজাহিদীনের খেদমতের জন্য তিনি সর্বদা প্রস্তুত থাকতেন। আগত দু'জনই শিন বসতির চারপাশে লকলকে ফসলের মাঠে খরবুজ চাষ করেছেন। তাদের প্রচুর শাহতুতের ফলদার গাছও রয়েছে। উভয়ের বয়সে ছিলো পূর্ণ যৌবন। মুসা খান সময়ের চাহিদা বুঝে তার বিদেশি মেহমানদেরকে খরবুজ এবং শাহতুত দিয়ে মেহমানদারি করেন। যার স্বাদ ছিলো অতুলনীয়।

সরল-সহজ তালেবান এবং ক্রুসেডীয় নির্লজ্জতা

মহব্বত খান এবং তার সাথী আসার পর আমরা গত ছয় মাস যাবত চলে আসা ব্যর্থ আক্রমণগুলো নিয়ে চিন্তা ফিকির করতে থাকি। কী কারণে আক্রমণগুলো কার্যকর হচ্ছিলো না? মোল্লা সরদার বললেন, আমরা এই রাস্তাতেতেই কানাডিয়ান আর্মির কাফেলার পথে রিমোট কন্ট্রোল মাইন বিছিয়ে ছিলাম। কিন্তু

কাফেলা আসার আগে আকাশে একটি জেট বিমান চক্কর দিতে থাকে। যার ফলে মাইন বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হয়ে যায়। আমরাও কোনো ব্লাস্টিং টোন দেইনি, অন্য কোনো মাধ্যমেও ডাইরেক্ট বিদ্যুৎ সংযোজন পায়নি। গত ছয় মাস যাবত এমনই হয়ে আসছে। এতে আমাদের অনেক ক্ষতি হয়েছে। কখনো সাথীদের রিমোট কন্ট্রোল মাইন বিছানোর সময়, কখনো বিছানোর কিছুক্ষণ পরই বিস্ফোরণ হয়ে যায়। যদি সাথী নিকটে থাকে তাহলে হয়তো শহীদ হয়ে যায় নতুবা মারাত্মক জখমি হয়।

এভাবে নিজে নিজেই মাইন ব্লাস্ট হয়ে যাওয়ার অভিজ্ঞতা আমারও রয়েছে। কারণ, কিছুদিন আগে আজমরেও এ ধরনের দুর্ঘটনায় আক্রান্ত হয়েছিলো।

মোল্লা সরদার আরো বলেন, ইদানীং আরো একটি ঘটনা ঘটছে। যারফলে আমরা খুবই পেরেশান। এতে মাইন তো ব্লাস্ট হয় না কিন্তু কাফেলা নিকটে আসলেই ওয়ারলেস সেট কোনো কাজ করে না। জ্যাম হয়ে থাকে। এ ব্যাপারে আমরা প্রথমে মনে করেছিলাম হয়তো ওয়ারলেস সেট নষ্ট। কিন্তু কাফেলা চলে যেতেই ওয়ারলেস সেট একদমই ঠিক হয়ে যায়।

তিনি বলেন, এর বিকল্প আমরা এভাবে বের করি যে, মাইন একটি লম্বা তারের সাথে সংযুক্ত করে কাফেলা আসলে ডাইরেক্ট বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া হবে। কিন্তু এ পদ্ধতিটি বেশি কার্যকর হলো না। কারণ, দীর্ঘদিন সম্মিলিত ক্রুসেডার বাহিনীর কাফেলার অপেক্ষায় থাকাতে হয়তো ছাগল ভেড়া যাওয়ার কারণে তার ছিঁড়ে যেতো নতুবা ক্যামোফ্লাজ ঠিক না থাকার কারণে মাইন বের করে ফেলতো। তাছাড়া বেশিদিন থাকার কারণে ব্যাটারির পাওয়ার ঠিক থাকতো না এবং পূর্ণ বিদ্যুৎ পেতো না। যার ফলে আমরা খুবই পেরেশানিতে আছি। নির্লজ্জ ক্রুসেডাররা জ্যামিং সিস্টেম কাজে লাগিয়ে মাইন ব্লাস্ট করার কারণে সরল-সহজ তালেবানরা খুবই পেরেশান ছিলো। মহব্বত খান আমাকে বললেন, এই এলাকাতে কানাডিয়ান আর্মির যাতায়াত খুবই বেশি। মুজাহিদীনের কয়েকটি আক্রমণ ব্যর্থ হওয়ার কারণে ক্রুসেডারদের সাহস আরো বেড়ে যায়। গত ৬ মাস যাবত তাদের বিরুদ্ধে কোনো কার্যকর আক্রমণ পরিচালনা করা সম্ভব হয়নি। আব্দুর রহমান এবং খলিফা ভাই দীর্ঘক্ষণ যাবত মোল্লা সরদার এবং মহব্বত খানের কথা শুনছিলেন। তাদেরকে খুবই পেরেশান মনে হচ্ছিলো। আমি বললাম, আল্লাহ মদদ করবেন। পেরেশান হওয়ার কোনো কারণ নেই। আপনারা দু'জন মহব্বত খানের সাথে গিয়ে গম্বুজ বসতি থেকে চলে যাওয়া দ্বিতীয় রাস্তায় কানাডিয়ান আর্মির ক্যাম্পের উপর রেকি করুন। আমি এবং শায়খ উসমান এদিকে থেকে কানাডিয়ান আর্মির বিরুদ্ধে আক্রমণের পরিকল্পনা

তৈরি করি। যাতে খুব দ্রুতই তাদের বিরুদ্ধে কোনো কার্যকর আক্রমণ পরিচালনা করে তাদের ক্ষতি করা যায় এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে বিরাজ করা নৈরাশ্য দূর করা যায়।

তবে এর ফলে তালেবানের সাহসিকতায় কোনো ভাটা পড়েনি; বরং তারা অন্য এলাকায় পুরোদমে তাদের কার্যকর হামলা এবং বিজয়ের মাধ্যমে সেই সাহসিকতা প্রকাশ করছিলো যে,

اللہ کی رحمت سے کیفی دم توڑ چکی ہے تاریکی
ہلکا سا دھندلکا باقی ہے اس کو بھی مٹا کر دم لیں گے

আঁধার কিভাবে করবে বিমুখ খোদার মদদ থেকে
শেষ ঘোরটুকু মিটিয়ে তবে নিঃশ্বাস নেবো বুকে

গুল খানের মর্মান্তিক শাহাদাত

আব্দুর রহমান এবং খলিফা ভাই গম্বুজে রওয়ানা হওয়ার পর আমরা এশার নামাজ পড়ি। নামাজের পর মোল্লা সরদার বলেন, আমাদের এক সাথী গুল খান রাস্তায় মাইন বিছিয়েছে। সেটি ব্লাস্ট করার জন্য গুল খান ৫০০ মিটার লম্বা তার বিশিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন করেছে। আমি সেটি দেখতে ইচ্ছা পোষণ করলাম। কিন্তু রাতের অন্ধকার এবং দিনভর ক্লান্তিকর সফরের কারণে ঘুম প্রাধান্য বিস্তার করছিলো। আমরা গুল খানের সাথে সাক্ষাৎ করাকে সকাল অবধি মুলতবি করি এবং ঘুমানোর জন্য বিছানায় লম্বা হয়ে যাই।

আমরা সকালে জাগ্রত হয়ে জানতে পারি, কাল এই রাস্তা দিয়ে কানাডিয়ান আর্মির কাফেলা তাদের ক্যাম্প গম্বুজ থেকে কান্দাহার যাবে। যখন এই সংবাদ পাই তখন আমরা ফজর নামাজের প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। ফজর নামাজ আদায়ের পর স্বাভাবিক নিয়মানুযায়ী আমরা নাশতা করি। তারপর আমি মোল্লা সরদারকে গুল খানের সাথে সাক্ষাৎ এবং তার বিছানো মাইন দেখার কথা বলি। আমরা সকাল প্রায় ৭ টার দিকে শিন থেকে রওয়ানা হই এবং এক ঘণ্টার মধ্যে মাইন বিছানো জায়গার নিকটে পৌঁছে যাই। সেখানে একটি উঁচু পাহাড় ছিলো। যেটিতে দাঁড়িয়ে গোটা এলাকা দেখা যায়। সাথে হ্যান্ডিক্যাম ভিডিও ক্যামেরা নিয়েছিলাম। আমি সেটি দিয়ে ভিডিও করি এবং গোটা এলাকার দৃশ্য সংরক্ষণ করি। সেখান দিয়ে চলে যাওয়া রাস্তার গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোও ক্যামেরার চোখ সংরক্ষণ করে। তারপর আমরা পাহাড়ের সামনের দিকে নিচে নামি। তখন গুল খানের সাথে সাক্ষাৎ হয়। গুল খান নিরাপদ পদ্ধতিতে মাইন রাস্তায় বিছিয়ে

রেখেছিলেন। তার সাথে ৫০০ মিটার লম্বা তার যুক্ত করে অন্য পাহাড় পর্যন্ত নিয়ে যান। গুল খানের ধারণা ছিলো, যখনই সম্মিলিত ক্রুসেডার বাহিনীর কাফেলা এখানে পৌঁছবে তখন ব্যাটারির সাথে এটি যুক্ত করে দিবেন এবং কাফেলা ও মাইন বরাবর হলে বাটন চেপে দিলে কাফেলা ধ্বংস হয়ে যাবে।

আমরা তখনও গুল খানের কাছে বসে ছিলাম, বকরির একটি পাল সামনে দিয়ে চলে যায়। যারফলে মাইনের সাথে যুক্ত তামার চিকন তার জায়গায় জায়গায় ছিড়ে যায়। গুল খান এতে পেরেশান হয়ে যান। কারণ আগামী কাল কানাডিয়ান আর্মির কাফেলা যাওয়ার কথা।

কিন্তু গুল খানও হেরে যাওয়ার পাত্র ছিলেন না। তার সাহসিকতা পাহাড় থেকেও উঁচু এবং পাথর থেকেও বেশি মজবুত ছিলো। তিনি বললেন, আমি রাতে এসে তার ঠিক করে দিবো। মোল্লা সরদার তার দৃঢ়তা এবং হিম্মত দেখে বললেন, ঠিক আছে, আমিও আপনার সাথে তার ঠিক করতে এসে যাবো। আমি শায়খ উসমান এবং মোল্লা সরদারের সাথে আসর নামাজের সময় ফিরে আসি এবং নতুন ধারণ করা ভিডিও দেখতে থাকি। যাতে সময়মতো গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় মাইন বিছানো যায় এবং সফল আক্রমণ পরিচালনা করা যায়। তারপর মাগরিব নামাজ আদায় করে খাবার খাই এবং মুসা খানের সাথে গল্প করতে থাকি। আমরা এশার নামাজ আদায় করার পর ঘুমিয়ে গিয়েছিলাম। মোল্লা সরদার আমাকে ডেকে বললেন, আমাকে আপনার গানটা দিন। আমি তার ঠিক করতে যাচ্ছি। আমি মোল্লা সরদারকে আমার গানটি দিতে দিতে বলি ওয়ারলেসে যোগাযোগ রাখবেন। মোল্লা সরদার এবং গুল খান উভয়ের কাছেই ওয়ারলেস সেট ছিলো।

মোল্লা সরদার এবং গুল খান তার ঠিক করতে চলে গেলে আমি আবার ঘুমিয়ে পড়ি। রাত একটার দিকে এক ভয়ংকর বিস্ফোরণে আমি জাগ্রত হই। বাইরে এসে দেখি যেদিকে মাইন বিছানো হয়েছিলো সেদিক থেকে আকাশে ধোঁয়া উড়ছে। আমি পেরেশান হয়ে যাই। কারণ, এখন কানাডিয়ান আর্মির কাফেলা যাওয়ার সময় নয়। এই ভেবে অন্তর পেরেশান হচ্ছিলো যে, আল্লাহ না করুন আমাদের কোনো সাথী তো মাইন ঠিক করতে গিয়ে বিস্ফোরণের শিকার হয়নি? নাকি কোনো সাধারণ গাড়ি বিস্ফোরণের শিকার হয়েছে? আমি দ্রুত ওয়ারলেসে গুল খান এবং মোল্লা সরদারের সাথে যোগাযোগ করতে চেষ্টা করি। মোল্লা সরদারের সাথে অল্প সময়ের মধ্যেই ওয়ারলেসে যোগাযোগ হয়। আমি অবস্থা জানতে চাইলে মোল্লা সরদার বললেন, আমি আপনার দিকে আসছি। ভুলে মাইন ব্লাস্ট হয়ে গেছে। আমাদের ক্ষতি হয়েছে। আমি মেহমানখানায় ফিরে

আসি এবং আমার ঘুমন্ত সাথী শায়খ উসমানকে জাগ্রত করে তাকে অবস্থা সম্পর্কে অবগত করি। ততক্ষণে মোল্লা সরদার চলে এসেছেন। তিনি সেখানের বিস্তারিত অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, আমরা টুকরো তারগুলো জোড়া লাগিয়ে প্রায় শেষ করে ফেলেছিলাম। মাইনে লাগানো তার উঠিয়ে টেস্টার মিটারের সাথে লাগিয়ে দেই। তাতে বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়ার জন্য গুল খান আমাকে ওয়ারলেসে বাটন চাপতে বললে আমি সুইচ অন করি। টেস্টার মিটারে বাতি জললে গুল খান আমাকে বলেন, আপনি এখন আমার দিকে চলে আসুন, আমি মাইনের উপর মাটি ঢেলে তা ভালো ক্যামোফ্লাজ করছি। কথা মতো আমি গুল খানের দিকে রওয়ানা হই। আমি মাত্র অর্ধেক রাস্তা অতিক্রম করেছিলাম, হঠাৎ তীব্র আলোর সাথে বিকট আওয়াজে বিস্ফোরণ হয় এবং মাইন ব্লাস্ট হয়ে যায়। আমি গুল খানের দিকে দৌড়ে যাই। সেখানে পৌঁছে দেখি ধুলোবালি আর ধোঁয়ার মধ্যে কেবল গুল খানের জুতা পড়ে রয়েছে। আর তিনি শাহাদাতের পোশাক পরে আল্লাহর কাছে চলে গেছেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। আমি চিন্তা করতে লাগলাম, প্রত্যেক প্রাণীকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। আল্লাহ তায়ালার ইরশাদ–

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ.

প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। *[আলে ইমরান ৩:১৮৫]*

কিন্তু গুল খানের মৃত্যু মূলত মৃত্যু নয় বরং নতুন জীবন। আর এই জীবন সম্পর্কেই আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ○

যারা আল্লাহ তায়ালার পথে মৃত্যুবরণ করে তাদেরকে তোমরা মৃত বলো না, বরং তারা জীবিত। কিন্তু তোমরা তা অনুধাবন করতে পারো না। *[বাকারা ২:১৫৪]*

জিহাদের আরো একটি কারামত

মোল্লা সরদার গুলখানের শাহাদাতের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, কিছু দিন আগের ঘটনা, এমনিভাবে আরো একজন মুজাহিদ সম্মিলিত ক্রুসেডারদের রাস্তায় মাইন বিছিয়ে ক্যামোফ্লাজ করছিলো। হঠাৎ সেটি বিকট শব্দে বিস্ফোরণ হয়ে ব্লাস্ট হয়ে যায়। কিন্তু সেই নওজোয়ান মুজাহিদ ১৬ ফুট উপরে উঠে জমিনে আছড়ে পরে। আল্লাহ তায়ালার শান ও দয়া দেখুন, মাইন ব্লাস্ট হওয়াতেও সেই মুজাহিদের সামান্যতম ক্ষতি হয়নি।

এখানে এটিও বলে রাখা জরুরি যে, কারামত কখনো মূর্খ এবং বেআমল লোকের উপর প্রকাশ পায় না। এই উপহার সেসব শায়খের মুরিদানের ভাগ্যে জোটে না, যারা হাতের উপর হাত রেখে মুজেজার আশা করতে থাকে। কুরআন ও হাদীসের বাণী, চৌদ্দশত বছরের ইসলামী ইতিহাস এবং খোদ আফগানিস্তানের পাথুরে পাহাড় এই বাস্তবতার সাক্ষী যে, আল্লাহ তায়ালার সেসব পুখতা ঈমানের বান্দাদের উপর কারামত প্রকাশ হয়, যারা নিজের পূর্ণ বড়ত্ব, সকল প্রচেষ্টা, সাধ্যের সবটুকু পুঁজি, এমনকি প্রিয় জানও দীনে হকের বিজয়ের জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দেন। যারা আল্লাহর উপর ভরসা করেন এবং তাঁরই কাছে সকল বিপদে সাহায্য প্রার্থনা করেন। যখন তাদের উপর এমন সময় এসে যায় যে, বাহ্যিক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেছে, সরঞ্জামাদি শেষ হয়ে গেছে, ভয়ে কলিজা শুকিয়ে গেছে এবং আল্লাহ ছাড়া কোনো আশ্রয়স্থল পাওয়া যাচ্ছে না, তখন রাব্বুল ইজ্জত গায়বি মদদ পাঠিয়ে তাঁর এই অঙ্গীকার পূর্ণ করেন–

ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَٰلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ

> অতপর আমি বাঁচিয়ে নেই আমার রাসূল এবং ঈমানদারদেরকে, এভাবেই ঈমানদারদেরকে বাঁচিয়ে নেয়া আমার দায়িত্ব। *[ইউনুস ১০:১০৩]*

এই ওয়াদারও খোলা চোখে প্রদর্শনী হয়ে যায়–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

> হে ঈমানদারেরা যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর তাহলে তিনিও তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করবেন। *[মুহাম্মাদ ৪৭:৭]*

গুল খান শহীদ রহ.

গুল খান শহীদ রহ. খুব সুন্দর মার্জিত এক নওজোয়ান। তিনি গৌর-বর্ণের স্বাস্থ্যবান সুঠাম দেহের অধিকারী। তার চেহারা সুন্নাতে নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বারা সুসজ্জিত। তার কপালে ঈমানের নূর চমকাতো। গুল খান শহীদ রহ. তালেবানের তাহরিকে ইসলামের সাথে নিয়মিত জড়িত ছিলেন না। কিন্তু ইসলামের জন্য নিবেদিত প্রাণ ও জানবাজদের এই পুণ্যভূমি আফগানিস্তানে যখন ক্রুসেডাররা তাদের থাবা বিস্তার করে এবং তাদের অভিশপ্ত এজেন্টদের নেতৃত্বকে শক্তিশালী করে কুফরি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বপ্রকার জুলুম, নির্যাতন, বর্বরতা, হিংস্রতা, মিথ্যা আর প্রতারণার সব ধরনের অস্ত্র ব্যবহার করে। শুহাদার পুণ্যভূমি আফগানিস্তানে আগুন এবং খুনের রাজ্য কায়েম করে। মজলুম মুসলমানের খুন নির্দয়ের মতো প্রবাহিত করতে থাকে, পাক-পবিত্র নারীদের ইজ্জত লুটতে থাকে, মুসলমানদের আবাদীগুলো বোম্বিং করে ধ্বংস করতে থাকে। মসজিদ, মাদরাসা এবং খানকাগুলো মিসাইলের নিশানা বানাতে থাকে। বৃদ্ধ, নারী আর বাচ্চাদের হৃদয়-বিদারক চিৎকার হাহাকারে হাশরের ময়দান কায়েম করে, তখন কুরআন মজিদের এই ফরমান উম্মতে মুসলিমাকে আহ্বান করতে থাকে–

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ۝

আর তোমাদের কী হলো যে, তোমরা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করছো না দুর্বল সেই পুরুষ, নারী ও শিশুদের পক্ষে, যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে এই জনপদ থেকে নিষ্কৃতি দান করুন, যার অধিবাসীরা জালেম। আপনার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য কোনো বন্ধু বানান এবং আপনার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য কোনো সাহায্যকারী বানান। *[নিসা ৪ : ৭৫]*

আর তখনি গুল খান দাঁড়িয়ে যান। যার সাহস অটল, যার প্রতিজ্ঞা পাহাড়সম উঁচু, যে তার স্বপ্ন এবং চিন্তা-চেতনায় নওজোয়ান, তিনি পূত পবিত্রা মা বোনদের বদলা নিতে তালেবানের কাতারে শামিল হয়ে যান। কুরআনের

আহ্বানে ময়দানে নেমে এসে, ইস্পাত কঠিন হয়ে দাঁড়িয়ে যান এবং নিজের রক্তে অজু করে আল্লাহর দরবারে হাজির হয়ে যান।

وضو ہم اپنے لہو سے کرکے خدا کے ہاں سرخرو ہیں ٹھہرے

ہم عہد اپنا نبھا چکے ہیں تم عہد اپنا بھلا نہ دینا

আমরা রক্তে অজু করে
খোদার দ্বারে হাজির
ওয়াদা পূরণ হলো এবার
তুমি রাখো নজির।

হযরত খানছা রা. এর রেওয়ায়াত
গুল খান শহীদ রহ. এর সম্মানিতা মাতার প্রতিক্রিয়া

আমাদের মেজবান মুসাকে আমরা বললাম, আমরা এখানে থাকবো না, কারণ ক্যাম্প নিকটে। হতে পারে ক্রুসেডাররা বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনে সকালে এই এলাকা তল্লাশি নিতে আসবে। তখন আমাদের সাথে সাথে আপনারও ক্ষতি হবে। তাই আমরা পাহাড়ে চলে যাই। সকালেই আপনি গুল খান শহীদ রহ. এর অবশিষ্ট অংশগুলো সেখান থেকে একত্রিত করে তার আত্মীয় স্বজনদের হাওয়ালা করে দিবেন। গুল খান শহীদ রহ. এর দাফনের পর সমবেদনা প্রকাশ করতে যখন লোক সকল তাদের ঘরে আসে তখন তার সম্মানিতা মাতা যে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেন তা হযরত খানসা রা. এর বর্ণনাকে জীবিত করে তোলে।

তিনি বলেন, আমার নওজোয়ান ছেলের শাহাদাতে আমার কোনো পেরেশানি নেই বরং তার শাহাদাতের উপর আমি গর্ব করি। আমার নিকট সান্ত্বনা দিতে যারা আসে তাদেরকে আমি বলবো, আমার কাছে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য নয় বরং মোবারকবাদ দিতে এসো। কারণ, আমার ছেলে ক্রুসেডার কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে শহীদ হয়েছে। আমি বসতির বাকি নওজোয়ানদেরকে বলবো, তারাও যেনো তাদের যৌবনকে এসব ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে জিহাদে ব্যয় করে। তিনি আরো বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ১০ বছরের মাদানী জিন্দেগির মধ্যে ৪২টি যুদ্ধ করেন। এর মধ্যে ২৭টিতে নিজে কমাণ্ড করেন এবং বাকিগুলোতে তাঁর জানবাজ সাহাবায়ে কেরামকে পাঠান। ১০ হাজারেরও বেশি সাহাবী রা. এবং তাবেয়ীন এক যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেছেন। সাহাবায়ে কেরামের দেহের টুকরো জিহাদের ময়দানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে

থেকেছে। কুরআনের প্রথম পারা থেকে ৩০ পারা পর্যন্ত জিহাদের হুকুম নাযিল হয়েছে। এখনও যদি জিহাদ বুঝে না আসে, বিভিন্ন বাহানা তৈরি করে ঘরে বসে থাকে, তাহলে তাদেরকে বলে দাও–

إِلَّا تَنفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ.

যদি তোমরা জিহাদে বের না হও তাহলে আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে কঠিন শাস্তি দিবেন এবং তোমাদের পরিবর্তে অন্য কোনো জাতি নিয়ে আসবেন। *[তাওবা ৯:৩৯]*

গুল খান শহীদ রহ. এর সম্মানিতা মাতার জ্বালাময়ী প্রতিক্রিয়া শুনে অনেক নওজোয়ান সম্মিলিত ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়।

কানাডিয়ান আর্মির কনভয়ে রেকি

গুল খান শহীদ রহ. এর শাহাদাতের পর আমরা পাহাড়ের নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাই। যেটি মূলত শিন বসতি থেকে অল্প দূরে অবস্থিত। আমরা তায়াম্মুম করে ফজর নামাজ আদায় করি। তাসবিহাত থেকে ফারেগ হয়ে আমাদের কাজের ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা শুরু করি। আজ কানাডিয়ান আর্মির কনভয় যাওয়ার তারিখ ছিলো। সকাল ৯টার দিকে আকাশে জেট বিমানের আওয়াজ শুনতে পাই, যেটি মাইন ব্লাস্ট করে দেয়। আমি আমার সামনে বিভিন্ন রকমের রিমোট কন্ট্রোল অন করে রাখি এবং বারুদের জায়গায় ছোট ছোট বাল্ব লাগিয়ে দেই। বিমানটি সামান্য বিরতিতে কিছুক্ষণ পর পর রিমোট কন্ট্রোলের ২টি বাল্ব জ্বালিয়ে দেয়। অর্থাৎ যদি এই রিমোট কন্ট্রোল হামলার জন্য ব্যবহার করা হয় তাহলে বিমান তাকে নিজে নিজেই কোড দিয়ে অন করে বিদ্যুৎ সংযোগ করে দেবে। ফলে মাইন ব্লাস্ট হয়ে যাবে। কিন্তু তৃতীয় রিমোট কন্ট্রোলের সাথে লাগানো বাল্বটি জ্বলেনি। আমি এ ধরনের আরো কিছু রিমোট লাগিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করি। কিন্তু সেগুলোর কোনো রিমোট কন্ট্রোলেরই বাল্ব জ্বলেনি। এভাবে আমি বিমানের মাধ্যমে নিজে নিজেই মাইন ব্লাস্ট হওয়ার রহস্য উদঘাটনে কামিয়াব হই। বিমানটি দেড় ঘণ্টা আকাশে চক্কর লাগানোর পর চলে যায়। আমি রিমোট কন্ট্রোল উঠিয়ে সেগুলো থেকে ব্যাটারি সেল এবং বাল্ব পৃথক করে সবগুলোকে নিরাপদে রেখে দেই। সাড়ে দশটার দিকে আমি আমার ওয়ারলেস সেট অন করে রেখেছিলাম। শায়খ উসমান এবং মোল্লা সরদার আমার সাথে ছিলেন। আমরা রাস্তার পাশে অবস্থিত এক পাহাড়ের উপর খোলা ময়দানে দাঁড়িয়ে ছিলাম। তখন কানাডিয়ান আর্মির কনভয় যাওয়ার সময় নিকটবর্তী ছিলো।

আমি আমার ওয়ারলেস সেটে বিশেষ ধরনের একটি হালকা হালকা টোন শুনতে পাই। অল্পক্ষণের মধ্যে টোনের আওয়াজ বাড়তে থাকে। তারপরই আমরা দূর থেকে কাফেলার মাটি ওড়া এবং গাড়ি আসতে দেখি। আমি শায়খ উসমানকে বললাম, যখন কনভয় স্পষ্ট দেখা যেতে থাকবে তখন আপনি হ্যান্ডিক্যাম ক্যামেরা দিয়ে ভিডিও করতে শুরু করবেন। শায়খ উসমান হ্যান্ডিক্যাম প্রস্তুত করে নেন এবং একটু আড়ালে এমনভাবে পজিশন নিয়ে বসে যান, যেখান থেকে কানাডিয়ান আর্মির কনভয় স্পষ্ট দেখে ভিডিও করতে পারেন।

আমি গম্বুজ বসতিতে মহব্বত খানের সাথে ওয়ারলেসে কথা বলতে শুরু করি, যাতে বুঝতে পারি, ওয়ারলেস সেট জ্যাম হয় কি না? যদি হয়, তাহলে এর কারণ কী? কানাডিয়ান আর্মির কনভয় এখনো আমাদের থেকে এক থেকে দেড় হাজার মিটার দূরে ছিলো, আমার ওয়ারলেস সেট একদমই জ্যাম হয়ে যায়। আমাদের ওয়ারলেস সেটে এক ধরনের বিশেষ টোন বাজতে থাকে। মহব্বত খানের সাথে আমার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। যখন কাফেলা আমাদের থেকে ১৫০০ মিটার সামনে চলে যায় তখন আমাদের ওয়ারলেস সেট আবার কাজ করতে শুরু করে। কিন্তু সেট থেকে বিশেষ ধরনের টোন আসতে থাকে। যখন কাফেলা আমাদের থেকে ৩০০০ মিটার দূরে চলে যায় তখন সেই টোনও বন্ধ হয়ে যায়। আমরা এর পরীক্ষা নীরিক্ষায় ব্যস্ত হয়ে গেলাম। যোহর নামাজের পর তিনটার দিকে ওয়ারলেস সেটে বিভিন্ন ধরনের টোন বাজতে থাকে এবং অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই আকাশে জেট বিমানের আওয়াজ শোনা যায়। আমার ওয়ারলেস সেট থেকে যে টোন আসছিলো সেটি এই জেট বিমানই ছাড়ছিলো, যাতে কোনো রিমোট কন্ট্রোল মাইন বিছানো থাকলে তা ফেটে যায়। বিকেল ৪টার দিকে আবারো কাফেলা এই রাস্তা দিয়ে যাওয়ার কথা। যেটি কানাডিয়ান আর্মির ক্যাম্প গম্বুজ বসতি থেকে কান্দাহার এয়ারপোর্ট যাওয়া কথা। আমরা এই কাফেলারও রেকি করি। শায়খ উসমান ভিডিও করেন। এই কনভয়ের অবস্থাও সকালের কনভয়ের মতোই ছিলো। বিমানের ব্যাপারে জানা গেলো প্রতিদিন সকালে ৯টা থেকে সাড়ে ১০টা পর্যন্ত দেড় ঘণ্টা এবং বিকেলে ৩টা থেকে ৪টা পর্যন্ত এক ঘণ্টা আকাশে চক্কর দেয়। কনভয় রেকি করার পর আমরা শিন বসতিতে ফিরে আসি। আমি এবং শায়খ উসমান ভিডিও দেখে কনভয় সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা নিতে থাকি। কারণ, কানাডিয়ান আর্মির কনভয় ৪দিন পর পুনরায় যাওয়ার কথা। সেটাই আমাদের টার্গেট ছিলো। তাই সেটিকে নিশানা বানানোর জন্য প্রস্তুতি নেয়া আবশ্যক ছিলো।

তালেবানের প্রচেষ্টা

যখন থেকে ইসলাম আফগানিস্তানে পৌঁছেছে তখন থেকে আফগানিস্তানকে আল্লাহ তায়ালা কুফফারদের জন্য কবরস্থান বানিয়ে আসছেন। যে কুফরই আফগানিস্তানে থাবা বিস্তার করতে চেয়েছে সে-ই আফগানিস্তানে অপদস্ত এবং লাঞ্ছিত হয়েছে। নিকট অতীতের বৃটেন এবং রুশ, যারা তাদের সময়ে সুপার পাওয়ার ছিলো, তারা আফগানিস্তানের পাথুরে পাহাড়ে মাথা ঠুকে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। আর এখন তৃতীয় শক্তি আমেরিকা তার সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে পরাজিত হওয়ার দ্বারপ্রান্তে। যাদের বিরুদ্ধে তালেবানরা পূর্ণভাবে যুদ্ধ করে যাচ্ছে। যখন তালেবানরা আমেরিকা এবং তার সাঙ্গপাঙ্গদের বিরুদ্ধে রিমোট কন্ট্রোল আক্রমণ শুরু করে তখন সম্মিলিত ক্রুসেডার বাহিনী সহজ সরল তালেবানের বিরুদ্ধে নিজেদের স্বাভাবিক নির্লজ্জতা প্রকাশ করতে থাকে। তারা অত্যাধুনিক টেকনোলজির ব্যবহার করে। আমেরিকা এমন জেট বিমান নিয়ে আসে যা রিমোট কন্ট্রোলকে ওয়ারলেসের পূর্ণ ফ্রিকোয়েন্সি ১৩৬.০০০ মেগাহার্জ থেকে নিয়ে ১৭৪.০০০ মেগাহার্জ পর্যন্ত এবং শূন্য থেকে নিয়ে ৯ পর্যন্ত পূর্ণ ১০ ব্লাস্টিং কোড দেয়। আর রিমোট কন্ট্রোলের ফ্রিকোয়েন্সিও ১৩৬.০০০ মেগাহার্জ থেকে নিয়ে ১৭৪.০০০ মেগাহার্জ পর্যন্ত সিরিয়ালের মধ্যেই হয়। অর্থাৎ রিমোটের যে কোনো ফ্রিকোয়েন্সি কোড হোক, বিমান সেটিকে ব্লাস্ট করে দেয়। আর এই জেট বিমান অত্যন্ত উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ফ্রিকোয়েন্সির (Very high frequency, VHF) রেস ছাড়ে, যা আফগানিস্তানের যে কোনো জায়গার রিমোট ধরতে পারে। অর্থাৎ বিমানের শক্তিশালি ভিএইচ এফ রেস (VHF Rase) গোটা আফগানিস্তানে প্রভাব ফেলে। আমি আমার আগের রেকির আলোকে এর সহজ সমাধান এটি বের করলাম যে, আপনি ওই রিমোট ব্যবহার করবেন যেটি বিমান ব্লাস্ট করতে পারে না। অথবা এমন রিমোট ব্যবহার করবেন যেটির কোড দেয়ার টাইম ৬ সেকেন্ড অথবা তার চেয়ে বেশি হবে। আর যদি এমন রিমোট ব্যবহার করেন, যেটিকে বিমানের কোড দেয়ার দ্বারা ব্লাস্ট হয়ে যায় তাহলে সেটি নিরাপদ রাখার পদ্ধতি হলো, বিমান আসার সময় আপনার রিমোটটিকে আপনার ওয়ারলেস সেট দিয়ে রিমোট. কন্ট্রোলের ফ্রিকোয়েন্সি ডায়াল করে পি.টি.টি. চেপে দিবেন এবং যতক্ষণ পর্যন্ত বিমান আকাশে উড়তে থাকবে পি.টি.টি. চেপে ধরে রাখবেন। আপনার এবং আপনার স্থাপন করা রিমোটের দূরুত্ব ৫০০ মিটার থেকে বেশি হতে পারবে না। এতে বিমানের মাধ্যমে রিমোট কন্ট্রোল ব্লাস্ট না করার সুযোগ বেড়ে যাবে। আর যদি আপনি মাঝখানে ভুল ব্লাস্টিং কোড দেন তাহলে বিমান আপনার রিমোট কন্ট্রোল মাইন একদমই ব্লাস্ট

করতে পারবে না। কানাডিয়ান আর্মির কনভয় যাওয়ার সময় ওয়ারলেস সেট জ্যাম হয়ে যাওয়া একটি বাস্তব সত্য। এর কারণ হলো, কানাডিয়ান আর্মি তাদের কনভয়ে ২টি এমন গাড়ি রেখেছে যাতে নতুন এক ধরনের ক্যামেরা এবং ট্রান্সমিটার স্থাপন করেছে। ভিডিও ক্যামেরা দিয়ে কনভয় যাতায়াতের ভিডিও করে এবং তা গাড়ির ভিতরে স্থাপন করা স্ক্রিনে দৃশ্যমান হয়। গাড়িতে স্থাপন করা ট্রান্সমিটার খুবই পাওয়ারফুল VHF ফ্রিকোয়েন্সি Rase ছাড়তে থাকে, যেটি তার থেকে কম শক্তিশালী VHF ফ্রিকোয়েন্সি Raseকে ৫০০ মিটারের ভিতরে ঢুকতে দেয় না। তার একমাত্র সমাধান আপনার নিকট এমন ট্রান্সমিটার থাকতে হবে যা গাড়িতে স্থাপন করা VHF ট্রান্সমিটার থেকে শক্তিশালী ফ্রিকোয়েন্সি Rase দিবে। এর দ্বারা আপনি আপনার রিমোট কন্ট্রোল মাইন ব্লাস্ট করতে পারবেন। চতুর্থ যে বিষয়টি আমরা নোট করেছি সেটি হলো, যখন কাফেলা আপনার থেকে ৪-৫ কিলোমিটার দূরে হবে তখন আপনার ওয়ারলেস সেটে বিশেষ ধরনের টোন বাজতে থাকবে। যখন ওয়ারলেস সেট এ ধরনের টোন দিতে শুরু করবে তখন থেকে ১৫-২০ মিনিটের মধ্যে কাফেলা আপনার নিকট এসে যাবে। এই টোন থেকে আপনি কাফেলার সংবাদের কাজ নিতে পারবেন। যখন এই টোন আসতে থাকে তখন আপনাকে বুঝতে হবে, কাফেলা আমাদের থেকে ৪-৫ কিলোমিটার দূরে আছে।

সাবউন খান এবং দেশি মুরগি

আমি কাফেলার রেকি এবং তৈরি করা ভিডিও দেখে সে অনুযায়ী ব্যবস্থাপনা করছিলাম। তখন কারী ফয়জুল্লাহ সাহেবের নায়েব মোল্লা আব্দুস সালাম ওয়ারলেসে যোগাযোগ করে বললেন, আমি যেনো শায়খ উসমান ও আব্দুর রহমানকে কারী সাহেবের কাছে পাঠিয়ে দেই এবং খলিফা ভাইকে নিয়ে কানাডিয়ান আর্মির বিরুদ্ধে হামলা চালু রাখি। সংবাদ পাওয়ার পর আমি তৎক্ষণাৎ গম্বুজ বসতিতে যেতে প্রস্তুতি নেই। মোল্লা সরদারকেও তা জানিয়ে দেই। মোল্লা সরদার বললেন, যোহরের পর রওয়ানা দিন, আমি আপনাকে সারখিল বসতিতে সাবউন খানের ঘরে পৌঁছে দেবো। সে আপনাকে গম্বুজ বসতিতে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করবে। আমি দেখলাম পরিকল্পনা হয়ে গেছে এবং রওয়ানা এখনো অনেক সময় বাকি, তাই আমি মুসা খানের কাছে কাপড় পরিবর্তন করার ইচ্ছা প্রকাশ করলাম। কারণ, গত কয়েক দিনের পালিয়ে বেড়ানোর কারণে গোসল এবং কাপড় পরিবর্তনের সুযোগ পাচ্ছিলাম না। গোসল করে কাপড় পরিবর্তন করার কিছুক্ষণ পরই যোহরের সময় হয়ে যায়।

যোহর নামাজ মুসা খানের মেহমানখানাতেই আদায় করি। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সাথে নিয়ে সারখিল বসতির দিকে রওয়ানা হয়ে যাই। দুর্গম পথে দেড় ঘন্টা মোটর সাইকেলে চলার পর আমরা সারখিলের বসতি দেখতে পাই। যখন আমরা বসতিতে প্রবেশ করছিলাম তখন সামনের মসজিদের মিনার হতে আল্লাহ তায়ালার বড়ত্ব ঘোষণা হচ্ছিলো। মোল্লা সরদার আমাকে বসতির শুরুতেই একটি বড় এবং হাবেলির মতো বাড়ির সামনে মোটর সাইকেল থামাতে ইশারা করেন। আমি মোটর সাইকেল থামাই। মোল্লা সরদার বাড়ির বাইরে খেলাধুলায় রত বাচ্চাদেরকে আওয়াজ দিলেন। ২/৩টি বাচ্চা দৌড়ে আসে। মোল্লা সরদার তাদেরকে সাবউন খানের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে বাচ্চারা বলল, হ্যাঁ সাবউন খান ঘরে আছেন। একটি ছেলে সাবউন খানকে ডাকতে ঘরে চলে গেলো। দ্বিতীয় ছেলেটি আমাদেরকে একটু দূরে বাগানে বানানো মেহমানখানায় নিয়ে যায়। আমরা মোটর সাইকেল বাগানের বাইরে রেখে মেহমানখানায় চলে যাই।

এরই মধ্যে পাগড়ি পরিহিত হালকা পাতলা গড়নের এক নওজোয়ান আসে। যার চেহারা সুন্নাতে নববীতে সজ্জিত এবং কপাল ঈমানের নূরে চমকাচ্ছে। সে সালাম দিয়ে বসে যায় এবং মোল্লা সরদারের সাথে কথা বলতে থাকে। মোল্লা সরদার তার সাথে আমার পরিচয় করতে গিয়ে বলেন, সে সাবউন খান। সে এই এলাকায় তালেবানের বিশেষ লোক এবং পুরাতন মুজাহিদ। যখন মোল্লা সরদার বললেন, সে পুরাতন মুজাহিদ, তখন আমার মনে সন্দেহ হলো, এই নওজোয়ান তালেবান সাবউন খানের সাথে আগে কোথাও আমার দেখা হয়েছে। এরই মধ্যে চা এসে যায়। আফগানি রেওয়াজ অনুযায়ী মেজবান কালো এবং সবুজ রঙ্গের চা বানিয়েছিলো। আমি, মোল্লা সরদার এবং সাবউন খান মিলে চা পান করি। চা পান করার পর মোল্লা সরদার অনুমতি নিয়ে শিন বসতির দিকে রওয়ানা হয়ে যায়। মোল্লা সরদার রওয়ানা হওয়ার পর সাবউন খান আমার সাথে কথা বলেন এবং অবস্থা জানতে চান। আমি সংক্ষেপে জবাব দেই।

দীর্ঘ চিন্তা ভাবনার পর সাবউন খানকে একটি প্রশ্ন করি। আপনি কি কখনো রণাঙ্গনে ছিলেন? প্রশ্ন শুনে সাবউন খান উদ্বেলিত হয়ে ওঠে এবং খুবই আবেগের সাথে বলে, অবশ্যই। তিনি আরো বললেন, আমি ১৯৯৬ সালে কিউবার বন্দী কমান্ডার মোল্লা মুহিব্বুল্লাহ আখুন্দযাদার সাথে কাবুল, চারিকার এবং জাবালুস সিরাজের রণাঙ্গনগুলোতে ছিলাম। আমি বললাম, চারিকার যুদ্ধে আমি মোল্লা মুহিব্বুল্লাহ আখুন্দযাদাহ এর কমাণ্ডে উত্তর দিকের বাহিনীতে সরাসরি অংশগ্রহণ করি। সাবউন খানের মনে পড়লো, আসলে আমরা দু'জনই

চারিকার যুদ্ধে একত্রে সময় কাটিয়েছি। দশ বছর পর পুনরায় আমাদের সাক্ষাৎ হলো। আমি আমার পুরাতন বন্ধু মুজাহিদ খুঁজে পেয়ে খুব খুশি হলাম। যে শুধু বলার গাজি নয় বরং কার্যকর গাজি। এ কথা চিন্তা করে তো আনন্দ আরো বেড়ে গেছে যে, আজ সুন্দর দিনগুলোর মধুর স্মৃতিকে তরতাজা করার উমদা সুযোগ হাতে এসেছে। ততক্ষণে আসর নামাজের সময় হয়ে গেছে। সাবউন খান আসরের নামাজ মসজিদে আদায় করে আর আমি মেহমানখানায় আদায় করি। আসরের পর সাবউন খান ফিরে এলে আমি তার বাগানে ঘোরাফেরা করতে চলে আসি। সাবউন খানের বাগান প্রায় দুই একর জায়গা জুড়ে বিস্তৃত। বাগানের সবকটি গাছই আঙ্গিরের এবং গাছগুলো সারিবদ্ধভাবে লাগানো। বাগানে পানি দেয়ার জন্য ছোট বড় ড্রেন করা ছিলো। কূপ থেকে বাগানে পানি দেয়া হতো। আঙ্গিরের গাছগুলো দেখে বাগানের পরিচর্যাকারীদের উপর ঈর্ষা হচ্ছিলো। কারণ, সবগুলো গাছ তরতাজা, হৃষ্টপুষ্ট এবং ফলের ভারে নুয়ে ছিলো।

আমরা মাগরিবের নামাজ বাগানেই আদায় করি। নামাজের পর যখন মেহমানখানায় ফিরে আসি তখন ৩ জন নওজোয়ান সাবউন খানের অপেক্ষায় ছিলো। সাবউন খান তাদের সাথে খুব হাস্যোজ্জ্বল বদনে সাক্ষাৎ করে এবং খুব সম্মানের সাথে বসায়। তারা আব্দুল্লাহ, আব্দুর রহমান এবং মোল্লা মুহাম্মাদ কাসেম ছিলো। আমিও তাদের সাথে মুসাফাহা করি। ততক্ষণে সাবউন খানের কম বয়সী ছেলে ঘর থেকে খাবার নিয়ে আসে। খাবারের মধ্যে খুবই সুস্বাদু দেশি মুরগির ভুনা ছিলো। খানার মাঝখানে আমার জাবালুস সিরাজে পাকানো মুরগির কথা মনে পড়ে যায়। ১৯৯৬ সালে বসন্তকালের প্রথম মাস চলে গিয়েছিলো। চার দিকে সবুজের ছড়াছড়ি। চারিকার উপত্যাকাগুলো সবুজ এবং ফুলের পোশাক পরিহিত। পরিবেশ খুবই মনোরম ও বন্ধুত্বপূর্ণ। সে মৌসুমেই আমাদের কমান্ডার মোল্লা মুহিব্বুল্লাহ আখুন্দযাদাহ আমাদেরকে দাওয়াত করেন। যেখানে সাবউন খান, শহীদ নায়েবে কমান্ডার মারজান তানভীর, আব্দুর রহমান শহীদ, আব্দুল্লাহ শহীদ, বেলাল শহীদ এবং আব্দুল বাসির শহীদ রহ. দাওয়াত পেয়েছিলেন। সেখানে দেশি মুরগি পাকানোর দায়িত্ব সাবউন খানের উপর ছিলো।

জাবালুস সিরাজের পানির বৈশিষ্ট হলো, তাতে গোশত সহজে সিদ্ধ হতো না। সেখানে গোশত পাকানো সহজ কাজ নয়। এ জন্য সাবউন খান গোশতগুলো একটি ইরানি প্রেসার কুকারে ঢেলে চুলাতে বসিয়ে দেয়। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে প্রেসার কুকার থেকে শিশ আসতে শুরু করে। আর আমরা সকলে আরামে

উপরের কামরায় চলে যাই। কিছুক্ষণের মধ্যে সাবউন খানও উপরে চলে আসেন। প্রেসার কুকারের শিশের আওয়াজ উপরেও আসতে থাকে। ততক্ষণে মাগরিবের নামাজের সময় হয়েছে। আমরা সবাই মোল্লা মুহিব্বুল্লাহ আখুন্দযাদার ইমামতিতে নামাজ পড়তে চলে যাই। আমার যখন নামাজ পড়ছিলাম, তখন প্রেসার কুকারের শিশের আওয়াজ বন্ধ হয়ে যায়। নামাজের পর আমি প্রেসার কুকার দেখে আসছি এ কথা বলে সাবউন খান উপরের কামরা থেকে নিচের কামরায় চলে যান। সাবউন খান যখনই পাক ঘরে প্রবেশ করে তখনই প্রেসার কুকার বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হয় এবং টুকরো টুকরো হয়ে যায়। প্রেসার কুকারের ঢাকনা পাক ঘরের ছাদ ফেড়ে বাহিরে চলে আসে এবং সেটি কোথায় গিয়ে পড়ে তার কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। আমরা যখন বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনে পাক ঘরের দিকে দৌড়ে যাই এবং পাক ঘরে প্রবেশ করি তখন সামনে দাঁড়ানো সাবউন খানের অবস্থা দেখে হাসি থামছিলো না। বিস্ফোরণে ওড়া মাটি এবং কয়লা সাবউন খানের চোখে মুখে লেপ্টে ছিলো। গরম গরম দেশি মুরগি এবং পানি পড়ার কারণে সাবউন খান লাফাচ্ছিলেন এবং চিৎকার করছিলেন। এতে সাবউন খানের আকৃতি বিকৃত হয়ে যায় এবং হাসির পাত্রে রূপ নেয়। আমি দ্রুত সাবউন খানের উপর পানি ঢালি এবং তার মুখ পরিষ্কার করি। যখন এই ঘটনা সাবউন খানের মেহমানখানায় দেশি মুরগি খেতে খেতে শুনাই তখন উপস্থিত মজলিস জাফরানের বাগান হয়ে যায়। ১০ বছর পর সাবউন খান এই ঘটনা মনে করে খুব খুশি হন। আমি সারা রাত ১০ বছর আগের বন্ধুর সাথে গল্প করি এবং ১০ বছর আগে ঘটে যাওয়া সুন্দর সময়গুলোর মধুময় ঘটনাবলি তাজা করি। যা আজও তাজা আছে।

মহব্বত খানের মহব্বত

সেদিন সাবউন খানের মেহমানখানাতেই রাত কাটাই। সকালে ফজর নামাজ আদায়ের পর আফগানি রেওয়াজ অনুযায়ী ঘর থেকে গরম নাশতা তৈরি হয়ে আসে। আমি নাশতা করি এবং সাবউন খান আমার জন্য গম্বুজ বসতিতে যাওয়ার ব্যবস্থাপনা করে ফেলেন। তারপর সে আমাকে তার এক বিশেষ লোকের সাথে গম্বুজ বসতির দিকে রওয়ানা করে দেন। আমি আমার প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, ক্যামেরা, ভিডিও, কালাশনিকভ ইত্যাদি আমার সাথে নিয়ে মোটর সাইকেলে ওই ব্যক্তির সাথে রওয়ানা হয়ে যাই। দেড় ঘণ্টা পর্যন্ত পানির নালাতে মোটর সাইকেল চালানোর পর গম্বুজ বসতির উপকণ্ঠে পৌঁছি। মোটর

সাইকেলওয়ালা আমাকে গম্বুজ বসতির বাহিরেই মহব্বত খানের ঘরের সামনে নামায় এবং ঘর চিনিয়ে দিয়ে সে ফিরতি পথে রওয়ানা হয়ে যায়।

আমি এক বাচ্চাকে পাঠিয়ে মহব্বত খানকে ডাকি। মহব্বত খান বাহিরে এসে আমাকে দেখে খুব খুশি হন, আবার এভাবে আচানক এসে যাওয়াতে পেরেশানও হন। সালাম, মুসাফাহার পর আমি মহব্বত খানকে অভয় দেই যে, পেরেশানির কোনো কারণ নেই। আমি এবং খলিফা ভাই এখানে থেকে আক্রমণ পরিচালনা করার জন্য এসেছি।

আমি মহব্বত খানের নিকট খলিফা ভাইয়ের ব্যাপারে জানতে চাইলাম। তিনি বললেন, খলিফা ভাই অন্যখানে বাগানে অবস্থান করছেন। আমরা দু'জন পায়ে হেঁটেই বাগানের দিকে রওয়ানা হই। মহব্বত খানের বাগান তার ঘর থেকে সামান্য দূরে অবস্থিত। এই বাগান ৪ একর জায়গা নিয়ে বিস্তৃত। এতে বিভিন্ন ধরনের ফল ও ফুলদার গাছ আছে। যেগুলোর মধ্যে আঞ্জির এবং আনার গাছ ফলের ভারে ঝুঁকে আছে। দিনভর ব্যবসায়ীরা মহব্বত খান থেকে ফল ক্রয় করার জন্য আসতে থাকে। মহব্বত খান তার বাগানে ঝর্ণা থেকে পানি সেচ করেন। বাগানের মাঝখানে কুদরতিভাবে তৈরি একটি টিলা ছিলো। এর উপরেই মহব্বত খান তার কামরা বানিয়েছেন। সেখান থেকে গোটা বাগানের উপরিভাগের দৃশ্য স্পষ্ট দেখা যায়। মানুষের আনাগোনাও এদিকে একদমই নেই। খলিফা ভাই সেই কামরাতেই অবস্থান করছিলেন। আমি এবং মহব্বত খান যখন আচানক খলিফা ভাইয়ের কাছে পৌঁছি তখন তিনি খুব খুশি হন। তিনি গত কাল থেকেই আমার অপেক্ষায় ছিলেন। কারণ, আমি আগেই খলিফা ভাইকে এদিকে আসার সংবাদ দিয়েছিলাম। আমি খলিফা ভাইকে জিজ্ঞেস করলাম, এখন কোথায় থাকতে চান? তিনি উত্তর দেয়ার আগেই মহব্বত খান খুবই মহব্বতের সাথে আমাদেরকে এখানে এই বাগানেই থাকতে অনুরোধ করলেন। তিনি বলেন, আপনারা যখনই এই এলাকাতে থাকবেন, আমার এখানেই থাকবেন। এই জায়গাটি আবাদি থেকে দূরে। তাছাড়া এখানে বাগান ওয়ালাদেরও কেউ আসে না। যদি কোনো বিপদও হয় তাহলে এখানে কাছাকাছি ছোট ছোট পাহাড়ি টিলা আছে। আপনারা সহজে এবং নিরাপদেই এখান থেকে বের হয়ে যেতে পারবেন। খলিফা ভাইও তার এই কথাকে সমর্থন করে বললেন, তাছাড়া মহব্বত খান চতুর লোক। প্রয়োজনের সময় সবকিছুই সহজে ব্যবস্থা করে দেন। এখানে থাকাই উপযুক্ত। আমিও মহব্বত খানের মহব্বত দেখে এখানে থাকার সিদ্ধান্ত নেই। আমরা যতদিন এদিকে থাকি মহব্বত খান আফাগানি খাবার এবং তাজা ফল দিয়ে তার মহব্বত প্রকাশ

করতে থাকেন। মহব্বত খান নিজেও একজন মুজাহিদ। মুজহিদীনের সহযোগিতা এবং খেদমতকে সৌভাগ্য মনে করেন। তাই আমি মহব্বত খানকে দিল থেকে মহব্বত করি। আমরা সারাদিন কানাডিয়ান আর্মির ক্যাম্প রেকি করি এবং রাতে মহব্বত খানের এই বাগানে কামরার পাশে বড় পাথরের উপর খোলা আকাশের নিচে আরামে ঘুমাই। সবশেষে আমরা এমন ব্যবস্থাপানায় কামিয়াব হই, যার সামনে সম্মিলিত ক্রুসেডারদের অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যর্থ হয়ে যায় এবং আমরা কানাডিয়ান আর্মির কনভয়ের উপর সফল আক্রমণ পরিচালনা করতে সক্ষম হই। আমরা দুই ফুট লম্বা, চার ইঞ্চি চওড়া এবং এক ইঞ্চি মোটা একটি কাঠ নেই। যার উপরিভাগ দেখতে প্রায় ইংরেজি 'ইউ' অক্ষরের মতো। তাতে লোহার পাত লাগাই এবং তার মাঝখানে একদম সোজা একটি ছোট পাত লাগাই। দু'টি পাতেই পৃথক পৃথক তার সংযোজন করি এবং সেটিকে প্লাস্টিকের সিট দিয়ে ভালোভাবে প্যাকেট করি। যাতে উভয় পাতের মাঝখানে মাটি ইত্যাদি ঢুকতে না পারে। কারণ, দুটি পাতের মাঝখানে মাটি ঢুকে গেলে বিদ্যুৎ সাপ্লাই হবে না।

নতুন আবিস্কার

আমাদের এই নতুন আবিস্কার ইহুদী-নাসারাদের অত্যাধুনিক প্রযুক্তিকে ব্যর্থ করে তাদের অহংকার মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়। আমি যখন মহব্বত খানের নিকট পৌছি তখন সকাল আটটা বেজেছিলো। সকাল দশটা পর্যন্ত মহব্বত খান আমাদের সাথে ছিলেন। তারপর তিনি এক বিশেষ কাজে অনুমতি নিয়ে চলে যান। আমি আমার সঙ্গী খলিফা ভাইয়ের সাথে মিলে কানাডিয়ান আর্মির বিরুদ্ধে সফল আক্রমণ পরিচালানার কর্মপদ্ধতি নিয়ে গবেষণা করতে থাকি। কারণ, এখানে স্থানীয় তালেবান নেতৃবৃন্দ আমাদের দু'জনকেই কানাডিয়ান আর্মির বিরুদ্ধে সফল আক্রমণ পরিচালানা করার জন্য বিশেষ তাগিদ দিচ্ছিলেন। তাছাড়া তখন কানাডিয়ান আর্মির বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করা এমনিতেই খুব জরুরি ছিলো। কারণ, গত ছয়মাস যাবত তাদের বিরুদ্ধে কোনো কার্যকর আক্রমণ পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছিলো না। যারফলে তাদের সাহস খুব বেড়ে গিয়েছিলো।

এখনো কানাডিয়ান আর্মির ক্যাম্পে নিযুক্ত সৈন্যদের পরিবর্তন হতে দুইদিন বাকি আছে। এই দুইদিনের মধ্যেই আমাদের প্রস্তুতি সম্পন্ন করা প্রয়োজন। খলিফা ভাই আক্রমণের জন্য মাইন ইত্যাদি আগে থেকেই সাথে নিয়েছিলেন। কানাডিয়ান আর্মির কনভয়, জেট বিমান থেকে নেয়া ধারণা এবং সে সম্পর্কে

নেয়া প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলো আমি খলিফা ভাইকে জানাই। বেশ কিছুক্ষণ চিন্তা ভাবনা করার পর এবং নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে আমরা এমন এক পদ্ধতি অবলম্বন করে কামিয়াব হয়ে যাই যার সামনে সম্মিলিত ক্রুসেডার বাহিনীর অত্যাধুনিক টেকনোলজি ব্যর্থ হয়। সেই পদ্ধতি ব্যবহার করে আমরা কানাডিয়ান আর্মির কনভয়ের উপর সফল আক্রমণ পরিচালনা করি।

নামকরণের কারণ

আমরা নতুন আবিস্কার করা যন্ত্রটির নাম রেখেছি খাঞ্জা। পশতু ভাষায় খাঞ্জা প্রত্যেক ওই জিনিসকে বলে যাতে চাপ দেয়ার পর কাজ করে। অর্থাৎ ভিতরে ঢুকে কাজ করে। যেমন ওয়ারলেস সেট। কলিং বাটন চাপলেই ওয়ারলেস সেট নেটওয়ার্ক খোঁজার কাজ শুরু করে দেয়। এ জন্য এর নাম খাঞ্জা অর্থাৎ দেবে যাওয়া বা ডুবে যাওয়া রাখা হয়েছে।

প্রয়োগ

আমাদের আবিষ্কার করা এই প্রযুক্তির প্রয়োগ সেটি আবিষ্কার করার মতই একদম সহজ। ডিটাভিনেটরের তারগুলো থেকে একটি তার সরাসরি ব্যাটারি সেলের সাথে সংযুক্ত করে দেই এবং অন্যান্য তারগুলো খাঞ্জার ছোট ব্যাটারির সাথে লাগিয়ে দেই। তারপর ইংরেজি 'ইউ' আকৃতির খাঞ্জার পাত থেকে বের হওয়া তার ব্যাটারির সাথে সংযুক্ত করে দেই। এবার এটি অপারেশনের জন্য প্রস্তুত।

মাইন বিছানো

ক্যাম্পে নিযুক্ত কানাডিয়ান আর্মিদের পরিবর্তন হতে আরো দুইদিন বাকি। আমরা খাঞ্জা আবিষ্কারের পর কানাডিয়ান আর্মির রাস্তায় মাইন বিছানোর কাজ শুরু করে দেই। গম্বুজ বসতি থেকে সারখিল যাওয়ার রাস্তায় কানাডিয়ান আর্মির কনভয়ের যাতায়াত সাধারণত কম ছিলো। কিন্তু আমরা এই সামান্য সম্ভাবনাকেও ফেলে দেইনি এবং সারখিল টু গম্বুজ রোডেও মাইন বিছাই। রোড খুব খোলামেলা ছিলো। আমরা কোথাও মাইন বিছানোর মতো জায়গা পাচ্ছিলাম না। এর সমাধান এভাবে বের করলাম যে, যেখানে রোড একটি পানির নালা দিয়ে যায় সেই জায়গাটি অন্য জায়গার তুলনায় একটু সংকীর্ণ ছিলো। সেখানে আমরা জিগজাগ আকৃতিতে তিনটি মাইন বিছাই। যেগুলোতে স্পর্শ করা ছাড়

কনভয়ের যাতায়াত মুশকিল ছিলো। তার সাথে আমাদের ব্লাস্টিং সিস্টেম ফিট করার জন্য গর্ত করি। যাতে কানাডিয়ান আর্মির কনভয় এসে গেলে খুব দ্রুতই তা ব্লাস্ট করার জন্য প্রস্তুত করা যায়।

তাছাড়া আমরা আরো একটি মাইন গম্বুজ টু শিন রোডে বিছাই। তার সাথে আমাদের আবিষ্কৃত খাপ্পা ফিট করার জন্য রাস্তার উভয় পাশে গর্ত করি। যাতে এই রাস্তায় কানাডিয়ান আর্মির কাফেলা যে কোনো এক দিক থেকে এসে গেলে আমাদের বিছানো মাইন সর্ব অবস্থায় ট্রাক, লোহার কপাটবদ্ধ গাড়ি, ট্যাংক অথবা যে কোনো ধরনের গাড়ি কাফেলার সামনে থাকবে তার নিচে বরাবর মাঝখানে ব্লাস্ট হয়। এতে দুশমনের গাড়ি বডিসহ উড়ে যায়। গম্বুজ টু শিন রোডে কানাডিয়ান আর্মির কনভয় খুব বেশি যাতায়াত করতো। যেখানে আমরা মাইন লাগিয়েছি সেই জায়গাটিও সংকীর্ণ ছিলো। তাই কাফেলা যদি গম্বুজ থেকে কান্দাহার যেতে এই রাস্তা ব্যবহার করে তাহলেও তা এর শিকারে পরিণত হবে। তেমনিভাবে কান্দাহার থেকে আসতেও যদি এই রাস্তা ব্যবহার করে তাহলেও কাফেলা এই মাইনের শিকারে পরিণত হবে ইনশাআল্লাহ। আমরা আমাদের বিছানো মাইনের ব্যাটারি ক্লিপ্স একটি গর্তে রেখে প্লাস্টিক সিট দিয়ে ঢেকে দেই। যাতে যখনই কানাডিয়ান আর্মির কাফেলা আসবে আমরা আগে থেকে খোদাই করে রাখা গর্তে খাপ্পা ফিট করে এই ব্যাটারি ক্লিপ্সের সাথে জুড়ে তার সিস্টেম ঠিক করে দিতে পারি। যখনই কানাডিয়ান আর্মির গাড়ি এর সাথে লাগবে তখনই তার সাথে সংযুক্ত মাইন বিকট শব্দে ব্লাস্ট হয়ে যাবে।

দেখার মতো আক্রমণ

এমন দৃষ্টান্তমূলক আক্রমণে ইহুদী নাসারাদের নাকে যে লাগাম পড়ে তা দেখার মতো এবং দেখানোর মতো। আমরা মাইন বিছিয়ে ফিরে আসতে রাত একটা বেজেছিল। আমি এবং খলিফা ভাই সারাদিনের ক্লান্তিকর মেহনতের কারণে শুইতেই ঘুমের জগতে হারিয়ে যাই। সকালে যখন জাগ্রত হই তখন মুয়াজ্জিনের মন কাড়া আওয়াজে আযানের শব্দগুলো পরিবেশ আলোড়িত করছিলো। আমরা ফজর নামাজ জামাতের সাথে মহব্বত খানের বাগানে আদায় করি। ফজর নামাজের অল্প কিছুক্ষণ পরই মহব্বত খানের ঘর থেকে আফগান রেওয়াজ অনুযায়ী নাশতা চলে আসে। আমরা সকাল সকাল নাশতা করি এবং আফগানি কফি পান করে তৃপ্ত হই। খলিফা ভাই মহব্বত খানকে বললেন, তিনিও যেনো আজ আমাদের সাথে যান। কিন্তু মহব্বত খান এই বলে ওজর পেশ করেন যে, সে তার চাচার সাথে কোনো এক কাজে বাহিরে যাবে। সেখান থেকে যোহরের

আগে ফেরা সম্ভব নয়। তারপর আমি আপনাদের সাথে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকবো। কিন্তু আমরা তাকে বললাম, আমরা শুধু মাইনের ক্যামোফ্লাজ চেক করবো। কারণ, আমরা এগুলো রাতের আঁধারে বিছিয়েছি। তাই আমাদেরকে সকাল সকালই যাওয়া উচিত। তাছাড়া এলাকায় গিয়ে তাজা খবরাখবরও নেয়া উচিত। কারণ, অনেক সময় কানাডিয়ান আর্মির কনভয় যাওয়ার আগে রাস্তায় তল্লাশিকারী গ্রুপও এসে যায়। আল্লাহ না করুন, যদি এমন হয় যে, মাইন ভালোভাবে ক্যামোফ্লাজ করা হয়নি আর তল্লাশিকারী গ্রুপ এসে তা বের করে নেয়! আমি এবং খলিফা ভাই মহব্বত খানের বাগান থেকে বের হয়ে সাবধানে আমাদের বিছানো মাইনের দিকে রওয়ানা হই। আমরা গম্বুজ টু শিন রোডে যাচ্ছিলাম, যেখানে আমরা একটি মাইন বিছিয়ে ছিলাম। আমরা পায়ে হেঁটে পানির নালা দিয়ে যাচ্ছি। এর একটু সামনে পাহাড়ি টিলা শুরু হয়েছে। সেসব টিলার মাঝখান দিয়েই রাস্তা চলে গেছে। রাস্তার ওপারে উঁচু পাথুরে পাহাড়।

আমরা কেবল পাহাড়ি টিলার কাছে পৌঁছে ছিলাম, এরই মধ্যে আমার ওয়ারলেস সেট সংবাদ দেয় কানাডিয়ান আর্মির কাফেলা এখান থেকে ৪-৫ কিলোমিটার দূরে কোথাও সফর চালু রেখেছে। অর্থাৎ আমার ওয়ারলেস সেটে টোন আসতে শুরু করে। আমি খলিফা ভাইকে জানালাম, আমাদের থেকে ৪-৫ কিলোমিটার দূরত্বে কানাডিয়ার আর্মির কাফেলা সফর চালু রেখেছে। খলিফা ভাই পেরেশান হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এটা কিভাবে সম্ভব? আমি তাকে ওয়ারলেস জ্যামিংয়ের আগে আসা টোনের কথা মনে করে দিলাম। তখন খলিফা ভাই বললেন, নিশ্চয় আল্লাহরই সিদ্ধান্ত বিজয়ী থাকে। কারণ, কানাডিয়ান আর্মি নিজেদের হেফাজতের জন্য যে উপকরণ তৈরি করেছে আজ সেটাই সংবাদ দিয়ে তাদের মৃত্যুর কারণা হচ্ছে। তিনি আরো বলেন, আজ আমাদের নিকট পর্যাপ্ত সরাঞ্জামও নেই, অত্যাধুনিক প্রযুক্তিও নেই। তালেবানের সাথী হয়ে যা কিছু আছে এসব তো কেবলই খোদায়ী মদদ। আমি বললাম, যদি আল্লাহ তায়ালার সাহায্য এবং তাওফিক তালেবানের সাথে থাকে তাহলে কুফরের এই সম্মিলিত বাহিনী অচিরেই পরাজিত হয়ে এখান থেকে পালিয়ে যাবে। তারপর তারা আর আমাদের উপর আক্রমণ করতে পারবে না; বরং আমরা আমিরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর দা.বা. এর নেতৃত্বে তাদের উপর আক্রমণ পরিচালনা করে আল্লাহর কালেমাকে বুলন্দ করার দায়িত্ব পালন করবো। আমি এই আশঙ্কা করছিলাম, কানাডিয়ান আর্মির কাফেলা এই গম্বুজ টু শিন রোডেই আসছে। তাই আমাদেরকে খুবই দ্রুত ওই পাহাড়ের উপর পৌঁছতে হবে। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা পাহাড়ের উপর পৌঁছি। আমি খলিফা ভাইকে বললাম, আপনি দ্রুত

মাইনের নিকট চলে যান এবং খাঞ্চাকে ব্যাটারি ক্লিপ্সের সাথে সংযুক্ত করে দিন। এখনই তাতে বিদ্যুৎ সংযোগ করবেন না বরং অপেক্ষা করতে থাকবেন। যখন আমি বলবো তখনই বিদ্যুৎ সংযোগ দিবেন। আমি পাহাড়ের উপর চড়ে রাস্তার রেকি করে দেখছি কাফেলা কোন পথে আসছে।

আমি পাহাড়ের উপর চড়ে দেখি দূর দূরান্ত পর্যন্ত কাফেলার কোনো নাম নিশানাও নেই। কিন্তু ওয়ারলেসে তাদের টোন আসছে। এমনকি খালি কানে ট্যাংকের আওয়াজও শোনা যাচ্ছে। খলিফা ভাই মাইনের কাছে পৌঁছে অনুমানের ভিত্তিতে খাঞ্চা ফিট করেন এবং ব্যাটারি ক্লিপ্সের সাথে জুড়ে দিয়ে অপেক্ষা করতে থাকেন। এবার ট্যাংক চলার আওয়াজ গম্বুজ ক্যাম্পের দিক থেকে আসতে থাকে। কিছুক্ষণ পর গম্বুজ রোডের দিক থেকে একজন মুরব্বী আসেন। যিনি তালেবানের সমর্থক এবং সাহায্যকারী। আমরা যেখানে মাইন ফিট করি তার কাছেই তার ঘর ছিলো। আমি ওয়ারলেসের মাধ্যমে খলিফা ভাইকে সংবাদ দেই, তিনি যেনো এই মুরব্বীর কাছে জিজ্ঞেস করে জেনে নেন কাফেলা কোন দিকে গেছে। খলিফা ভাই মুরুব্বীকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, কাফেলা তো গম্বুজ টু সারখিল রোডের দিকে গেছে। এখন তারা পানির নালায় নেমে তল্লাশি করছে। তাদের সাথে দু'টি ট্যাংক, লোহার কপাটবদ্ধ গাড়ি এবং ক্যামেরা ওয়ালা জ্যামিং সিস্টেম গাড়ি আছে। এসব জানার পর আমি খলিফা ভাইকে বললাম, তিনি যেনো খাঞ্চাকে মাইন থেকে পৃথক করে কোনো নিরাপদ জায়গায় বসে যান। কারণ, এদিক দিয়ে যাতায়াতরত কোনো সাধারণ গাড়ি এর আওতায় এসে যেতে পারে। খলিফা ভাই ব্যাটারি এবং নিজেদের তৈরি খাঞ্চা মাইন থেকে পৃথক করে তালেবানের সহযোগী মুরুব্বীর সাথে তার ঘরে চলে যান। তিনি নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে আমার সাথে ওয়ারলেসে যোগাযোগ করেন। আমি যখন জানতে পারলাম কানাডিয়ান আর্মির তল্লাশিকারী গ্রুপ তাদের নিরাপত্তা বলয়সহ সারখিল টু গম্বুজ রোডে তল্লাশি নিচ্ছে এবং তারা পানির নালাতে যেখান দিয়ে রাস্তা চলে গেছে সেখানে নেমেছে তখন আমি পেরেশান হয়ে যাই। কারণ, সেখানেই আমরা ৩টি মাইন জিগজাগ আকৃতিতে বিছিয়ে ছিলাম। আমি আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়া করতে থাকি, আল্লাহ যেনো ইসলামের এই দুশমনদেরকে অন্ধ করে দেন এবং তাদের সকল যুদ্ধাস্ত্র জ্যাম করে দিয়ে আমাদের বিছানো মাইনগুলো হেফাজত করেন।

এবার আমি অন্য এক উঁচু পাহাড়ে উঠে যাই। যেখান থেকে গম্বুজ টু সারখিল রোড দেখা যাচ্ছিলো। আমি পাহাড়ের উপর একটি নিরাপদ জায়গায় বসি।

সেখান থেকে আমি বাইরের অবস্থা ভালো করে দেখছিলাম কিন্তু বাহির থেকে কেউ আমাকে দেখতে পাচ্ছিলো না। আমি ভালো করে গম্বুজ টু সারখিল রোডের পর্যবেক্ষণ করছিলাম। কিন্তু কানাডিয়ানদের কাউকে দেখছিলাম না, এমনকি তাদের কোনো গাড়িও দেখছিলাম না। তারা পানির নালায় থেকেই তল্লাশি নিচ্ছিলো। তখন সকাল ১০টা বাজে। ধীরে ধীরে কানাডিয়ান আর্মি তল্লাশি নিতে নিতে উপরে আসে। তখন আমি তাদেরকে দেখতে পাই। আমি আমার হ্যান্ডিক্যাম ভিডিও ক্যামেরা অন করে তল্লাশিকারী গ্রুপ এবং তাদের নিরাপত্তা বলয় ভিডিও করতে থাকি। কানাডিয়ান আর্মির কর্মিরা মাইন ডিটেক্টর এবং কুকুরের সাহায্যে রোডের তল্লাশি নিচ্ছিলো। কানাডিয়ান আর্মির উৎফুল্ল এবং অস্ত্রসজ্জিত জোয়ানরা সেসব ঘিরে দাঁড়িয়েছিলো। তারা তাদের মিথ্যা খোদা এবং যুদ্ধাস্ত্রের উপর খুব গর্বিত ছিলো এবং অহংকারে তাদের গর্দান ফুলে ছিলো। প্রতারণা, অহংকার এবং কুফরের পতাকাবাহী বলদগুলো দুপুর একটা পর্যন্ত রাস্তার তল্লাশি নিতে থাকে। তারপর তারা তাদের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর নিয়ে লোহার কপাটবদ্ধ গাড়িতে উঠে সারখিল টু গম্বুজ রোডে গম্বুজ ক্যাম্পে ফিরে যাওয়ার পরিবর্তে সোজা কান্দাহারের দিকে চলে যায়। এরই মধ্যে মহব্বত খান আমার সাথে যোগাযোগ করে বলেন, আমি আমার বাড়ির দিকে ফিরে আসছিলাম, রাস্তায় দেখলাম কানাডিয়ান আর্মির কাফেলা সারখিল টু গম্বুজ রোড থেকে ঘুরে শিন টু গম্বুজ রোডে আসছে। সম্ভবত যেখানে তাদের কনভয় রওয়ানা হওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে ছিলো, তারা সেখানে অর্থাৎ গম্বুজ ক্যাম্পে যাওয়ার জন্য শিন টু গম্বুজ রোডই ব্যবহার করবে।

সেদিকে কানাডিয়ান আর্মির তল্লাশি গ্রুপ ব্যাপক এবং বিস্তারিত তল্লাশি নিয়েছিলো। কিন্তু তারা রাস্তায় কিছুই পায়নি। আমাদের বিছানো মাইনগুলো নিরাপদই ছিলো। যে কোনো সময় আমরা সেগুলো আমেরিকান কনভয়ের উপর ব্যবহার করতে পারবো। মহব্বত খান থেকে এই গুরুত্বপুর্ণ এবং বিস্তারিত তথ্য পাওয়ার পর আমি খলিফা ভাইকে ওয়ারলেসের মাধ্যমে বলি, কানাডিয়ান আর্মির কাফেলা শিনের দিকে থেকে গম্বুজ বসতির দিকে আসছে। আপনি রাস্তার ওদিকটায় আমাদের তৈরি করা খাঞ্চা ফিট করে দিন এবং ব্যাটারি লাগিয়ে তাতে বিদ্যুৎ সংযোগ করে দিন। কারণ, এখন শিনের দিক থেকে কোনো সাধারণ গাড়ি আসার একদমই সম্ভাবনা নেই। কেননা কানাডিয়ানরা কোনো সাধারণ গাড়িকে তাদের কনভয় ক্রস করতে দেয় না। আর অন্য দিক থেকে আসা কোনো গাড়ি বিছানো মাইনের সাথে লাগা অসম্ভব। খলিফা ভাই তালেবানের সহযোগী এবং সমর্থক মুরব্বীর ঘরে বসে ছিলেন। তিনি আমার

সংবাদ শুনে মাইনের সাথে আমাদের তৈরি খাঞ্চা ফিট করেন। তারপর ব্যাটারি ক্লিপ্স লাগিয়ে তাতে বিদ্যুৎ সংযোগ করে মাইন একদমই প্রস্তুত হওয়ার ব্যাপারে আমাকে নিশ্চয়তা দেন। আমি তাকে বললাম, আপনি মহব্বত খানের বাড়িতে চলে যান।

আমি রোডের উপর দৃষ্টি দিয়ে দেখি রোড একদমই পরিষ্কার। রোড সাধারণ এবং ফৌজি সবরকমের গাড়ি থেকে মুক্ত ছিলো। আমি আমার হ্যান্ডিক্যাম ভিডিও ক্যামেরা এবং গ্রেনেড, যেটি বিপর্যয়ের মুহূর্তে দুশমনের সাথে বুঝাপড়া করতে একদমই প্রস্তুত ছিলো, সেটি সামলে নেই। তারপর পাহাড় থেকে নিচে নেমে আসি এবং রোড পার হয়ে অপর পাশে উঁচু পাথুরে পাহাড়ে উঠি। আমি রোড থেকে সামান্য দূরে এসে পাহাড়ের উপর একটি পাথরের আড়ালে দাঁড়িয়ে রোডের উপর দৃষ্টি দেই। দেখি কনভয় এদিকে এগিয়ে আসছে। কানাডিয়ান আর্মির কনভয়ের ট্যাংক আসতে দেখে আমি দ্রুত পাহাড়ের উপর উঠতে শুরু করি। এরই মধ্যে খলিফা ভাইয়ের সাথের যোগাযোগের চেষ্টা করি। কিন্তু তখন আমার ওয়ারলেস সেট একদমই জ্যাম হয়েছিলো। কাফেলা আমার থেকে প্রায় এক কিলোমিটার নিচে রোড দিয়ে যাচ্ছিলো। আমাদের বিছানো মাইনের দিকে কাফেলা খুব দ্রুত এগিয়ে আসছে। কানাডিয়ান আর্মির কাফেলা এবং আমাদের বিছানো মাইনের মাঝখানে তখন কেবল ২০০ মিটার দূরত্ব ছিলো। আমি আমার ভিডিও ক্যামেরা দিয়ে কাফেলার গতিবিধি ভিডিও করতে থাকি। সামনের রোড একদমই ফাঁকা। যার ফলে সবার আগে চলে আসা ট্যাংকের গতি আরো বাড়িয়ে দেয়। বাকি কাফেলাও সেটির সাথে দ্রুত চলতে থাকে। এখন আমাদের বিছানো মাইন ও খাঞ্চা থেকে ট্যাংক মাত্র ৩০ মিটার দূরে। আমার বুক ধরফর করতে থাকে। আমি আমার রবের নিকট মিশনের কামিয়াবির জন্য দোয়া করতে থাকি। অন্তরে কামিয়াবি এবং ব্যর্থতা উভয় চিন্তা দোদুল্যমান ছিলো। ততক্ষণে ট্যাংক আমাদের বিছানো মাইনের একদমই নিকটে চলে আসে। যেখানে মাইন বিছানো ছিলো তার একপার্শ্বে পানির নালা থাকায় রাস্তা নিচু হয়ে যায় এবং অপর পার্শ্বে উঁচু পাথর ছিলো। যারফলে ট্যাংক যাওয়ার জন্য কেবল মাইনের উপরের অংশ দিয়েই রাস্তা বাকি ছিলো। ট্যাংক খুব দ্রুত সামনে বাড়ছিলো। যখনই কানাডিয়ান ট্যাংকের সামনের অংশ আমাদের বিছানো খাঞ্চার সাথে লাগে, সাথে সাথে এক প্রজ্জ্বলিত আলো এবং বিকট আওয়াজে মাইন বিস্ফোরিত হয়ে যায়। কালো ধোঁয়া আর ধুলোবালির মধ্যে ট্যাংকের টুকরোগুলো আকাশে উড়তে থাকে। রোডের উপর পড়ে থাকা ট্যাংকের বাকি অংশেও আগুন লেগে যায়।

কানাডিয়ান আর্মির বদ অনুভূতি

যখন কানাডিয়ান আর্মির কাফেলা সফর করছিলো এবং খুব দ্রুত তাদের ক্যাম্পের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলো, ঠিক তখনই আচানক বিকট শব্দে বিস্ফোরণ হয় এবং তাদের ট্যাংক ধ্বংস হয়ে যায়। তাদের অবশিষ্ট কাফেলা আঁতকে উঠে তাৎক্ষণিক ব্রেক করে। ফলে তাদের গাড়ি আপসে টক্কর লাগে এবং সবার সামনে থাকা জ্যামিং সিস্টেম ওয়ালা জিপ খুব কষ্টে ধ্বংসপ্রাপ্ত ট্যাংকের সাথে সংঘর্ষ হওয়া থেকে বেঁচে যায়। ধ্বংসপ্রাপ্ত ট্যাংক থেকে তখন উঁচু হয়ে আগুনের ফুলকি বের হচ্ছিলো। কানাডিয়ান আর্মি তাদের কাফেলা পিছনের দিকে ছুটিয়ে দিয়ে ১০০ মিটার পিছনে গিয়ে থেমে যায় এবং এলোপাথাড়ি চারদিকে ফায়ারিং শুরু করে। বেঁচে যাওয়া ট্যাংকে ফিট করা গান থেকেও আগুনের গোলা নিক্ষেপ করতে থাকে। এটি তাদের বদ অনুভূতিরই প্রমাণ ছিলো। তারা কোনো টার্গেট ও নিশানা না দেখে পাহাড় এবং পানির নালাতে আন্দাজের উপর ফায়ারিং করতে থাকে। ততক্ষণে আমি অন্য এক পাহাড়ের উপর নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে গিয়েছিলাম। আনুমানিক এক ঘণ্টা পর আকাশে তিনটি হেলিকপ্টার চক্কর দিতে শুরু করে। যেগুলোর একটি ট্রান্সপোর্ট এবং দু'টি জঙ্গী হেলিকপ্টার ছিলো। ট্রান্সপোর্ট হেলিকপ্টার জ্বলন্ত ট্যাংকের কাছে নেমে আসে। হেলিকপ্টারে থাকা কানাডিয়ান আর্মিরা নিচে নেমে জ্বলন্ত ট্যাংকে ক্যামিকেল স্প্রে করে আগুন নিভায় এবং কানাডিয়ান আর্মির জ্বলে যাওয়া লাশগুলো বের করে। তারপর সেগুলো হেলিকপ্টারে উঠিয়ে ফিরে যায়।

আমেরিকান বিমানের বোম্বিং

যখন ধ্বংস হওয়া ট্যাংক থেকে কানাডিয়ান আর্মির জ্বলে যাওয়া লাশগুলো বের করে হেলিকপ্টারে করে নিয়ে যায় তখন আমেরিকান জেট বিমান এবং ড্রোন বিমান আকাশে গর্জন করতে থাকে। আমি আমার ওয়ারলেস সেট বন্ধ করে ফেলি এবং হ্যান্ডিক্যাম ভিডিও ক্যামেরা ঝোঁপের আড়াল থেকে বের করে ভিডিও করতে থাকি। এরই মধ্যে আমেরিকান জেট বিমান পাহাড় এবং পানির নালায় বোম্বিং শুরু করে। কিন্তু এই পাথুরে পাহাড়ে কোনো মানবাত্মা না থাকায় কোনো ক্ষতি হয়নি। আমেরিকান বিমান আধা ঘণ্টা পর্যন্ত ধ্বংসাত্মক বোম্বিং করে ফিরে যায়। কিন্তু ড্রোন বিমান আকাশে চক্কর দিতে থাকে। আমি আক্রমণ পরিচালনা করার পর এক পাহাড়ি গর্তে আত্মগোপন করেছিলাম। যার মুখে খুব ঘন জংলি ঝোপঝাড় জন্মেছিলো। সেখানেই আমি তায়াম্মুম করে যোহর ও

আসর নামাজ আদায় করি। যখন গোয়েন্দা বিমানের আওয়াজ বন্ধ হয়ে যায় তখন বাইরে এসে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে থাকি। হঠাৎ আকাশে একটি আমেরিকান জেট বিমান দেখতে পাই। সেটি গোত্তা খেয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত ট্যাংকের উপর বোম্বিং করে, যা ট্যাংক থেকে সামান্য দূরে পতিত হয়। এভাবে সেটি তিনবার গোত্তা খেয়ে বোম্বিং করে কিন্তু কোনো টার্গেটে লাগাতে ব্যর্থ হয়। অবশেষে বিমানটি কিছুক্ষণ আকাশে চক্কর দিয়ে চলে যায়।

তালেবানের সাথে যোগাযোগ

কানাডিয়ান আর্মির উপর আক্রমণ যোহরের আগে হয়েছিলো। আর এখন আসর ও মাগরিবের মাঝামাঝি সময়। যখন আমেরিকান জেট বিমান বড় বড় বোম নিক্ষেপ করে ধ্বংসপ্রাপ্ত ট্যাংকের বাকি অংশ ধ্বংস করার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে ফিয়ে গিয়েছিলো তখন আমি একটি জংলি আঞ্জির গাছের নিচে বসে ওয়ারলেস সেট অন করি। তখন এই এলাকায় অবস্থান করা তালেবান আমার নাম্বারে আমাকে ডাকছিলো। আমি কারো জবাব দেইনি। এরপর খলিফা ভাইয়ের আওয়াজ শুনি। তিনি কোনো তালেবানকে বলছিলেন, আক্রমণের আগে হায়াতুল্লাহকে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত গম্বুজ টু শিন রোডের উপর অবস্থিত পাহাড়ে দেখা গিয়েছিলো। বিস্ফোরণের পর থেকে তার সাথে আর যোগাযোগ হয়নি। সে বোম্বিংয়ে জখমি হয়েছে নাকি শহীদ হয়েছে, নাকি তাকে কানাডিয়ান আর্মিরা গ্রেফতার করে নিয়ে গেছে তা এখনো জানা নেই। এ কথার মাধ্যমে আমি বুঝতে পারি, তালেবানরা আমার ব্যাপারে কী পরিমাণ পেরেশানিতে আছে। আমি মহব্বত খান এবং খলিফা ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য বলি, আমি ঠিক আছি, আপনারা পেরেশান হবেন না। আমি পরে যোগাযোগ করবো। তারপর আমি একটি রেপিয়েটার (Repeater) নাম্বারে কল করে আমার জিম্মাদার কমান্ডার মোল্লা আব্দুশ শুকুরের সাথে যোগাযোগ করি। তাকে কানাডিয়ান আর্মির ট্যাংক ধ্বংস হওয়ার সুসংবাদ শুনাই। বাকি ঘটনা পরে বলার ওয়াদা করে আমি আমার ওয়ারলেস সেট বন্ধ করে দেই।

ধ্বংসপ্রাপ্ত ট্যাংকের বাকি অংশ

তখন মাগরিবের সময়। আমি আমার ওয়ারলেস সেট পুনরায় অন করি এবং মহব্বত খানের সাথে যোগাযোগ করি। সে তার বাড়িতেই অবস্থান করছিলো। তাকে আমি ধ্বংসপ্রাপ্ত ট্যাংকের কাছে আসতে বলি। আমি আধা ঘণ্টার মধ্যে

ট্যাংকের কাছে পৌঁছে যাই। এসে দেখি সে আগেই চলে এসেছে। আমরা ধ্বংসপ্রাপ্ত ট্যাংক পর্যবেক্ষণ করি। সেটি খুবই গরম ছিলো। ট্যাংক থেকে হালকা হালকা ধোঁয়া বের হচ্ছে। ট্যাংকের টায়ার আলাদা হয়ে গেছে এবং ট্যাংক কয়েক টুকরা হয়ে পড়ে আছে। ব্যারেলটিও ট্যাংক থেকে পৃথক হয়ে গেছে। কারণ, ট্যাংকের একদমই মাঝখানে নিচের দিকে একটি দরজা থাকে, যেটি ফায়ারিং পরিবর্তন করার সময় বাহিরে বের হওয়ার জন্য সৈন্যরা ব্যবহার করে। আমাদের মাইন একদম সেই দরজা বরাবর জায়গাতেই ব্লাস্ট হয়েছিলো। যার ফলে ট্যাংকের ভিতর থাকা কোনো সৈন্য নিচে নামতে পারেনি। আমরা সেখানে থাকা স্থানীয় লোকদের থেকে জানতে পারলাম, কানাডিয়ান আর্মির সদস্যরা সেখান থেকে ১৮টি লাশ বের করে নিয়ে গেছে। আমরা জ্বলন্ত ট্যাংকের ভিডিও করলাম এবং সেটির তল্লাশি আগামী দিন পর্যন্ত মুলতবি করে ফেরার পথ ধরলাম। খলিফা ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করে বলি, আমরা আপনার দিকে আসছি। তিনি বললেন, আপনি আসুন আমি আপনার অপেক্ষায় আছি। এ কথা বলে কল কেটে দিলেন। কিন্তু মহব্বত খান বললেন, তালেবানের সহযোগী এক লোক আপনাকে দাওয়াত করেছেন। সেখানে যেতে হবে। আমরা এক ঝর্ণাতে অজু করে মাগরিবের নামাজ আদায় করি। পথে খলিফা ভাইকে সাথে নিয়ে দাওয়াতকারীর বাড়িতে পৌঁছে যাই।

তালেবানের শুভেচ্ছা বাণী

আমি খাবার খেয়ে মোল্লা আব্দুশ শুকুরকে সফল আক্রমণের বিস্তারিত বিবরণ শুনাই। তাকে বলি এই সফল আক্রমণে ১৮ কানাডিয়ান আর্মির সদস্য জাহান্নামে গেছে। কমান্ডার আব্দুশ শুকুর সাহেব সমস্ত বিবরণ স্যাটেলাইট ফোনের মাধ্যমে বিবিসিকে জানিয়ে দেন। আর আমাকে এই শানদার আক্রমণের উপর মোবারকবাদ জানান। আমি আসরের পরই রেপিয়েটারের মাধ্যমে এই সফল আক্রমণের সংবাদ মোল্লা আব্দুশ শুকুরকে দিয়েছিলাম। যার সংবাদ নিকটবর্তী সকল জেলার তালেবানের কাছেও পৌঁছে ছিলো। এই সুসংবাদ ছড়িয়ে পড়ায় তালেবানের পক্ষ থেকে মোবারকবাদ এবং অভিনন্দনের সংবাদ আসতে শুরু হয়ে যায়। যাদের মধ্যে কমান্ডার মৌলভী ইয়ার মুহাম্মাদ, কমান্ডার মোল্লা হায়দার এবং মোল্লা তোর নকিব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এরই মধ্যে সাবউন খানের সাথে যোগাযোগ হয়। তিনিও আমাকে এই সফল শানদার আক্রমণের জন্য মোবারকবাদ জানান। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে রেপিয়েটারের মাধ্যমে কারী ফয়জুল্লার সাথে যোগাযোগ হয়। তিনিও এই সফল

আক্রমণের জন্য মোবারকবাদ দিয়ে বলেন, এর মাধ্যমে তালেবানের সাহস বেড়ে যাবে এবং এলাকাতে সম্মিলিত বাহিনীর সহযোগীদের উপর প্রভাব বিস্তার করবে। সহনশীল সহজ সরল তালেবানের অবস্থানও উঁচু হবে। তুমি তোমার শানদার মেধা এবং সফল রণকৌশলে কানাডিয়ান আর্মির মোড়লদেরকে হতভম্ব করে দিয়েছো। আমি বললাম, এটি আল্লাহ তায়ালার বিশেষ অনুগ্রহ। তাঁর তাওফিকেই এই আক্রমণ হয়েছে। এতে বান্দার কোনো বিশেষত্ব নেই। তিনি আরো বলেন, এ ধরনের সফল আক্রমণের পদ্ধতি অন্যান্য তালেবানকেও জানাও। যাতে তারাও ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে সফল আক্রমণ করতে পারে। আর তাতে ক্রুসেডার এবং কুফরের পতাকাবাহীদের সম্মিলিত বাহিনী অতি দ্রুত শহীদানের পুণ্যভূমি আফগানিস্তান থেকে পালাতে বাধ্য হয়।

কানাডিয়ান আর্মির প্রতিনিধির স্বীকারোক্তি

সকালে আমরা ফজর নামাজের পর বিবিসির সংবাদ শুনি। তাতে বিবিসি কানাডিয়ান আর্মির বিরুদ্ধে তালেবানের এই সফল আক্রমণের সংবাদ প্রচার করে। ১৮ কানাডিয়ান সৈন্য নিহত হওয়ার সংবাদও প্রচার করে। সেই সাথে কান্দাহারে নিযুক্ত কানাডিয়ান আর্মির প্রতিনিধির স্বীকারোক্তিও প্রচার করে। সে তাতে ট্যাংক ধ্বংস হওয়া এবং সৈন্য নিহত হওয়ার স্বীকারোক্তি করে। বিবিসির বিশ্লেষক এর উপর আলোচনা করতে গিয়ে এটিকে তালেবানের এক বড় সফলতা বলে স্বীকার করে।

মোল্লা আব্দুর রহমানের প্রতিক্রিয়া

এরপর আমরা নাশতা করে মহব্বত খানের সাথে ট্যাংকের দিকে রওয়ানা হয়ে যাই। আর খলিফা ভাইকে মৌলভী হামিদুল্লার নিকট পাঠিয়ে দেই। যখন আমরা ট্যাংকের কাছে পৌছি তখন সেখানকার দৃশ্য অবাক হওয়ার মতো ছিলো। গতকালের আক্রমণে ট্যাংক অবশ্যই ধ্বংস হয়েছিলো। তাতে আগুনও লেগেছিলো। টায়ার দুটি ছাড়া ট্যাংক পূর্ণই ছিলো। কিন্তু এখন আমাদের সামনে কেবল ট্যাংকের বডি পড়ে আছে। আর অনেক স্থানীয় লোক হাতুড়ি রেঞ্চ ইত্যাদি দিয়ে ট্যাংক টুকরো টুকরো করে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা দুজনই সকাল সকাল সেখানে পৌছে ছিলাম। কিন্তু স্থানীয় লোকেরা আরো আগে ট্যাংকের ব্যারেল, টায়ার, ফ্লাস হায়েন্ডার, দরজা এবং ট্যাংকের অনেক অংশ খুলে নিয়ে গেছে। আমি তৎক্ষণাৎ ক্যামেরা অন করি এবং এই টানা-হেচড়ার ভিডিও

করতে থাকি। সেখানে অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে স্থানীয় মসজিদের ইমাম মোল্লা আব্দুর রহমান আসেন। আমি তাকে তার প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করতে বললে তিনি স্থানীয় লোকদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন–

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْم. اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ○

তোমাদের উপর ফরজ করা হয়েছে কিতালকে, যদিও তা তোমাদের নিকট অপছন্দনীয়। হতে পারে তোমরা একটা বিষয় অপছন্দ করো অথচ সেটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হতে পারে একটা বিষয় তোমরা পছন্দ কর অথচ সেটা তোমাদের জন্য ক্ষতিকর। আল্লাহ তায়ালাই জানেন, তোমরা জানো না। *[বাকারা ২:২১৬]*

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ.

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমি ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষের সাথে কিতাল করতে আদিষ্ট হয়েছি, যতক্ষণ না তারা সাক্ষী দেবে আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লা আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রাসূল। *[বুখারী শরীফ ৮/১]*

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا.

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, নিশ্চয় আল্লাহর রাস্তায় একটি সকাল অথবা একটি বিকাল ব্যয় করা দুনিয়া এবং তাতে যা কিছু আছে সেসব থেকে উত্তম। *[বুখারী শরীফ : ৩৯৬/১]*

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: جُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي. وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي.

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা আমার রিযিক রেখেছেন আমার বর্শার ছায়াতলে। আর আমার কাজের বিরোধিতা যে করবে তার জন্য রয়েছে লাঞ্ছনা এবং অপদস্ততা। *[হাশিয়ায়ে বুখারী শরীফ ৪০৮/১]*

আমার প্রাণপ্রিয় দেশবাসী এবং বন্ধুগন! আল্লাহ তায়ালা আমাদের দুনিয়া ও আখেরাতের কামিয়াবির জন্য যে বিধি-বিধান অবতীর্ণ করেছেন, সেগুলোতে বিশ্বাস রাখা এবং আমল করা আমাদের দায়িত্ব। ইসলাম গোটা বিশ্বে বিজয়ী হওয়ার জন্য এসেছে। কুরআন মাজিদে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ۝

তিনি সেই সত্ত্বা যিনি তার রসূলকে পাঠিয়েছেন হেদায়াত এবং সত্য দীন দিয়ে, যাতে তিনি তা বিজয়ী করেন সকল দীনের উপর। আর সত্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট। *[ফাতাহ ৪৮:২৮]*

এই আয়াতে ইসলামকে অন্য দীনের উপর বিজয়ী করার স্পষ্ট হুকুম রয়েছে। এই দীনকে গোটা পৃথিবীতে বিজয়ী করার জন্য যে দায়িত্ব এবং বিধান নাযিল হয়েছে তা হলো জিহাদের হুকুম। জিহাদকে আল্লাহ তায়ালা এই আয়াতের মধ্যে বর্ণনা করেছেন–

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ

আল্লাহর রাস্তায় কাফেরদেরকে কতল করা তোমাদের উপর ফরজ, যদিও তোমরা সেটি অপছন্দ কর।

বন্ধুগণ! জিহাদ আল্লাহর ফরজ হুকুম। এর উপর ঈমান রাখতে হবে। জিহাদ আল্লাহর পক্ষ থেকে ফরজ করা হয়েছে। জিহাদ দীন বিজয়ী হওয়ার মাধ্যম। জিহাদ দীন হেফাজত হওয়ার রাস্তা। এই বিশ্বাস রাখা আমাদের উপর ফরজ। যে এই বিশ্বাস রাখবে না, ইসলামের সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই। তার ঈমান নবায়ন করা আবশ্যক। কেউ কুরআনের একটি আয়াতের অর্ধেক আয়াত অস্বীকার করলেও সে কাফের। জিহাদের হুকুম কুরআনের ৪৫০ এরও অধিক আয়াতে রয়েছে। যে তা অস্বীকার করবে কিংবা ভুল ব্যাখ্যা করবে সে কাফের, সে মুমিন হতে পারে না।

হে মুহাম্মাদে আরাবির অনুসারীরা!

হে খালেদ ও জেরারের অনুসারীরা!

ওঠো! ওঠো! আজ মুসলিম উম্মাহ'র উপর কাফেররা সকল দিক থেকে হামলা করেছে। আজ কুফরের সৈন্যরা বায়তুল্লাহ এবং মসজিদে নববীর কাছে পৌঁছে গেছে। আজ প্রথম কেবলা ইহুদীদের দখলে। আজ কাশ্মীর, আফগানিস্তান এবং ইরাকের মুসলমান ইহুদী, হিন্দু আর নাসারাদের জুলুমের শিকার। আজ হাজারো মসজিদ ধ্বংস করা হচ্ছে।

হে মুহাম্মাদে আরাবির ওয়ারিসিন!

কেবল একজন সাহাবী, হযরত উসমান রা.-এর খুনের বদলা নেয়ার ব্যাপার ছিলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চৌদ্দশত সাহাবী থেকে মৃত্যুর উপর বায়আত গ্রহণ করেছিলেন। বনু কায়নুকাতে একজন মুসলিম মহিলার ইজ্জতের ব্যাপার ছিলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোটা বাহিনীকে নিয়ে হাজির হয়েছিলেন।

আজ আমরা নিজেদেরকে আল্লাহর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওয়ারিস দাবি করি; কিন্তু এই উম্মতের মজলুম মেয়েরা কাফেরদের কয়েদখানায় গুমরে কাঁদছে, আজ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খতমে নবুওয়াতের উপর পর্দা ফেলা হচ্ছে। আজ আবু গরীব কারাগার থেকে নিয়ে গোয়ান্তানামু বে এর জিন্দানখানা পর্যন্ত, নিরপরাধ মুসলিম যুবক-যুবতীরা ক্রুসেডারদের কয়েদ খানায় বন্দী। আজ গোটা পৃথিবীর কাফেররা আফগানের খালেছ ইসলামী হুকুমতকে শেষ করে তাদের জুলুমি নেজাম, গণতন্ত্র নিয়ে আফগানিস্তানে এসে গেছে।

গোটা বিশ্বের কাফেররা একত্র হয়ে ইসলাম এবং মুজাহিদীনকে শেষ করার জন্য শহীদানের পুণ্যভূমিতে এসে গেছে। তাদের বিরুদ্ধে উলামায়ে কেরামের নেতৃত্বে তালেবানরা জিহাদ করছে। আর এই জিহাদ ফরজ। তাই তোমরা ওঠো এবং কাফেরদের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে শরীক হয়ে যাও। ওঠো! তোমরাও এই যুদ্ধের ভালো এবং মন্দের মধ্যে শরিক হয়ে যাও। কাফেরদের পরিণতিও তোমরা এমন করে দাও, যেমন তালেবানরা এই ট্যাংকের পরিণতি করেছে। জিহাদের ব্যাপারে কোনো ধোঁকার শিকার হবে না। মোল্লা আব্দুর রহমান ট্যাংকের দিকে ইশারা করে বলেন, জিহাদ এমনভাবেই ফরজ যেমন তালেবানরা করছে। আর যদি তোমরা জিহাদ না কর তাহলে শুনে রাখো,

مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِالْغَزْوِ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ.

যে ব্যক্তি এমতাবস্থায় মৃত্যুবরণ করলো যে, সে কখনো জিহাদ করেনি এবং অন্তরে তার ইচ্ছাও রাখেনি তাহলে তার মৃত্যু এক ধরনের মুনাফেকির উপর হবে। *[মুসলিম শরীফ, আবু দাউদ শরীফ ও নাসাঈ শরীফ।]*

এই হুঁশিয়ারি থেকে বাঁচার জন্য নিজেকে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর জন্য প্রস্তুত কর।

স্থানীয় জনতার জিহাদী স্পৃহা

জিহাদের উৎসাহ এবং তালেবানের সহযোগিতার উপর মোল্লা আব্দুর রহমানের কার্যকরী ও আবেগঘন খেতাব শুনে বহু নওজোয়ান জিহাদে শরীক হওয়ার দৃঢ় সংকল্প করে। তারা বলে, আমরা আমেরিকা এবং তাদের সম্মিলিত বাহিনীর বিরুদ্ধে জিহাদে তালেবানের সাথে অবশ্যই শরীক হবো। অর্থ, জান এবং আখলাকি যে কোনো ধরনের সহায়তা দিতে আমরা কুণ্ঠাবোধ করবো না। এসব আন্তর্জাতিক গুণ্ডাদেরকে শহীদানের পুণ্যভূমি আফগানিস্তান থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য করবো। যদি আল্লাহর মদদ, সাহায্য এবং তাওফিক আমাদের সাথে থাকে তাহলে অচিরেই খালেস ইসলামী হুকুমত কায়েম করবো।

আমরা ধ্বংস হওয়া ট্যাংক তল্লাশি নিলে তাতে ৩টি রাশিয়ান টি.টি পিস্তল গনিমত হিসেবে পাই। আমরা সেগুলো উঠিয়ে সেই স্থানে চলে আসি, যেখানে জেট বিমান বোম্বিং করেছিলো। সেখানে আমরা একটি বোম পাই। যেটি বিস্ফোরিত হয়নি। আমরা সেটিকে গাধার গাড়িতে করে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাই। যাতে সময় মতো তা ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পারি।

মাওলানা হামিদুল্লাহ আমলদার আলেম এবং সফল ব্যবসায়ী

আমি এবং মহব্বত খান অনেক গোপনে আমেরিকান জেট বিমানের বোমা নিরাপদ জায়গায় স্থানান্তর করে ফেরার পথ ধরি। আমরা সামান্য পথ অতিক্রম করতেই আমার ওয়ারলেসে জ্যাম সৃষ্টিকারী টোন আসতে থাকে। ঘটনাটি ছিলো সকাল ৮টার দিকে। আমি মহব্বত খানকে বললাম, গম্বুজে অবস্থিত কানাডিয়ান আর্মির ক্যাম্পে নিযুক্ত সদস্যদের আজ পরিবর্তন হওয়ার কথা। কান্দাহার থেকে

আগত কনভয়ের আগে রাস্তা নিরাপদ করার জন্য তল্লাশি গ্রুপ নিশ্চয় এই রোড দিয়ে আসছে। আমাদের আশঙ্কা, গত আক্রমণে তাদের ট্যাংক ধ্বংস হওয়াসহ জানের যে ক্ষতি হয়েছে, তার কারণে কঠিন তল্লাশি হবে।

আমাদেরকে দ্রুত এখান থেকে নিরাপদ জায়গায় স্থানান্তরিত হতে হবে তারপর আগামী প্লান করতে হবে। যখন আমরা রোড থেকে নিচে নামি তখন আমরা ট্যাংকের আওয়াজ শুনতে পাই। মহব্বত খান আমাকে সারখিল এবং গম্বুজের মাঝখানে অবস্থিত মিঞাশিন বসতিতে তালেবানের সহযোগী জানবাজ মুজাহিদ মাওলানা হামিদুল্লাহর বাড়ির দিকে নিয়ে যান। আমরা আধা ঘণ্টা হাঁটার পর মাওলানা হামিদুল্লাহর বাড়ির সাথে বানানো মেহমানখানায় পৌঁছি। খলিফা ভাই আগেই সেখানে পৌঁছে ছিলেন। আমরা মেহমানখানায় পৌঁছলে খলিফা ভাই উঠে আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। এরই মধ্যে প্রশস্ত কপাল, গৌর বর্ণ, শক্ত এবং লম্বা দেহের এক নওজোয়ান মেহমানখানায় প্রবেশ করেন। যার চেহারা সুন্নাতে রাসূল দিয়ে সুসজ্জিত এবং মাথায় আফগানি রেওয়াজের সাদা পাগড়ির মুকুট সাজানো ছিলো। তিনি আবেগপূর্ণ মুসাফাহা এবং মুয়ানাকা করে আমাদেরকে বসতে বললেন। আর তিনি দুই হাঁটুর উপর ভর দিয়ে গাম্ভীর্যের সাথে আমাদের সামনে বসে যান। আমি আগত নওজোয়ানের ব্যক্তিত্বপূর্ণ কথাবার্তায় খুবই প্রভাবিত হচ্ছিলাম। এরই মধ্যে মহব্বত খান তার সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দেন। মাওলানা হামিদুল্লাহ নামে পরিচয় করানোর পর মহব্বত খান বলেন, তিনি বড় জামিয়া থেকে ফারেগ হওয়া একজন আমলদার আলেম। মাওলানা হামিদুল্লাহ একজন আমলদার সৎ নওজোয়ান। তিনি একজন ভালো আলেমে দীন এবং শরীয়তের পাবন্দ। এলাকাতে লোকজনের দীনি পথপ্রদর্শনের দায়িত্ব আদায় করেন। আল্লাহর রাস্তায় একজন জানবাজ এবং ফেদায়ী মুজাহিদও। তিনি ইলম ও জিহাদের এক অপূর্ব সমন্বয়। সেই সাথে মাওলানা হামিদুল্লাহ একজন সফল ব্যবসায়ীও। তার বিস্তর ব্যবসা বাণিজ্য আছে। তিনি আঞ্জির এবং আনার আফগানিস্তানের বিভিন্ন এলাকা থেকে ক্রয় করে পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের বড় বড় বাজারে বিক্রয় করেন।

এসব ছাড়াও তার নিজস্ব বাগান আছে। যেগুলোর ফল মাওলানা হামিদুল্লাহ আফগান ট্রানজিট ট্রেডের মাধ্যমে ইন্ডিয়ার বড় বড় বাজার পর্যন্ত নিয়ে বিক্রি করেন এবং বড় অংকের অর্থ উপার্জন করেন। আমি আফগানিস্তানে এসেছি বহু দিন হয়েছে। এই দীর্ঘ সময়ে মাত্র দু'একজন লোকের সাক্ষাৎ পেয়েছি যারা উর্দু ভাষা জানে। কিন্তু মিঞাশিন বসতি এবং তার আশেপাশে একমাত্র মাওলানা হামিদুল্লা-ই এমন ব্যক্তি, যিনি মুজাহিদ ফি সাবিলিল্লাহ হওয়ার পাশাপাশি

শরীয়তেরও গভীর জ্ঞান রাখেন, সেই সাথে উর্দু ভাষাও জানেন এবং তার মর্মার্থও বুঝতে পারেন।

আফগান জুড়ে মেহমানদারির জন্য কফির রেওয়াজ রয়েছে। কিন্তু আমরা মাওলানা হামিদুল্লার মেহমানখানায় অবাক হয়ে লক্ষ করলাম, তার ছেলে আমাদের জন্য দুধ চা নিয়ে এসেছে। আমি অবাক হলাম এ কারণে যে, আফগান ভূখণ্ডের রেওয়াজ হলো কফি। দুধের চা এখানে বানানো হয় না। মাওলানা হামিদুল্লাহ কিভাবে এতে অভ্যস্ত হলেন? কিন্তু বাস্তব অবস্থা কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রকাশ হয়ে যায়। মাওলানা হামিদুল্লাহ পাকিস্তানের করাচিতে লেখাপড়া করেছেন। সেখানে চায়ের ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। আর তাই মাওলানা হামিদুল্লাহ দুধের চায়ে অভ্যস্ত। তিনি এটাও জানেন যে, পাকিস্তানি মুজাহিদীনও দুধের চা খুব পছন্দ করেন। তাই তিনি আজ আমাদের জন্য পাকিস্তানি রেওয়াজ অনুযায়ী দুধ চায়ের ব্যবস্থা করেন। ভালো, অনেক দিন পর দুধ চা পান করায় স্বাদ দ্বিগুন বেড়ে যায়।

কানাডিয়ান আর্মির উপর দ্বিতীয় হামলার প্রস্তুতি

আমরা চা পান করে দেখি ঘড়িতে সাড়ে নয়টা বাজে। আজ গম্বুজে নিযুক্ত কানাডিয়ান আর্মির সদস্যদের ডিউটি পরিবর্তনের দিন ছিলো। কান্দাহার থেকে কানাডিয়ান আর্মির কনভয় আগমনের সময় ১১-১২টার মধ্যে হওয়ার কথা। রোডে কঠিন তল্লাশি চলছে। রোড নিরাপদকারী তল্লাশি গ্রুপ রোডে গভীর দৃষ্টি রাখছিলো। সন্দেহ হলেই তল্লাশি গ্রুপ গাড়ি থেকে নেমে তল্লাশি করছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরের সাহায্যে পানির নালা, গর্ত এবং রোডের আশেপাশেও তল্লাশি নেয়। আকাশের নিরাপত্তার কাজে নিয়োজিত হেলিকপ্টার গর্জন করতে থাকে। কিন্তু 'আল্লাহ যাকে রাখেন তাকে কে মারতে পারে?' এই প্রবাদের বাস্তবতা আমরা প্রথম আক্রমণলগ্নেই উপলব্ধি করেছিলাম। গম্বুজ টু সারখিল রোডে তিনটি মাইন বিছিয়ে আমরা সফল হয়েছিলাম। সেগুলো রোডের খোলা জায়গাতেই ছিলো। যার কারণে কানাডিয়ান আর্মির নিরাপত্তা বাহিনী রোডের তল্লাশির সময় সেই জায়গায় তল্লাশি নেয়নি। আল্লাহ তায়ালা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর থেকেও সেই মাইনগুলো হেফাজত রাখেন।

কান্দাহার থেকে কাফেলা আসার এখনো দেড় থেকে আড়াই ঘণ্টা বাকি ছিলো। আমরা যেই খাঞ্জার মাধ্যমে একদিন আগে কানাডিয়ান আর্মির উপর সফল আক্রমণ পরিচালনা করেছিলাম, সেই খাঞ্জাতে ব্যবহৃত সরঞ্জাম মাওলানা হামিদুল্লার মাধ্যমে সংগ্রহ করি। যেগুলো আমি ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি।

মহব্বত খান এবং খলিফা ভাইয়ের সাথে আমি মাওলানা হামিদুল্লার বাগানে চলে যাই। সেখানে আমরা তিনটি খাঞ্চা তৈরি করি। এতে আমাদের প্রায় এক ঘন্টা সময় ব্যয় হয়। আমরা খাঞ্চাকে নিরাপদ করার জন্য প্লাস্টিক সিট দিয়ে প্যাকেট করি। মাইনের তারের সাথে সংযুক্ত করার জন্য খাঞ্চার তারও নিরাপদে বাইরে বের করে রাখি। এবার আমাদের শুধু এই খাঞ্চাকে আগে থেকে বিছানো মাইনের সাথে ফিট করার কাজই বাকি ছিলো।আমরা কানাডিয়ান আর্মির যে কনভয়টিকে নিশানা বানানোর পরিকল্পনা করছিলাম, সেটি ৪টার সময় কান্দাহার ফিরে যাওয়ার কথা। আমরা যে তিনটি মাইন গম্বুজ টু সারখিল রোডে বিছিয়ে রেখেছিলাম, সেগুলো এক কিলোমিটারের ভেতরে উপযুক্ত দূরত্ব বজায় রেখে বিছানো ছিলো। কারো একার পক্ষে এটি শুধু মুশকিল নয় বরং অসম্ভব ছিলো যে, এই কড়া তল্লাশির মধ্যে খাঞ্চাকে মাইনের সাথে ফিট করে সে নিজে নিরাপদ থাকবে।

সুতরাং আমরা খাঞ্চাকে মাইনের সাথে সংযুক্ত করার জন্য এভাবে পরিকল্পনা করি যে, শেষ মাইনের সাথে আমি এবং আমার সাথে এই এলাকারই বাসিন্দা এক তালেবান থাকবে। মাঝখানের মাইনের সাথে মহব্বত খান খাঞ্চা ফিট করবে। শেষ মাইনের সাথে খলিফা ভাই খাঞ্চা ফিট করবে। কাফেলা কান্দাহার ফিরে যেতে আরো প্রায় ৪ঘন্টা বাকি ছিলো। এরই মধ্যে মাওলানা হামিদুল্লার ঘর থেকে খাবার চলে আসে। আমরা বাগানেই খাবার খাই। তারপর যোহরের ওয়াক্ত শুরু হতেই আমরা নামাজ আদায় করে নেই।

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমরা নিজ নিজ জায়গার দিকে যেতে প্রস্তুতি নেই। খাঞ্চা হাতে নিয়ে রওয়ানা দেয়ার মুহূর্তে মাওলানা হামিদুল্লাহ আসেন। তিনি যখন আমাদেরকে প্রস্তুত অবস্থায় দেখলেন, তখন তিনিও আমাদের সাথে খাঞ্চা ফিট করতে যেতে আগ্রহ পেশ করলেন। আমরা তার মর্যাদা, অবস্থান এবং তালেবানের প্রতি তার খেদমতের দিকে খেয়াল করে বললাম, আপনার যাওয়া উচিত হবে না। আপনি এই এলাকাতে থেকে মুজাহিদীনকে আশ্রয় এবং তাদের উপযুক্ত দেখভাল করছেন। তাই আপনার এভাবে খোলামেলা অভিযানে যাওয়া উচিত নয়। তিনি আমাদের কথা মেনে নেন।

আড়াইটার দিকে আমরা বাগান থেকে রওয়ানা হই। তখন আকাশে হেলিকপ্টার গর্জন করছিলো। সবাই অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে নিজ নিজ মাইনের নিকট পৌঁছে যাই। আমি এবং আমার সঙ্গী তালেবান মিলে মাইনের সাথে খাঞ্চা ফিট করে নিরাপদ জায়গায় চলে আসি। আমরা যেখানে ছিলাম সেখানে প্রচুর বড় বড় পাথর ছিলো। যেগুলোর মধ্যে খুব সহজেই লুকিয়ে যাওয়া সম্ভব। আমরা রোড

থেকে কিছুটা দূরে লুকানোকেই উপযুক্ত মনে করলাম। কারণ, রোড থেকে একটু দূরে হলে আমাদের ওয়ারলেস অল্প অল্প কাজ করতে থাকবে। আর তাতে আমরা কাফেলার নিকটে থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য সাথীদের সাথে যোগাযোগ করতে পারবো। তাছাড়া কানাডিয়ান আর্মির কনভয় আমাদের বিছানো মাইনের সাথে লেগে গেলে তাদের অনুভূতিহীন ফায়ারিং থেকেও নিরাপদ থাকতে পারবো। যখন আমরা নিরাপদ স্থানে পৌঁছে যাই তখন আমরা অন্যান্য সাথীদের সাথে যোগাযোগ করি। ততক্ষণে মহব্বত খান এবং খলিফা ভাই মাইনের সাথে খাঞ্চা ফিট করে নিরাপদ স্থানে চলে গেছেন। তারাও আমাদের মতো রোড থেকে একটু দূরে লুকিয়ে রোডের উপর গভীর দৃষ্টি রাখছিলেন। আমি মাইনের সাথে খাঞ্চা ফিট করে নিরাপদ জায়গায় চলে আসার পর ঘড়িতে চোখ রাখলে দেখি সাড়ে ৩টা বাজে। ফলে আমি বুঝতে পারি কানাডিয়ান আর্মি আসার আর মাত্র আধা ঘণ্টা বাকি আছে।

তখন থেকে পৌনে এক ঘণ্টা পর খলিফা ভাইকে আমার ওয়ারলেসে জ্যামিং টোন আসার কথা জানাই। আমি তাকে বলি, আধা ঘণ্টা অথবা তার চেয়ে কম সময়ের মধ্যে কনভয় আপনাদের নিকট পৌঁছে যাবে। তাই আপনাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে। কানাডিয়ান আর্মির কনভয় আপনাদের থেকে বেশি থেকে বেশি ৫০০ মিটার দূরত্বে হবে। আমি এই সংবাদ মহব্বত খানকেও ওয়ারলেসের মাধ্যমে জানি দেই এবং তাকেও সতর্ক থাকতে বলি। এরই মধ্যে খলিফা ভাই সংবাদ দেন, তিনি রোডের উপর কানাডিয়ান আর্মির কনভয় দেখতে পাচ্ছেন। যেটি কান্দাহারের দিকে দ্রুত এগিয়ে আসছে। সবার আগে একটি কানাডিয়ান ট্যাংক খুব দ্রুত তার দিকে এগিয়ে আসছে। এরই মধ্যে ওয়ারলেসে খলিফা ভাইয়ের কণ্ঠ কেটে কেটে আসছে। আমি বুঝতে পারলাম, কানাডিয়ান আর্মির কনভয় খলিফা ভাইয়ের নিকটে পৌঁছে গেছে। অল্প কিছুক্ষণ পর খলিফা ভাইয়ের সাথে পুনরায় যোগাযোগ হয়। তিনি বললেন, আমার পাশ দিয়ে কাফেলা নিরাপদে চলে গেছে। এর কারণ হল এখানকার রাস্তা প্রশস্ত। এবার কানাডিয়ান আর্মির কনভয় মহব্বত খানের মাইনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কানাডিয়ান আর্মির কনভয় সেখান দিয়েও নিরাপদে চলে যায়। আমাদের বিছানো মাইনের সাথে লাগেনি। এবার কানাডিয়ান আর্মির কনভয়ের রাস্তায় একমাত্র বাধা ছিলো আমাদের মাইনটি। আমি এবং আমার সঙ্গী তালেবান আল্লাহর দরবারে ইসলামের বিজয়, আমাদের কামিয়াবি এবং কুফরের ধ্বংসের দোয়া করতে থাকি। এরই মধ্যে কানাডিয়ান আর্মির কনভয় আমি দেখতে পাই। যাতে চারটি ট্যাংক, দু'টি লোহার কপাটবদ্ধ গাড়ি, একটি ফৌজি ট্রাক এবং

একটি জ্যামিং সিস্টেম জিপ ছিলো। এবার কাফেলা আমাদের মাইনের দিকে এগিয়ে আসছে। এখানে আমাদের কামিয়াবির খুবই আশাবাদী ছিলাম। কারণ, এখানে রোড একদমই সংকীর্ণ। এখানে একপাশে গর্ত এবং একপাশে গমের ক্ষেত ছিলো। কিন্তু এখানে ফৌজি কনভয় রোড দিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে গম ক্ষেত দিয়ে চলে যায়। এভাবে তারা আমাদের বিছানো মাইন থেকেও নিরাপদে চলে যায়। আমরা কিছুক্ষণ নিরাপদ জায়গাতেই অবস্থান করি। যখন ওয়ারলেস কাজ করতে শুরু করে তখন আমি সাথীদের সাথে যোগাযোগ করি এবং সবাইকে মাওলানা হামিদুল্লার বাড়িতে আসতে বলি। আধা ঘণ্টার মধ্যে সবাই মাওলানা হামিদুল্লাহর মেহমানখানায় একত্র হয়ে যাই। আমরা আজকের ব্যর্থতা নিয়ে ফিকির করতে থাকি। আসার সময় খাঞ্চা বের করে নিয়ে এসেছিলাম। যেগুলো তখন আমাদের সামনে পড়ে ছিলো।

আক্রমণে ব্যর্থ হওয়ার কারণসমূহ

আমরা মাওলানা হামিদুল্লার মেহমানখানায় বসে আজকের আক্রমণে ব্যর্থতার কারণ খুঁজতে গিয়ে সর্বপ্রথম যে কারণটি খুঁজে পাই তা হলো, আমাদের চিন্তা চেতনা এবং ভরসা আল্লাহ তায়ালার সাহায্য এবং সমর্থন হাসিল করার পরিবর্তে যুদ্ধাস্ত্রের প্রতি ছিলো। আমাদের ভাবনা ছিলো, আমরা আগে একটি মাইন বিছিয়ে ছিলাম কানাডিয়ানরা তার শিকার হয়েছে। আর আজ তিন তিনটি মাইন বিছিয়েছি, সুতরাং অবশ্যই তারা এগুলোর শিকার হবে। কিন্তু পরিস্থিতি এবং বাস্তবতা এ কথা প্রমাণ করলো যে, যদি আল্লাহ তায়ালার সমর্থন এবং সাহায্য না থাকে তাহলে সফলতা আসে না। তাই আমাদেরকে সরঞ্জামের পরিবর্তে আল্লাহর কুদরতের প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে। কারণসমূহের মধ্যে দ্বিতীয় কারণ ছিলো, কানাডিয়ান আর্মির কনভয় যেদিক দিয়ে যাচ্ছিলো সেদিককার রাস্তা যথেষ্ট প্রশস্ত ছিলো। তাই এটা আবশ্যক ছিলো না যে, আমরা যেদিক দিয়ে চাচ্ছিলাম কনভয় সেদিক দিয়েই যাবে। ব্যর্থতার আরো একটি কারণ এই ছিলো যে, রাস্তা প্রশস্ত থাকায় আমাদের খাঞ্চাকেও দীর্ঘ করা উচিত ছিলো। যাতে গাড়ি যেখান দিয়েই যায় আমাদের খাঞ্চার সাথে অবশ্যই লাগে এবং তাদের পরিণাম বরণ করে। ব্যর্থতার আরো একটি কারণ হলো, আমরা যেখানে কামিয়াবির বেশি আশা রেখে বসেছিলাম সেখানে যদিও রাস্তা সংকীর্ণ ছিলো কিন্তু গম ক্ষেত সমান থাকায় সেটি বিকল্প রাস্তার কাজ দিয়েছিলো। সেখানে আমরা খাঞ্চাকেও দীর্ঘ করতে পারতাম না আবার বিকল্প রাস্তাও বন্ধ করতে

পারতাম না। তাই মাইন বিছানোর সময় মুজাহিদীনের উচিত আবশ্যকীয়ভাবে এই বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ রাখা, যাতে সফলতা নিশ্চিত হয়।

নতুন আবিষ্কারের প্রশিক্ষণ

আমরা মাগরিবের নামাজ আদায় করার পর খাবার খাই। তারপর তৃপ্তি মিটিয়ে ফল খাই। দিনভর মেহনতের কারণে তখন ক্লান্তি অনুভব হচ্ছিলো। ঘুমের আধিক্যও অনুভব হচ্ছিলো। আমরা মাওলানা হামিদুল্লার বাড়িতেই ছিলাম। এশার নামাজের সময় হতেই আমরা নামাজ আদায় করি। আমাদের শোয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিলো মাওলানা হামিদুল্লার বাগানে। আমি, মহব্বত খান এবং খলিফা ভাই মাওলানা হামিদুল্লার সাথে তার বাগানে চলে যাই। বিছানায় লম্বা হতেই আমরা ঘুমের জগতে হারিয়ে যাই। ভোরে যখন মুয়াজ্জিনের আজান পরিবেশ আলোড়িত করছিলো, তখন আমাদের চোখ খোলে। আমরা ফজর নামাজ আদায় করে তেলাওয়াত থেকে ফারেগ হলে মাওলানা হামিদুল্লাহ নাশতা নিয়ে আসেন। আমরা নাশতা করি এবং মাওলানা হামিদুল্লার বাগানে পায়চারি করতে বের হই। আমার সাথে তখন খলিফা ভাই এবং মহব্বত খান ছিলেন। মাওলানা হামিদুল্লার বাগান অনেক বড়। বাগানের সবুজাভ সুঠাম গাছগুলো তার রক্ষণাবেক্ষণকারীর উপযুক্ত যত্নের প্রমাণ দিচ্ছে। বাগানে আঞ্জির, আনার এবং খুবানীর গাছ ছিলো। বাগানে পানি দেয়ার জন্য নিকটবর্তী এক ঝর্ণা থেকে পাকা ড্রেনের মাধ্যমে বাগান পর্যন্ত পানি পৌছার ব্যবস্থা করা আছে। সেখান থেকে ছোট ছোট নালার মাধ্যমে প্রত্যেক গাছে পানি পৌছে।

তালেবান মুজাহিদীনের মেহমানদারির জন্য মাওলানা হামিদুল্লাহ একটি পৃথক মেহমানখানা বানিয়ে রেখেছিলেন। তার বাগান রাস্তা থেকে দূরে নিরাপদ জায়গায় অবস্থিত। তাই তালেবান মুজাহিদীন অধিকাংশ সময় মাওলানা হামিদুল্লার এখানে থাকেন। তিনিও তালেবানের মেজবানীর দায়িত্ব হাসি মুখে খোলা মনে আদায় করেন।

আমি, মহব্বত খান এবং খলিফা ভাই একসাথে পায়চারি করার পর ফিরে আসি। মেহমানখানায় এসে ওয়ারলেসের মাধ্যমে তালেবান মুজাহিদীনের সাথে যোগাযোগ করি। আর মোল্লা আব্দুশ শুকুরের সাথে রেপিয়েটারের মাধ্যমে যোগাযোগ করার চেষ্টা করি, কিন্তু তার সাথে সংযুক্ত হতে পারিনি। কারী ফয়জুল্লার সাথে যোগাযোগ সম্ভব হয়। তিনি অবস্থা জেনে বললেন, আমি তোমাদের নিকট নিশ, মিঞাশিন, শাহ ওলিকোট, এবং খাকরিজ জেলার শিক্ষিত তালেবান মুজাহিদীনকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। তুমি তাদেরকে বারুদ, মাইন

বিছানো, রিমোট লাগানো এবং তুমি যেভাবে তোমার নতুন আবিষ্কারের মাধ্যমে কানাডিয়ান আর্মির কনভয়ে শানদার সফল আক্রমণ পরিচালনা করেছো, সেই পদ্ধতি আগত তালেবান মুজাহিদীনকে শিখিয়ে দেবে। যাতে তারাও তাদের নিজ নিজ এলাকায় গিয়ে আমেরিকান, কানাডিয়ান আর্মি এবং তাদের সম্মিলিত বাহিনীর বিরুদ্ধে পূর্ণ সফল আক্রমণ পরিচালনা করে তাদের আপন ঠিকানায় পাঠাতে পারে। যারা আফগানিস্তানে জুলুম, নির্যাতন, কুফর এবং জবর দখলের বাজার গরম করছে। যাতে দুনিয়াতে নিরাপত্তা, স্থিরতা এবং ইসলামী পরিবেশ ফিরে আসে। আমি কারী ফয়জুল্লাকে ভালো করে প্রশিক্ষণ দেয়ার নিশ্চয়তা দেই। কারী ফয়জুল্লাহ বলেন, তালেবান মুজাহিদীন আজ সন্ধ্যায় অথবা কাল সকাল নাগাদ তোমার কাছে পৌছে যাবে। এ কথা বলে কারী সাহেব সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেন। আমি মহব্বত খান এবং খলিফা ভাইয়ের সাথে মিলে মাওলানা হামিদুল্লার বাগানে আগত তালেবান মুজাহিদীনের জন্য জায়গা প্রস্তুত করি। মাওলানা হামিদুল্লার মাধ্যমে প্রশিক্ষণে ব্যবহারের জন্য সরঞ্জাম সংগ্রহ করি। যার মধ্যে মাইন বিছানোর জন্য খোদাইয়ের যন্ত্র, কাঠের টুকরো এবং খাঞ্চায় ব্যবহার করার সরঞ্জাম। মাগরিবের আগে মহব্বত খান ১৫ জন তালেবান মুজাহিদ আসার সংবাদ দেন। যারা মাওলানা হামিদুল্লার মেহমানখানায় পৌছে গেছে। আমরা মাগরিবের নামাজ আদায় করার পর তালেবান মুজাহিদীনরাও মাওলানা হামিদুল্লার সাথে বাগানে আমাদের কাছে পৌছে যায়। মাওলানা হামিদুল্লাহ সাথে করে খাবারও নিয়ে আসেন।

আমরা আগত তালেবান মুজাহিদীনের সাথে খাবার খাই। তারপর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি পর্বের পর তাদের সফর সম্পর্কে খোঁজ খবর নেই। ততক্ষণে এশার নামাজের সময় হয়ে যায়। নামাজ শেষ করে মেহমানদের ক্লান্তি এবং চোখে ঘুমের সাঁতার দেখে দ্রুতই তাদেরকে স্বপ্নের দেশে যাত্রা করতে দেই। যখন চোখ খোলে ততক্ষণে ফজরের সময় হয়ে গেছে। আমরা সবাই মিলে ফজর নামাজ আদায় করি। নামাজের ইমামতি করেন আগত মেহমান মুজহিদীনের মধ্যে একজন আলেম। তার সুললিত কণ্ঠের মধুর তেলাওয়াত এক অবাক করা স্বর্গীয় পরিবেশ সৃষ্টি করে। ফজর নামাজের পর আমরা নাশতা করি। তার ঘন্টা খানিক পর ক্লাস শুরু হয়। আগত সকল মেহমান নিজেদের প্রয়োজন সেরে খাতা-কলম নিয়ে সময় মতো ক্লাসে উপস্থিত হন। সেখানে কিছু সংখ্যক স্থানীয় মুজাহিদীনও অংশ নেন। আমরা বারুদের ধারণা দেয়ার পর বারুদ, মাইন এবং অন্যান্য বারুদ জাতীয় হাতিয়ার সম্পর্কে পরিচিতি পেশ করি। এখানে সবাই খুব মনোযোগের সাথে শরীক ছিলেন। আমাদের এই ক্লাস ১১টা পর্যন্ত চালু থাকে।

তারপর সাথীরা খাবার খেয়ে বিশ্রামের জন্য শুয়ে যান। কায়লুলা[১৩] করার পর যোহর নামাজের জন্য জাগ্রত হন। যোহর নামাজ আদায়ের পর সকল তালেবান পরস্পর গল্প গুজব করতে থাকেন। দ্বিতীয় দিনও সকাল সকাল ক্লাস শুরু করে দেই। দ্বিতীয় দিনও এই ক্লাস খুব জোরেশোরে চালু থাকে। সেখানে সকল সাথী খুব মনোযোগ এবং আগ্রহের সাথে অংশগ্রহণ করেন। সেদিন মাইন বিছানো এবং রিমোট কন্ট্রোল ব্যবহারের পদ্ধতি শেখানো হয়। মাইন বিছানোর গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, মাইন এমন জায়গায় বিছাতে হবে যেখানে রাস্তা সংকীর্ণ এবং সর্বাবস্থায় দুশমনকে আপনার বিছানো মাইনের উপর দিয়ে যেতে হয়। এমন জায়গায় কখনো বিছানো যাবে না যেখানে দুশমন অথবা দুশমনের কনভয় স্বাভাবিক পার্শ পরিবর্তন করে রাস্তার অপর পার্শ্বের খোলা জায়গা দিয়ে চলে যেতে পারবে। আর যদি মাইন এমন জায়গায় লাগাতেই হয় তাহলে এমন পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে যাতে আপনার টার্গেট অবশ্য শিকারে পরিণত হয়।

তাছাড়া এটিও গুরুত্বপূর্ণ যে, যেখানে আপনি মাইন বিছাবেন সেই রাস্তার এক পার্শ্বে উঁচু পাহাড় এবং অপর পার্শ্বে গর্ত হলে মাইন পাহাড়ের দিকে বিছাবেন। যেনো মাইন ব্লাস্ট হবার পর ট্যাংক, গাড়ি অথবা ফৌজি গাড়ি ধ্বংস হওয়ার সাথে সাথে তার ধাক্কায় নিচের গর্তে পড়ে যায়। এতে সর্বাধিক ক্ষতি হবে। এভাবে দ্বিতীয় দিনও এই ক্লাস ১১টা পর্যন্ত চালু থাকে। তৃতীয় দিনও ক্লাস সকাল সকাল নাশতার পর শুরু করে দেয়া হয়। আমি তালেবান মুজাহিদীনকে কানাডিয়ান আর্মির কনভয়ের ব্যাপারে তথ্য দেই। তাদেরকে বলি, তারা জ্যামিং সিস্টেমে ওয়ারলেসের কাজ করা বন্ধ করে দেয়। এতে পেরেশান হওয়ার প্রয়োজন নেই। কারণ, এতেও আল্লাহ তায়ালা আপনাদের জন্য কল্যাণ রেখেছেন। ওয়ারলেসে আগত জ্যামিং টোন আপনাদেরকে কানাডিয়ান আর্মির কনভয় আসা এবং কনভয় নিকটে পৌঁছে যাওয়ার সংবাদ দেয়। যার বিস্তারিত আলোচনা আমি এই পুস্তকের বিগত পৃষ্ঠাগুলোতে কানাডিয়ান আর্মির কনভয়ে রেকি এবং তালেবানের প্রচেষ্টা শিরোণামে করেছি।

যখন মেহমান তালেবান মুজাহিদীন এসব বিষয় বুঝলো এবং এ সম্পর্কে ধারণা লাভ করলো, তখন তারা অবাক হয়ে গেলো যে, কাফেররা কিভাবে নিজেদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে রেখেছে। কিভাবে তারা বড় বড় গাড়ি এবং ধ্বংস ও বিপর্যয়ের সরঞ্জাম তৈরি করছে। কিন্তু আল্লাহর সমর্থন এবং সাহায্যে তারা মুজাহিদীনের সামনে মাকড়সার জাল প্রমাণিত হচ্ছে। তারপর আমি তালেবান মুজাহিদীনকে খাঞ্জা সম্পর্কে ধারণা দেই। যে খাঞ্জার মাধ্যমে আমরা আল্লাহর

---

১৩. দিনের বেলা খাবারের পর সামান্য বিশ্রাম।

তাওফিক এবং সহায্যে কানাডিয়ান আর্মির বিরুদ্ধে শানদার সফল আক্রমণ করেছিলাম। যে আক্রমণ কানাডিয়ান আর্মিসহ আফগানিস্তানের দক্ষিণাঞ্চলের সম্মিলিত ক্রুসেডার বাহিনীর সকল সদস্যকে হয়রান করে দেয়। তারা ভাবতে বাধ্য হয় যে, সেটা আবার কোন ধরনের প্রযুক্তি! যার মাধ্যমে তালেবানরা কানাডিয়ান বিজ্ঞানীদের আবিষ্কৃত জ্যামিং সিস্টেম ব্যর্থ করে দিয়েছে? অথচ এই পদ্ধতি কানাডিয়ান আর্মি ২০টিরও বেশি দেশে পরীক্ষা করেছে। এমনকি সেটি এখনও জাতিসংঘের নিরাপত্তা বাহিনীতে শামিল হয়ে কানাডিয়ান আর্মি কয়েকটি দেশে তাদের জ্যামিং সিস্টেমের উপর অহংকার করছে।

কিন্তু যখন তালেবান মুজাহিদীনকে আমি এ বিষয়ে জ্ঞান দেই তখন তারা খুবই অবাক হয় যে, এই সাধারণ জিনিসের মাধ্যমে তালেবানরা আল্লাহর সাহায্যে কানাডিয়ান আর্মির অহংকার মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়। যখন মুজাহিদীনরা খাঞ্চা বানানো শিখে ফেলে তখন আমি তাদেরকে খাঞ্চা লাগানোর পদ্ধতি শিক্ষা দেই এবং এ কথাও বলে দেই যে, এ থেকে সাধারণ এবং পাবলিক গাড়িকে কিভাবে বাঁচাতে হবে।

আজ দুপুরের খাবারে মাওলানা হামিদুল্লাহ মেহমান মুজাহিদীনের জন্য শানদার দাওয়াতের ব্যবস্থা করেন। সজ্জিত দস্তরখানায় তিনি আফগানে প্রচলিত খাবারের ব্যবস্থাও পার্যপ্ত রাখেন। সেই শানদার দাওয়াতে এই প্রশিক্ষণ ক্লাস সমাপ্তির ঘোষণা দেয়া হয়। তারপর মেহমান মুজাহিদীন ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে থাকেন।

চুনারে যাত্রা

সেদিনই আসর নামাজের পর মোল্লা আব্দুশ শুকুর আমার সাথে যোগাযোগ করে কথাবার্তা বলেন। মোল্লা আব্দুশ শুকুর আমাকে বলেন, কিছু দিনের জন্য চুনার চলে আসুন। এখানে কিছু জরুরি কাজ রয়েছে। যখন মোল্লা আব্দুশ শুকুর আমাকে চুনার যাওয়ার জন্য বলেন, তখন আমিও সুযোগকে কাজে লাগাই। কারণ, আমি এই এলাকাতে একটি সফল আক্রমণ পরিচালনা করে ফেলেছি। তাছাড়া চুনার থেকে এসেছি বেশ কিছু দিন হয়েছে। তাই চুনারের সাথীদের সাথে সাক্ষাৎ করতে মন চাচ্ছিলো। খাকরিজের সাথীরা প্রশিক্ষণ ক্লাস শেষ করে যোহরের নামাজ আদায় করেই খাকরিজের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গিয়েছিলো। আমি পরের দিন সকালে ফজর নামাজ আদায় করার পর চুনার যাওয়ার জন্য রওয়ানা হই। তখন মহব্বত খান এবং খলিফা ভাই বলেন, আপনি তো চলে যাচ্ছেন, আবার কবে ফিরে আসবেন? আমি তাদেরকে খুব দ্রুতই ফিরে আসব

আশ্বাস দেই। তারা আরো বললো, আপনি আমাদেরকে বলে দিন আমরা কোন জায়গায় মাইন লাগাবো যাতে কানাডিয়ান আর্মির বিরুদ্ধে আরো একটি সফল আক্রমণ পরিচালনা করতে পারি। আমি মহব্বত খান এবং খলিফা ভাইকে বললাম, আপনারা শিন বসতির আগে যেখানে মোড় রয়েছে এবং রাস্তা কিছুটা সংকীর্ণ সেখানে মাইন ফিট করুন। সেখানে একদিকে নালা অপর দিকে বড় পাথর রয়েছে। এ জায়গাটি আক্রমণ পরিচালনার জন্য উপযুক্ত এবং নিরাপদ। আমি এই পরামর্শ এবং ধারণা দিয়ে তাদের থেকে দোয়া নিয়ে মাওলানা হামিদুল্লার বাগান থেকে শিন বসতির দিকে স্থানীয় এক সাথী নজিবুল্লার সাথে রওয়ানা হই।

যখন আমি শিন পৌঁছি তখন সকাল ৮টা। সেখানে মুসা খানের কাছে যাই। তার বাড়িতে আমার মোটর সাইকেল ছিলো। আমি খাওয়া-দাওয়া সেরে মোটর সাইকেল নিয়ে একাকী চুনারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। তখন বেলা ১১টা বেজে ছিলো। আমার সাথে আমার প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, কালাশনিকভ, ভিডিও ক্যামেরা ইত্যাদি ছিলো। আমি কাঁচা রাস্তা, পানির নালা ও জঙ্গলের ভেতর দিয়ে কখনো খুব ধীরে, কখনো দ্রুত পথ চলি। দুই থেকে আড়াই ঘণ্টা কঠিন রাস্তা দিয়ে মোটর সাইকেল চালিয়ে যখন খরতুত বসতির নিকটে পৌঁছি, তখন বসতির একটু আগে নূরুল্লাহ নামের এক তালেবানের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। আমি তার কাছে সামনের রাস্তা সম্পর্কে জানতে চাইলে সে বললো, গতকাল এখান দিয়ে আমেরিকান আর্মির এক বড় কনভয় গিয়েছিলো। তাদের সাথে প্রচুর সংখ্যক আফগান ন্যাশনাল আর্মির সদস্যও ছিলো। তারা এই এলাকায় বসতিগুলোতে তল্লাশি নিচ্ছে এবং তারা চুনারের দিকেই গিয়েছে। সে আমাকে বলল, সামনে সাবধানে যেতে হবে, রাস্তা দিয়ে যাতায়াতও সাবধানে করতে হবে। আর যদি বিপদ দেখেন তাহলে আমার কাছে ফিরে আসবেন। পেরেশান হওয়া বা নিজের জানকে পেরেশানিতে ফেলার কোনো দরকার নেই।

আমি তার এই সাহস যোগানো উপদেশ এবং আমার মতো বিদেশি মুজাহিদের সাথে এই মহব্বত ও বিশ্বাস প্রকাশ করার কারণে তার শুকরিয়া আদায় করি। আফগানিস্তানে সাধারণ মানুষের এই সহযোগিতা অনেক বড় জিনিস। যার কারণে ভিনদেশি ক্রুসেডার সৈন্যদের পেরেশানি এবং মসিবত দিন দিন বাড়তেই আছে। আর তালেবানরা দিন দিন প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। আমি নূরুল্লাহ থেকে বিদায় নিয়ে চুনারের দিকে রওয়ানা হয়ে যাই। যখন আমি একটু সামনে যাই তখন কনভয় যাওয়ার স্পষ্ট নিদর্শন দেখতে পাই। রাস্তার উপর ফৌজি গাড়ি, ট্যাংক এবং ফৌজি ট্রাকের নিদর্শনগুলো এ কথাই স্পষ্ট করছিলো যে, আমেরিকান

আর্মি এবং আফগান ন্যাশনাল আর্মির কনভয় রাস্তার উপর চলার পরিবর্তে রাস্তার সাথে সাথে কাঁচা জায়গা দিয়েও চলছিলো। তার একমাত্র কারণ, তালেবান মুজাহিদীনের রিমোট কন্ট্রোল আক্রমণ। সেসব আক্রমণ সম্মিলিত ক্রুসেডারদের দম নাকের ডগায় নিয়ে এসেছে। তাই তারা আজ রাস্তা এবং প্রশস্ত সড়ক রেখে উঁচু-নিচু এবং দুর্গম পথে চলতে বাধ্য হচ্ছে। আমি অল্প কিছু সফর করে উঁচু টিলার উপর উঠে সামনের রাস্তা দেখি তারপর আবার সফর করি। কোনো বসতি আসার আগে তার সম্পর্কে খোঁজ খবর নেই। এখানে আমেরিকান আর্মি অথবা আফগান ন্যাশনাল আর্মি তল্লাশি নিচ্ছে কি না– এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার পর আবার চুনারের দিকে সফর শুরু করি। এভাবে সতর্কতা এবং সাবধানতার সাথে পথ চলে আমি চুনার পৌছে যাই। চুনার পৌছে ওয়ারলেসে মোল্লা আব্দুশ শুকুরকে আসার সংবাদ দেই। আমি যখন চুনার পৌছি তখন যোহরের সময় ছিলো। আমি সোজা মোল্লা আব্দুশ শুকুরের বাগানের পথ ধরি। বাগানে পৌছে কূপ থেকে পানি উঠিয়ে অজু করি এবং যোহরের নামাজ আদায় করি।

অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে মোল্লা আব্দুশ শুকুর এবং আজমরে চলে আসেন। তাদের সাথে সানন্দে সালাম মুয়ানাকা করার পর আমরা মেহমানখানায় চলে যাই। বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা চলতে থাকে। তারপর আসর নামাজ আদায়ের পর আমরা মোল্লা আব্দুশ শুকুরের বাগানে বের হই। বাগানে তখন আনার এবং আঞ্জিরের গাছ ফলের ভারে ঝুঁকে ছিলো। আমরা আঞ্জিরের তাজা ফল ছিঁড়ি এবং একটি বড় গাছের নিচে বসে ফল খেতে থাকি। সেই সাথে কথাবার্তাও চলতে থাকে। এরই মধ্যে কফি তৈরি হয়ে চলে আসে।

নিশ জেলার আক্রমণের বিবরণ

আমি, আজমরে এবং মোল্লা আব্দুশ শুকুর বাগানে বসে কথাবার্তা বলছিলাম। আমি চুনারের অবস্থা এবং স্থানীয় সাথীদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করি। আজমরের অবস্থাও জানতে চাই। কারণ, আজমরে এক বিস্ফোরণে আহত হয়েছিলো। আজমরে বলল, আমি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ এবং জিহাদ ফি সাবিলিল্লায় নিয়োজিত। আমি মোল্লা আব্দুশ শুকুরের নিকট নিশ জেলার উপর আক্রমণের ব্যাপারে জানতে চাইলাম, এর ফলাফল কী হলো? আমি এই প্রশ্ন আচানক করিনি। পাঠকদের মনে থাকার কথা, যখন আমি কারী ফয়জুল্লার সাথে কানাডিয়ান আর্মির কনভয়ে হামলার জন্য শিন বসতিতে নিযুক্ত হই তখন অন্যান্য মুজাহিদীনকে নিশ জেলার উপর আক্রমণের জন্য হুকুম করা হয়েছিলো। যখন

আমি শিন রওয়ানা হই তখন মুজাহিদীন কারী ফয়জুল্লার নেতৃত্বে নিশ জেলার উপর আক্রমণ করতে প্রস্তুত ছিলো। যেখানে মোল্লা আব্দুশ শুকুর, মোল্লা আব্দুল হাকিম এবং মৌলভী বায মুহাম্মাদ ছিলেন। আমি তখনো পর্যন্ত এর ফলাফল সম্পর্কে অবগত ছিলাম না। তাই আমি মোল্লা আব্দুশ শুকুরের নিকট নিশ জেলার উপর হামলার ব্যাপারে জানতে চাই। নিশ জেলার উপর হামলার বর্ণনা শোনাতে গিয়ে মোল্লা আব্দুশ শুকুর বলেন, আমরা সর্বমোট ১৭ জন কারী ফয়জুল্লাহ সাহেবের নেতৃত্বে নিশ জেলার উপর আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হই। আমরা সকল সাথী আপনাদের একদিন পর আসর নামাজ আদায় করে সুড়সেক মুজাহিদীনের মারকাজ থেকে নিশ জেলার উপর আক্রমণের জন্য পায়ে হেঁটে রওয়ানা হই। আমাদের সাথে এই যুদ্ধে ব্যবহৃত অস্ত্রের মধ্যে গোলা-বারুদ এবং ফাস্টএইডের[১৪] সরঞ্জামও ছিলো। পায়ে হেঁটে যাওয়ার কারণ হলো, আমাদের এমন কোনো গাড়ি ছিলো না যার মধ্যে সবাই আরোহন করে এই গুরুত্বপূর্ণ কাজে রওয়ানা করতে পারি। আমাদের পরিকল্পনায় সিদ্ধান্ত ছিলো, দারাহনুর-এর নিকটতম বসতি, যেটি নিশ জেলারও নিকটে ছিলো সেখানে পৌঁছে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করবো। তারপর নিশ জেলার উপর হামলা করবো। যাই হোক, তালেবানরা পাহাড়ি নালা, দুর্গম পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে চলে নিজেদের গন্তব্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলো। এসব তালেবান মুজাহিদীন ফি সাবিলিল্লাহ ইসলামের বিজয়ের চেতনা এবং জিহাদ ফি সাবিলিল্লার দায়িত্ব আদায় করতে দুনিয়া থেকে বিমুখ হয়ে আপন মঞ্জিলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলো। তাদের অনেকেই এই আশায় গোসল করেছিলো যে, তারা শহীদ হবে। যাদের সুযোগ হয়েছে খুশবু লাগিয়েছে। কারণ, এই মুজাহিদীন এই যুদ্ধের ভালো-মন্দে শরীক হওয়ার জন্য যাচ্ছিলো। শাহাদাতের লটারিতে যে কারো নাম উঠতে পারে। সকল তালেবানের একিন ছিলো এবং এখনো আছে, ইনশাআল্লাহ আফগানিস্তান আজাদ হবে আর বিশ্ব কুফর এখান থেকে লেজ গুঁটিয়ে পালাবে। আর এই তালেবান কয়েকটি দিন, মাস কিংবা বছর নয়, গোটা জিন্দেগি ইসলামের বিজয় এবং শরীয়ত প্রতিষ্ঠার জন্য ওয়াক্‌ফ করে ঘর থেকে বের হয়েছিলো। এই দৃঢ় সংকল্প আপন জবান হতে উচ্চারণ করছিল–

آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش
اور ظلمت شب کی سیماب پا ہو جانے گی

---

[১৪]. জখমিদের প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত মেডিক্যাল সরঞ্জাম বা প্রাথমিক চিকিৎসায় ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র।

دیکھ لوگی سطوت رفتار دریا کا حال
موج مضطر ہی اسے زنجیر پا ہو جائے گی
نالہ صیاد سے ہوں گے نوا ساماں طیور
خون گلچیں سے کلی رنگین قبا ہو جائے گی
شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے
یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے

ভোরের আলোয় আসমান আয়না হবে
আর রাতের আঁধার পারদ হয়ে যাবে।
দেখে নিও দ্রুত ধাবমান দরিয়ার হাল
উত্তাল ঢেউ-ই হবে তার পায়ের শিকল।
শিকারীর নালি থেকে সুরেলা পাখি সৃজিবে
মালির রক্তে কলি রঙ্গীন আলখেল্লা হয়ে যাবে।
রাত্রি পালিয়ে যাবে অবশেষে সূর্যের আলোতে
এই বাগিচা আবাদ হবে তাওহীদের সংগীতে।

মোল্লা আব্দুশ শুকুর আরো বলেন, আমরা মাগরিবের নামাজ রাস্তায়ই আদায় করি। তারপর মঞ্জিলের দিকে সফর অব্যহত রাখি। সাথীরা এই দুর্গম পাহাড়ি পথের বাঁক এবং উঁচু-নিচু পথ পাড়ি দিয়ে নব উদ্যমে পথ চলছিলো। অর্ধেক রাত পর্যন্ত তালেবান মুজাহিদীনরা তাদের সফর জারি রাখে। যারফলে সাথীরা খুব ক্লান্তির শিকার ছিলো। কারী ফয়জুল্লাহ সাহেব সাথীদেরকে এক জায়গায় থামতে বলেন। আমরা যেখানে অবস্থান নেই সেখান থেকেও দাররাহনুরের দুরত্ব ৬ ঘণ্টা পায়ে হাঁটার পথ।

جس قدر تھکتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں قدم
اعتبار قرب منزل اور بڑھتا جائے ہے
পায়ে যত ক্লান্তি ক্লেশ অনুভব হয়
মঞ্জিলের নৈকট্য তত বেড়ে যায়।

সাথীরা যখন কিছুক্ষণ আরাম করলো তখন কারী ফয়জুল্লাহ সাহেব সাথীদের কয়েকজনকে খোলামেলা আরামদায়ক জায়গা এবং পানি তালাশ করতে পাঠিয়ে দিলেন। আধা ঘণ্টা পর সাথীরা ফিরে আসে এবং কারী ফয়জুল্লাহ সাহেবকে খোলামেলা নিরাপদ জায়গার সংবাদ দেয়। যার পাশেই পানির ঝর্ণাও ছিলো।

কারী ফয়জুল্লাহ সাহেব মৌলভী বায মুহাম্মাদ সাহেবকে সেই জায়গাটি পরিদর্শন করতে পাঠান। তিনি যাওয়ার পর কারী সাহেবও মোল্লা আব্দুল হাকিম সাহেবকে সাথে নিয়ে সেই জায়গা পরিদর্শন করেন। তারপর সাথীদেরকে সেখানে যাওয়ার হুকুম দেন। সকল তালেবান মুজাহিদীন সেই খোলামেলা পরিষ্কার জায়গায় চলে যায়। সাথীরা এশার নামাজ আদায় করে। তারপর কারী সাহেব সাথীদেরকে পাহারার পালা ঠিক করে দিয়ে বাকি সফর শেষ রাত পর্যন্ত মুলতবি ঘোষণা করেন। এরপর তালেবান মুজাহিদীন ফজর নামাজের দুই ঘণ্টা আগে জাগ্রত হয়। তারা তাদের সরঞ্জাম, অস্ত্রসস্ত্র, গোলা-বারুদ সামলে নিয়ে সফর শুরু করে। দুই ঘণ্টা সফর করার পর রাস্তায় ফজর নামাজ আদায় করে। তারপর আবার সফর শুরু করে। সকাল ৮টার দিকে সাথীরা দাররাহনুর বসতির কাছাকাছি পৌঁছে। এখানে কারী সাহেব সাথীদেরকে বিভিন্ন টিলা ও পাহাড়ে লুকিয়ে থাকতে বলেন এবং পরস্পরে ওয়ারলেসের মাধ্যমে যোগাযোগ রাখতে বলেন। এই পাহাড় থেকে বের হয়ে সামনের সফর ছিলো খোলা ময়দানে। আমরা আমাদের টার্গেটের একদমই নিকটে পৌঁছে গিয়েছিলাম। দিনের আলোতে খোলা জায়গায় এভাবে আমাদের নড়াচড়া দুশমনকে আমাদের দিকে মনোযোগী করতে পারে। ফলে এটি আমাদের জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। তাছাড়া সাথীরা খুবই ক্লান্ত ছিলো। কারণ, গতকালের ১২ ঘণ্টা এবং আজ ৬ ঘণ্টার ধারাবাহিক সফরের পর আমরা এখানে পৌঁছে ছিলাম। কিন্তু তাদের প্রবল ইচ্ছা তখনো সুউচ্চ ছিলো। কারণ, জিহাদের রাস্তায় পথের এই কষ্টগুলোও উৎসাহ যোগাচ্ছিলো আর বলছিলো–

کچھ تقاضائے جنون جستجو یہی دل میں ہے
کیا کشش ورنہ، طلسم جادہ و منزل میں ہے

কিছু পাগলামি পুষেছি, কিছু দাবি ছিলো দিলে
হয়তো প্রেম নয়তো বিস্ময়, পেয়ে যাবো মঞ্জিলে।

দাররাহনুর পার হওয়া

মোল্লা আব্দুশ শুকুর বলেন, তালেবান মুজাহিদীনকে দাররাহনুরের কিছু আগেই থামিয়ে রাখা হয়েছিলো। উদ্যেশ্য ছিলো, ময়দান থেকে পাহাড়ের মাঝখানের গিরিগুহা সাদৃশ এই দাররাহনুরকে রাতের আঁধারে পাড়ি দেয়া দেয়া হবে। তাছাড়া সামনের অবস্থা সম্পর্কে পরিপূর্ণভাবে অবগত হওয়া দাররাহনুরের সামনের বসতিতে থাকা স্থানীয় তালেবান এবং গোয়েন্দাদের উপর নির্ভর

করছিলো। কারণ, নিশ জেলার পূর্ণ গোয়েন্দা তথ্য যোগানোর দায়িত্ব তাদের উপরই ন্যস্ত ছিলো। তালেবান মুজাহিদীন সেই পাহাড়ে তাদের সাথে থাকা রেশন পাকিয়ে সাথীদের খাবারের ব্যবস্থা করে। আমরা যোহর এবং আসর নামাজ সেখানেই আদায় করি।

ততক্ষণে দাররাহনুরের পাশের বসতিতে থাকা স্থানীয় তালেবানরা কারী সাহেবের কাছে এসে গেছেন। তারা সামনের অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দিলেন। মাগরিবের পর দ্রুত সাথীরা একত্রিত হয় এবং নিরাপত্তার খাতিরে ছোট ছোট গ্রুপে স্থানীয় রাহবরের সাথে বসতির দিকে রওয়ানা হয়। এভাবে সকল তালেবান নিরাপদে নিশ জেলার নিরাপত্তা দ্বার ও সংকীর্ণ গিরিপথ; দাররাহনুর পার হয়ে নিশ জেলার সামনের বসতিতে পৌঁছে যায়। তালেবানদেরকে খাবার খাওয়ার জন্য বিভিন্ন ঘরে ভাগ করে দেয়া হয়। তারা এশার নামাজ আদায় করে এবং বসতির নিরাপত্তার জন্য স্থানীয় সাথীদের সাথে মেহমানরাও পাহারাদারিতে নিযুক্ত হয়। তাদেরকে বলে দেয়া হয়েছিলো, তোমরা দুশমনের একদমই নিকটবর্তী, তাই সাবধানতা অবলম্বন করবে। সর্বদা সতর্ক থাকবে এবং অস্বাভাবিক কোনো নড়াচড়া বা হৈচৈ দেখলে তাৎক্ষণাৎ তা অবগত করবে। তারপর আমি, কারী ফয়জুল্লাহ সাহেব, মোল্লা আব্দুল হাকিম, মৌলভী বায মুহাম্মাদ, মোল্লা হায়দারী এবং অন্যান্য স্থানীয় তালেবান এক সাথে একটি ঘরে পরামর্শ ও আগামী পরিকল্পনা নির্ধারণের জন্য একত্র হই, যাতে নিশ জেলার উপর রাতে আক্রমণের পূর্ণ রণকৌশল নির্ধারণ করতে পারি।

ঘেরাওয়ে তালেবান

মোল্লা আব্দুশ শুকুর নিশ জেলার উপর আক্রমণের বর্ণনা করতে গিয়ে আরো বলেন, মেহমান তালেবানরা স্থানীয় তালেবানের সাথে বিভিন্ন ঘরে খাওয়াদাওয়া এবং অন্যান্য প্রয়োজনাদি সেরে গল্পগুজব করছিলো। বসতির বাইরে পাহারায় নিযুক্ত মুজাহিদীনও সতর্ক ছিলো। আমাদের পাহারাদাররা আমাদের বসতির দিকে একটি গাড়ি আসতে দেখে। গাড়িটি বসতির পিছনে, যেখানে বসতির দিকে চলে আসা রাস্তা থেকে অন্য একটি রাস্তা দাররাহনুরের দিকে চলে গেছে, সেখানে দাঁড়িয়ে যায়। সেটি পাহাড়ে যাওয়ারও পথ। সেই রাস্তা দিয়ে মানুষ পায়ে হেঁটে দাররাহনুরের উপর পর্যন্ত চলে যায়। আমাদের পাহারাদাররা গাড়ির দিকে বিশেষ কোনো মনোযোগ দেয়নি। কারণ, সন্ধ্যার দিকে শহর থেকে গ্রামের দিকে গাড়িগুলো এসেই থাকে। কিন্তু বাস্তবে গাড়িটি এমন কোনো সাধারণ বা পাবলিক গাড়ি ছিলো না, যেগুলো সারা দিন শহরে মজদুরি করার

পর সন্ধ্যায় গাঁয়ে ফিরে আসে। বরং সেটি ছিলো ফৌজি গাড়ি। তাও শুধু একটি নয়, ৭-৮টি গাড়ি ছিলো। গাড়িগুলোর সবার সামনেরটির লাইট জ্বলছিলো। বাকিগুলোর লাইট বন্ধ ছিলো। এগুলোতে আফগান ন্যাশনাল আর্মির সদস্যরা ছিলো। তারা সেখানে নেমে পায়ে হাঁটার রাস্তা দিয়ে দাররাহনুরের উপরে উঠে এ্যাম্বুশ করতে যাচ্ছিলো। কারণ, দুশমনরা আমাদের এখানে আসার আগেই খবর পেয়েছিলো এবং তারা পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়েই এসেছিলো। তারা এই বসতিকে এমনভাবে ঘেরাও করেছে যে, তাদের সাথে যখন তালেবানের লড়াই হবে তখন তালেবানরা বাধ্য হয়ে দাররাহনুরের দিকে চলে যাবে। এভাবে দুশমনরা আমাদের এবং আমাদের পাহারাদারদের দৃষ্টি এড়িয়ে বসতি এবং নিকটবর্তী পাহাড়সহ দাররাহনুরকেও ঘেরাও করে ফেলে। তারপর আফগান ন্যাশনাল আর্মির সদস্যরা যখন বসতির দিকে আসে তখন বসতির বাহিরে আমাদের পাহারাদাররা তাদেরকে থামিয়ে দেয়। তারা জবাব দিলো, আমরা আপনাদেরই লোক। তালেবান পাহারাদাররাও খুব বেশি জিজ্ঞাসাবাদ করেনি। কারণ, তালেবানেরও কয়েকটি গ্রুপ সেখানে ছিলো। তাদেরকে চেনাও মুশকিল ছিল। তাছাড়া অন্ধকারও ছিলো খুব, হাত পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিলো না। এভাবে দুশমনরা আমাদের সাথীদের মাঝখান দিয়ে চলে যায় এবং মূল রাজপথও দখলে নিয়ে নেয়। তখন তিন দিক থেকে আমাদের বসতি ঘেরাও করা হয়ে গিয়েছিলো। যে রাস্তাটি দাররাহনুরের দিকে চলে গেছে কেবল সেদিকটিই খালি ছিলো। সেখানে তারা আগেই ওত পেতে বসেছিলো। এসব কার্যকলাপের কোনো খবরই আমাদের ছিলো না। যার কারণে আমরা ছিলাম নিশ্চিন্ত।

রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ

মোল্লা আব্দুশ শুকুর বলেন, তালেবান মুজাহিদীন খাওয়া-দাওয়া, বিশ্রাম এবং অন্যান্য প্রয়োজন সেরে একটু ফুরফুরে হয়েছিলো। এরই মধ্যে কারী ফয়জুল্লাহ সাহেব মুজাহিদীনকে এক জায়গায় জমা হতে বলেন। তালেবানরা এক জায়গায় জমা হচ্ছিলো। বসতির তিনদিক থেকে আচানক ফায়ারিং শুরু হয়ে যায়। সেই সাথে রকেটের গোলাও নিক্ষেপ করতে থাকে। তুমুল ফায়ারিং এবং রকেটের গোলার আওয়াজে কোনো কিছু শোনা যাচ্ছিলো না।

কারী ফয়জুল্লাহ সাহেব, মৌলভী বায মুহাম্মাদ, মোল্লা আব্দুল হাকিম এবং আমি সেখানেই ছিলাম। এই অনাকাঙ্ক্ষিত অবস্থা এবং দুশমনের এই আক্রমণাত্মক পদক্ষেপের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিতে কারী ফয়জুল্লাহ সাহেব তালেবানকেও ফায়ারিং করতে হুকুম দেন।

বসতিতে তালেবান মুজাহিদীন এবং আফগান ন্যাশনাল আর্মির গুহাদের মধ্যে তুমুল লড়াই চলছে। তালেবান কমান্ডার যখন দেখলেন দুশমান পিছু হটতে রাজি নয় এবং আগে থেকেই বসতি ঘেরাও করে আড়ালে পজিশন নিয়ে বসে গেছে, তখন এভাবে বসতিতে যুদ্ধ করলে তালেবান ও স্থানীয় জনগণের বেশি ক্ষতি হবে, তাই তালেবানকে বসতির গলিগুলোতে পজিশন নিয়ে যুদ্ধ করতে হুকুম দেন। কারী সাহেব তালেবানকে দাররাহনুরের দিকে পিছু হটতে বলেন। তারা দুশমনের সাথে যুদ্ধ করতে করতে প্রতিরক্ষার খাতিরে দাররাহনুরের দিকে পিছু হটতে শুরু করেন। অবস্থাটা এমন ছিলো যে, সবদিক থেকে আমাদের উপর গুলি বর্ষিত হচ্ছিলো। আমাদের উপর রকেটও নিক্ষেপ করা হচ্ছিলো। তুমুল লড়াই চলছে। তা সত্ত্বেও তালেবান মুজাহিদীন বীরত্ব এবং অটলতার পাহাড় হয়ে দুশমনের জবাব দিচ্ছে। সকল তালেবান গুলি এবং বারুদের বৃষ্টির মধ্যে নিজের প্রতিরক্ষা করতে করতে যখন দাররাহনুরে পৌঁছে, তখন চতুর দুশমনের জালে পুরোই ফেঁসে যায়। যারফলে দাররাহনুরে তালেবানকে নিশ জেলার সবচেয়ে রক্তাক্ষয়ী যুদ্ধ করতে হয়। আফগান ন্যাশনাল আর্মির হিংস্র সদস্যরা সম্মিলিত ক্রুসেডারদের মদদপুষ্ট হয়ে তাদের আমলনামা কালো করতে এখানে এসেছে। তারা দাররাহনুরে ওত পেতে বসে ছিলো। যখনই তালেবান দুশমনদেরকে ক্রস করে পাহাড়ে আশ্রয় নিতে দাররাহনুরে প্রবেশ করে, তখনই আগে থেকে মজবুত অবস্থানে পজিশন নিয়ে ওত পেতে থাকা আফগান ন্যাশনাল আর্মির সদস্যরা তালেবানের উপর তুমুল ফায়ারিং শুরু করে। তালেবানরা খোলা জায়গায় আকাশের নিচে অবস্থান করছিলো আর দুশমন ছিলো পাহাড়ে। তাছাড়া ছোট ছোট টিলা এবং পাহাড় তালেবানের থেকে প্রায় ৫০০ মিটার দূর থেকে শুরু হয়েছে।

আফগান ন্যাশনাল আর্মির সদস্যরা রকেটের গোলা নিক্ষেপ করছিলো। কিন্তু ধৈর্যের এমন উপমা হয়ে তালেবান মুজাহিদীন এবং তালেবান কমান্ডাররা সেই ঐতিহাসিক শানদার যুদ্ধে লড়তে থাকে যে, তালেবানের সাহসিকতা, বাহাদুরি, বীরত্ব এবং দৃঢ়তা দেখে দুশমনরাও পেরেশান হয়ে যায়। মুজাহিদীনও হক বাতিলের এই লড়াইয়ে আপ্রাণ লড়ে যাচ্ছিলেন।

سرور جو حق و باطل کی کارزار میں ہے

تو حرب و ضرب سے بیگانہ ہو تو کیا کیجے

আনন্দ এটাই যে, হক বাতিলের লড়াইয়ে আছে
তুমি যুদ্ধ ও আঘাত সম্পর্কে অজ্ঞ তো কী হয়েছে।

তালেবানরা বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত হয়ে দুশমনদেরকে হয়রান করছিলো। দুশমনরা সঠিক অনুমান করতে পারছিলো না যে, তালেবানের মূল শক্তি কোন দিকে। কখনো দাররাহনুরের সামনে থেকে ফায়ারিং হচ্ছে, কখনো দাররাহনুরের সামনের অন্য কোনো জায়গা থেকে ফায়ারিং হচ্ছে। এরই মধ্যে তালেবানের একটি ছোট গ্রুপ দুশমনের সামনের পাহাড় পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তাদের ফায়ারিং ওত পেতে থাকা দুশমনদেরকে খুব পেরেশান করছে। এক পর্যায়ে দুশমন সেখান থেকে পিছু হটতে বাধ্য হয়। এভাবে দাররাহনুরের রাস্তা খুলে যায়। এই সুযোগে দাররাহনুরের সামনের তালেবানরা দাররাহনুরে ঢুকে যায় এবং নিরাপদে দাররাহনুর পার হয়ে পাহাড়ে তাদের অবস্থান মজবুত করে নেয়। তখন রক্তাক্ত যুদ্ধ চলছিলো। মৌলভী বায মুহাম্মাদ এবং কারী সাহেব একদিকে বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করছিলেন অপরদিকে মুজাহিদীনকে সামলে রাখছিলেন। আর মোল্লা আব্দুল হাকিম তো দুশমনের জন্য আল্লাহর গজব হয়ে ভেঙ্গে পড়ছিলেন। তিনি তার কালাশনিকভ অন্য একজনকে দিয়ে তার কাছ থেকে জারকাই নিয়ে ফায়ারিং শুরু করেন। মোল্লা আব্দুল হাকিম নীরব স্বভাব, নম্রভাব, সরলতা, আন্তরিকতা এবং প্রাচ্যের কবির মরদে মুমিনের ছবি হয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন–

ہو حلقۂ یاراں تو بریشم کی طرح نرم

رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن

বন্ধুমহলে তুমি রেশমের মতো নরম
হক বাতিলের যুদ্ধে তুমি ইস্পাত-কঠিন মুমিন।

প্রাচ্যের কবি মরদে মুমিনের যে মনোমুগ্ধকর গুণ গেয়েছেন, এখানে তারও বাস্তব প্রদর্শনী চলছিলো। তারা দুশমনের উপর এমনভাবে ফায়ারিং করছিলো যে, মনে হচ্ছে গায়রুল্লার আবর্জনাকে অগ্নিশিখা হয়ে জ্বালিয়ে দিতে চাচ্ছেন।

شعلہ بن کر پھونک دے خاشاک غیر اللہ کو

خوف باطل کیا کہ ہے غارت گر باطل بھی تو

গায়রুল্লার আবর্জনাকে স্ফুলিঙ্গ হয়ে ফুৎকার দাও
কিসের বাতিলের ভয়, এরা তো বাতিল আবার লুটেরাও।

যখন সাথীরা দাররাহনুর ক্রসিং করছিলো তখন মোল্লা আব্দুল হাকিমও তাদের সাথে সবার আগে ছিলেন। এরই মধ্যে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে দুশমনদের কয়েকটি গুলি মোল্লা আব্দুল হাকিমের পায়ে লাগে এবং তিনি জখমি হয়ে পড়ে যান। তখন তার সাথে আমি এবং আরো তিনজন তালেবান সাথী ছিলাম। আমরা চারজন মিলে মোল্লা সাহেবকে উঠিয়ে দাররাহনুর থেকে নিরাপদে বের হয়ে

আসি। তখনও দাররাহনুরে ফায়ারিং চলছে। কিছু তালেবান ওত পেতে থাকা আফগান ন্যাশনাল আর্মির সদস্যদের জবাব দিতে থাকে এবং কিছু তালেবান দাররাহনুর থেকে বের হতে থাকে। এই রক্তাক্ত যুদ্ধ এক ঘণ্টা পর্যন্ত চলে। রক্তক্ষয়ী এই যুদ্ধে তালেবানরা এতো পরিমাণ ফায়ারিং করে যে, আমাদের জারকাইয়ের ব্যারেল আগুনে গরম হয়ে ফেটে যায়। কিছু সাথীর গান বন্ধ হয়ে যায়। তাছাড়া এক সাথীর জারকাইয়ের ব্যারেল গরম হয়ে বেঁকে যায় এবং তার মধ্যে গুলি আটকে যায়। এই যুদ্ধের পর যখন সাথীরা একত্রিত হয়, তখন জানা যায় আটজন সাথী নিখোঁজ এবং মোল্লা আব্দুল হাকিম জখমি। কিন্তু তার জখমি হওয়ার কথা আমি, কারী সাহেব এবং সেই তিন সাথী জানতেন। অন্য তালেবানদেরকে তার জখমি হওয়ার কথা জানানো হয়নি। যাতে হক বাতিলের এই লড়াইয়ে জখমি হওয়ার গুজবে মুজাহিদীনের মনোবল ভেঙ্গে না যায়। এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে দুশমন তাদের হুঁশিয়ারি, চালাকি এবং সংখ্যাধিক্যের পরও ব্যর্থ হয়। কারণ, তালেবানরা আল্লাহর তাওফিকে নিজেদের রণকৌশলে ফায়ারিং করে দুশমনের বোধশক্তিকেই পেরেশান করে রাখে। দুশমনরা কখনো এদিকে কখনো ওদিকে ফায়ারিং করছিলো। আর তাদের রকেটের গোলা কখনো পাহাড়ে কখনো খোলা ময়দানে আছড়ে পড়ে টুকরো টুকরো হতে হচ্ছিলো।

پھر افضاؤں میں کرگس اگرچہ شاہین وار

شکار زندہ کی لذت سے محروم رہا

আকাশে যখন বাজ ও চিলের যুদ্ধ শুরু হয়
শিকার জীবিত থাকার স্বাদ থেকে বঞ্চিত হয়।

গোলার এই প্রবল বর্ষণে যখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই সুসংবাদ মনে পড়ে তখন নব উদ্যমতায় অবস্থা অন্যরকম হয়ে যায়। আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই ফরমান অন্য সাথীদেরকেও শোনাই–

وَاعْلَمُوْا اَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوْفِ.

আর তোমরা জেনে রেখো জান্নাত তরবারীর ছায়ার নিচে।
[সহীহ মুসলিম, কিতাবুল জিহাদ/১৭৪২]

নিখোঁজ সাথীদের খোঁজে

রাতের গভীর আঁধার, রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ এবং দুশমনদের নিকটবর্তী এলাকাতে অবস্থান পরিস্থিতিকে আরো কঠিন করে তুলছিলো। নিখোঁজ সাথীদের তালাশ

করাও জরুরি ছিলো। ওয়ারলেসে সাথীদের আওয়াজ শোনার চেষ্টা করি। বিভিন্ন নম্বরে যোগাযোগ করলে চারজন সাথীর সাথে যোগাযোগ হয়ে যায়। তারা তাদের নিকটবর্তী অন্য একটি নিরাপদ স্থানে পৌঁছে গেছে বলে জানান। অপর তিন সাথী নিজে নিজেই চলে আসেন। কিন্তু শায়েস্তা খান নামে এক সাথীর সাথে ওয়ারলেসেও কোনো যোগাযোগ হয়নি, সে নিজে নিজেও আসেনি। সাথীরা শায়েস্তাখানের ব্যাপারে খুব পেরেশান ছিলো। ততক্ষণে সকল তালেবান নিরাপদ জায়গায় চলে আসে। পরের দিনও শায়েস্তা খান আসেননি। তার পরের দিন শায়েস্তা খান নিকটবর্তী এক বসতিতে পৌঁছেন। সাথীরা এখানে খাবার আনতে গেলে তাদের সাথে শায়েস্তা খানের সাক্ষাৎ হয় এবং তাকে নিয়ে আসেন। তিনি জানান, দাররাহনুরে যখন রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ চলছিলো তখন তিনি দাররাহনুরে ক্রস করে সামনের পাহাড়ে উঠে যান। তারপর ফায়ারিং থেকে বাঁচার জন্য আড়াল নিয়ে বসে থাকেন। এরই মধ্যে তার উপর ঘুম চেপে বসে। সকালে যখন চোখ খুলে তখন তার একটু দূরেই আফগান ন্যাশনাল আর্মির সদস্যরা ঘুমিয়ে ছিলো। নিচে দাররাহনুরে তাদের ৮-১০টি ট্রাক দাঁড়ানো ছিল। যেখানে সৈন্য সংখ্যা ছিল প্রায় ৩০০-এর মতো। আমি সেখান থেকে চুপি চুপি বের হয়ে নিকটবর্তী বসতিতে পৌঁছে যাই। তারপর তালেবানরা আমাকে এখানে নিয়ে আসেন।

মোল্লা আব্দুল হাকিমের শাহাদাত

মোল্লা আব্দুশ শুকুর বলেন, যখন আমরা মোল্লা আব্দুল হাকিমকে নিয়ে দাররাহনুর থেকে বের হই তখন খুব গতিতে তার রক্তক্ষরণ হচ্ছিলো। আমরা তাকে একটি বড় চাদরে রেখে নিয়ে যাচ্ছিলাম। অল্প কিছুদূর যাওয়ার পর তাকে একটি নিরাপদ জায়গায় শুইয়ে দেই এবং তার জখমে পট্টি লাগাই। আমরা সবাই তালেবান মুজাহিদীনের সাথে উপস্থিত। মোল্লা আব্দুল হাকিম সাহেবের জখম খুব গভীর ছিলো। তার পায়ের হাড় ভেঙ্গে গেছে এবং বড় রগগুলোও কেটে গেছে। যার কারণে খুব রক্ত ঝরছিলো। আমরা স্থানীয় বসতিতে থেকে গাড়ি নেই এবং দ্রুত চুনারের দিকে রওয়ানা হই। সেখানে চিকিৎসার সুব্যবস্থা ছিলো। আমরা অর্ধেক পথ অতিক্রম করতেই মোল্লা আব্দুল হাকিমের কালেমা পড়ার হালকা আওয়াজ শুনতে পাই। আমরা থেমে তার দিকে তাকিয়ে দেখি তার আত্মা জানকবজকারীর হাতে সোপর্দ করে দিয়েছেন। শাহাদাতের সময় তার চেহারা ছিলো খুবই সুন্দর। চেহারা জুড়ে মুচকি হাসি ছড়িয়ে ছিলো। এমন

একটা প্রাশান্তি তার চেহারায় ছড়িয়ে ছিলো, যেনো এখনই বিশ্রামের জন্য ঘুমিয়েছেন।

আমরা চুনার পৌঁছে গাড়ি পরিবর্তন করি এবং শহীদকে খরতুতে গোলাব খানের কাছে নিয়ে যাই। গোলাব খানের বাড়ির পাশে এবং খরতুতের বাইরে একটি কবরস্থান আছে। আমরা কবর খনন করি এবং মোল্লা আব্দুল হাকিমকে কাউকে না জানিয়ে দাফন করে দেই। তার শাহাদাতকে গোপন রাখার কারণ হলো, কিছুদিন আগে আমেরিকান সৈন্যরা তার মাথার মূল্য ঘোষণা করেছিলো। আমাদের শঙ্কা ছিলো, এতে আমেরিকানদের মনোবল বেড়ে যাবে এবং তালেবানের মনোবল ভেঙ্গে যেতে পারে। মোল্লা আব্দুল হাকিমের মতো একজন ভালো আলেম এবং মুজাহিদ ফি সাবিলিল্লাহ এমনিভাবে সকলের অজান্তে আপন রবের দরবারে হাজির হয়ে যান। ফলে মুসলিম উম্মাহ আরো একজন ভালো আলেম থেকে বঞ্চিত হয়।

আমেরিকানদের চালাকি

নিশ জেলার আক্রমণের বর্ণনা আর মোল্লা আব্দুল হাকিমের শাহাদাতের ঘটনা শুনে আমি মোল্লা আব্দুশ শুকুর এবং আজমরেকে সেই ভিডিওটি দেখাই যেটিতে কানাডিয়ান আর্মির কনভয়ের উপর পরিচালিত হামলায় একটি ট্যাংক ধ্বংস হওয়ার দৃশ্য ধারণ করা ছিলো। ভিডিওর সাথে সাথে খাঞ্জার ব্যাপারেও তাদেরকে বলি। কানাডিয়ান আর্মি কর্তৃক ওয়ারলেস এবং রিমোট কন্ট্রোল জ্যাম করার ব্যাপারেও তাদেরকে বলি। আল্লাহ তায়ালার মেহেরবানিতে মুজাহিদীন কিভাবে তাদের জ্যামিং সিস্টেম তছনছ করেছে তাও বর্ণনা করি।

কথার মাঝখানে আজমরে আমেরিকানদের নির্লজ্জতার পর্দা উঠিয়ে তার ঘটনা শোনায়। সে বলে, কানাডিয়ান আর্মিরা তো ওয়ারলেস জ্যাম করে, অথচ আমেরিকানদের নিকট এ ধরনের কোনো প্রযুক্তি নেই। তারা সেই ওয়ারলেসে কান পাতে এবং রিমোটে আগত টোন শুনে থেমে যায়। আজমরে বলল, এখানে আমেরিকানদের যে কনভয়টি বসতি তল্লাশি করতে এসেছিলো, আমি তাদের পথে খুবই উপযুক্ত জায়গায় একটি মাইন বিছিয়েছিলাম। যেদিক দিয়ে আমেরিকানরা যেতে বাধ্য ছিলো। যখন আমেরিকান কনভয় তার নিকটে পৌঁছে তখন আমি মোল্লা আব্দুশ শুকুরকে জিজ্ঞেস করলাম– প্রথম গাড়ি নাকি শেষ গাড়ি? তখন সাথে সাথে সকল গাড়ি থেমে যায় এবং তৎক্ষণাৎ ৫০০ মিটার পেছনে চলে যায়। এভাবে সে কনভয়টি আমাদের মাইনের শিকার হওয়া থেকে বেঁচে যায়।

আমেরিকান নির্লজ্জতা এবং তালেবানের জবাব

কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর আমি বললাম, এই নির্লজ্জতার খুবই সহজ এবং উচিত সমাধান রয়েছে। যখন অর্ধেক কনভয় আপনাদের বিছানো মাইন থেকে আগে চলে যাবে এবং অর্ধেক বাকি থাকবে তখন আপনি রিমোটে টোন দিবেন। যখন আপনি রিমোটে টোন দিবেন তখন কনভয় সেখানেই থেমে যাবে। তারা মনে করবে মাইন এখনও সামনে রয়েছে। অথচ মাইন তাদের নিচে রয়েছে। এরপর তারা হয়তো সামনে যাবে নতুবা পিছনে যাবে, তখন সহজেই আপনার ইচ্ছা অনুযায়ী গাড়ি শিকার করতে পারবেন। আর এটাতো কেবলই আল্লাহর সাহায্য এবং সমর্থন যে, জমানার ফেরাউনের সামর্থ্য এবং শক্তিকে সে সময় কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষার পরই আপনাদের বিছানো মাইনে ধ্বংস করে দিতে পারেন।

তারপর আমরা আমাদের সাথী তালেবান মুজাহিদীনকে এই পদ্ধতি শিখাই। আলহামদু লিল্লাহ! আজ গোটা আফগানিস্তানে আমেরিকান এবং সম্মিলিত বাহিনীর উপর চলমান রিমোট কন্ট্রোল হামলা এই পদ্ধতিতেই এবং এভাবেই কয়েক সেকেন্ডে পরিচালিত হচ্ছে।

মোল্লা আব্দুশ শুকুরের সাথে পরামর্শ

এশার নামাজ আমরা মোল্লা আব্দুশ শুকুরের মেহমানখানায় আদায় করি। তারপর মোল্লা আব্দুশ শুকুর আমাকে চুনার চলে এসে সম্মিলিত ক্রুসেডারদের উপর আক্রমণ চালাতে উৎসাহিত করতে থাকেন। তিনি বারবার আমাকে চলে আসতে বলছিলেন। কারণ, বিদেশি সৈন্যদের বিরুদ্ধে মাইনের আক্রমণ চালানোর জন্য আজমরে ছাড়া আর কোনো মুজাহিদ এখানে ছিলো না। আমি তাকে বললাম, গম্বুজে আমরা অনেক প্রস্তুতি নিয়েছি। আশা করছি দু'একটি আক্রমণের পর কানাডিয়ানরা সেখান থেকে পালিয়ে যাবে। তারপর ইনশাআল্লাহ আমি চুনার এসে যাবো। আর আমি তখন আক্রমণ চালানোর জন্য আজমরেকে বুঝিয়ে দেই। তাকে ছাড়াও এখানকার আরো তালেবান আমার কাছে প্রশিক্ষণ নিয়েছে। ইনশাআল্লাহ তারাও ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে কার্যকর আক্রমণ পরিচালনা করতে পারবেন। মোল্লা আব্দুশ শুকুরও আমার এই পরামর্শকে সমর্থন করেন। তারপর আমি সকালে রওয়ানা হওয়ার জন্য মোল্লা আব্দুশ শুকুরের নিকট অনুমতি চাই। তিনি খুশি খুশি আমাকে অনুমতি দিয়ে

দেন। মোল্লা আব্দুশ শুকুরের কিছু ওয়ারলেস নষ্ট ছিলো, সেগুলো ঠিক করে আমি ঘুমিয়ে যাই।

মোল্লা আব্দুল হাকিম শহীদ রহ. এর কবরে

আমি সকালে উঠে ফজর নামাজ আদায় করি। তারপর নাশতা করে গম্বুজের দিকে রওয়ানা হই। রাস্তায় খরতুতের গোলাব খানের নিকট যাত্রা বিরতি করি। এক ঘন্টা যাবত দুর্গম পথে মোটর সাইকেল চালানোর পর খরতুতে গোলাব খানের নিকট পৌঁছি। গোলাব খান ঘরেই ছিলেন। তিনি ঘর থেকে বাইরে এসে আমার সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং আমাকে তার মেহমানখানায় নিয়ে যান। আমি তার কাছে আসার উদ্দেশ্য বলি। আমি তাকে বললাম, আমি মোল্লা আব্দুল হাকিম শহীদের কবরে যেতে চাই। কিন্তু তিনি আমাকে বসতে বললেন। আমাকে কবরে নিয়ে যেতে আমি তাকিদ দিলে তিনি আমাকে তার বাড়ির পাশে অবস্থিত কবরস্থানে নিয়ে যান। সেখানে গোলাব খান একটি নতুন কবরের দিকে ইশারা করে বলেন, এটি মোল্লা আব্দুল হাকিম শহীদ রহ. এর কবর।

যখন গোলাব খান কবরের দিকে ইশারা করেন তখন আমার চোখে মোল্লা আব্দুল হাকিমের সেই লাল-সাদা গোলাপের মতো চেহারা ভেসে ওঠে। অন্তরে তার বিরহের বেদনা তাজা হয়ে যায়, যা অশ্রু হয়ে দু'চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ে। আমি মোল্লা আব্দুল হাকিমের মাগফিরাতের জন্য আল্লাহর দরবারে হাত উঠিয়ে দেই এবং দীর্ঘক্ষণ আল্লাহ তায়ালার দরবারে মুসলিম উম্মার দ্বিতীয় প্রশান্তি মুজাহিদীনের কামিয়াবি, সক্রিয়তা, বন্দীদের মুক্তি এবং মোল্লা আব্দুল হাকিম ও অন্যান্য শুহাদায়ে ইসলামের উঁচু মাকামের জন্য দোয়া করতে থাকি। তারপর গোলাব খানের সাথে ফিরে আসি। তিনি আমাকে মেহমানখানায় বসান এবং কফি ও মিষ্টি দিয়ে মেহমানদারি করেন।

শহীদের কারামত

গোলাব খান বলেন, কিছুদিন আগে খরতুতের মানুষ আমার কাছে এসে বলল, কবরস্থানে একটি নতুন কবর হয়েছে যা থেকে আলো বের হয়ে আসমানের দিকে উঠে যায়। তাছাড়া সেই কবর থেকে সুগন্ধিও আসছে। কবরটি কার? গোলাব খান বলেন, আমি তাদের জবাবে চুপ থাকি। কারণ, লড়াই চালু রয়েছে। তাছাড়া এলাকাতে মোল্লা আব্দুল হাকিমের অবস্থান এবং প্রভাব অনেক

বেশি। তার শহীদ হওয়ার প্রতিক্রিয়াও বেশি হতে পারে। তাই তালেবান কমান্ডারগণ এখনো মোল্লা আব্দুল হাকিমের শাহাদাতকে গোপন রেখেছেন।

মোল্লা আব্দুল হাকিম শহীদ রহ.
ইলম ও জিহাদের অনুপম সংমিশ্রণ

মোল্লা আব্দুল হাকিম আজ থেকে প্রায় ৪০ বছর আগে শাহ ওলিকোট জেলার এক অনুন্নত বসতি শিনে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা-মাতা আর্থিকভাবে দুর্বল, কিন্তু মজবুত ঈমানের লোক ছিলেন। মোল্লা সাহেবের পিতা-মাতা সততা, দীনদারি এবং দীনি আত্মসম্মানের দৌলতে ধনবান ছিলেন। তাই তারা তাদের সন্তানকেও ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করেন। যখনই মোল্লা আব্দুল হাকিম শহীদ রহ. কিছু শেখা ও বোঝার বয়সে উপনীত হন তখন তারা তাদের কলিজার টুকরোকে যে শিক্ষা দেন সেটি ছিলো পবিত্র কুরআনের তালিম। এভাবে মোল্লা আব্দুল হাকিম সেই হাদীসের উপমা হয়ে যান যার মর্মার্থ কিছুটা এমন–

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَه.

তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি যিনি কুরআন শিক্ষা করেন এবং শিক্ষা দেন।

মোল্লা আব্দুল হাকিম কেরাত এবং তাজভিদের উপরও দক্ষতা অর্জন করেন। তারপর আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের বড় বড় আলেমগণের নিকট ইলম হাসিল করতে থাকেন। তার মধ্যে তাফসীর, হাদীস, ফেকাহ, তর্কশাস্ত্র এবং আদব শাস্ত্রের জ্ঞান অর্জন করেন। ইসলামী জ্ঞান লাভের পর তিনি তার এলাকাতে দরস দিতে শুরু করেন। অল্প দিনেই তিনি আফগানিস্তানের বড় বড় উলামায়ে কেরামের মধ্যে গণ্য হতে থাকেন। গোটা আফগানিস্তানের লোকেরা তার নিকট দীনি পরামর্শের জন্য আসতে থাকে। এভাবে মোল্লা আব্দুল হাকিম রহ.-এর এক বড় প্রভাব ও অবস্থান তৈরি হয়ে যায়। যেমনিভাবে লোকেরা তার নিকট দীনি পরামর্শ নিতে আসতে থাকে ঠিক তেমনিভাবে তারা তাদের দৈনন্দিন ব্যক্তিগত কাজেও তাকে নিজেদের সিদ্ধান্তদাতা মানতে থাকে। তার সিদ্ধান্তের উপর তারা চোখ-কান বন্ধ করে আমলও করতে থাকে।

১৯৯৪ সালে তালেবান যখন আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদ শুরু করে তখন মোল্লা আব্দুল হাকিম শহীদ রহ. তাদের সাথে নিয়মিতভাবে শামিল হননি। তবে তিনি দরস-তাদরিসে মশগুল থাকার পাশাপাশি তালেবানকে নৈতিক সমর্থন দিয়ে যান। এছাড়াও মোল্লা আব্দুল হাকিম রহ. এর কয়েকজন শাগরিদ তালেবানের গর্বিত কমান্ডার এবং মন্ত্রী ছিলেন। তাদের মধ্যে মোল্লা

আব্দুশ শুকুরের নামও উল্লেখযোগ্য। কিন্তু আফগানিস্তানে যখন সম্মিলিত ক্রুসেডার বাহিনী আমেরিকার নেতৃত্বে ইমারাতে ইসলামিয়ার উপর রক্তের রাত চাপিয়ে দেয় তখন মোল্লা আব্দুল হাকিম বলেন, ঘরে বসে থাকা অসম্ভব। তারপর তিনি নির্ভিক এবং মৌলিক মুজাহিদ হিসেবে তালেবানের সাথে যুক্ত হয়ে যান। তিনি খুব দ্রুতই নিজের সৈনিক সুলভ যোগ্যতার প্রমাণ পেশ করেন। মোল্লা আব্দুল হাকিম শহীদ রহ. যতদূর পর্যন্ত প্রভাব রাখতেন তার সবাইকে জাগিয়ে তুলেন এবং সম্মিলিত ক্রুসেডার বাহিনীর বিরুদ্ধে এনে দাঁড় করান। তিনি যেখানেই যেতেন সেখানকার লোকদেরকে মুসলিম উম্মার করুণ অবস্থা জানাতেন এবং তাদেরকে কুফর ও দখলদারদের হিংস্র থাবায় নির্যাতিত উম্মতের অবস্থা বর্ণনা করে তাদেরকে জিহাদের প্রতি উৎসাহিত করতেন। মোল্লা আব্দুল হাকিম শহীদ রহ. নিজের জবান, কলম এবং অন্যান্য সকল যোগ্যতাকে আল্লাহর কালেমাকে বিজয়ী করার জন্য ওয়াকফ করে দেন। তিনি দক্ষিণ আফগানিস্তানের কোণায় কোণায় জিহাদের স্পৃহাকে জাগ্রত করতে ব্যস্ত থাকেন। নিজের ইজ্জতকে কুরবানী করে তিনি দীনকে ইজ্জত দিতে সচেষ্ট হন। নিজের আরামকে কুরবানী করে মুসলমানকে আরাম দিতে চান। ক্রুসেডারদের জুলুম থেকে বাঁচাতে চান।

মোল্লা আব্দুল হাকিম শহীদ রহ. এর কথা তার ব্যক্তিত্বের পরিচয় বহন করতো। তাই তিনি সকল নওজোয়ানকে মুজাহিদে আজম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৃঢ়তা, সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর রা. এর কৃতজ্ঞতা, সায়্যিদুনা ফারুক রা. এর আত্মসম্মান ও শাহাদাত, সায়্যিদুনা আলী মুর্তযা রা. এর দীনের সহীহ বুঝ ও বীরত্ব, সায়্যিদুনা হামযা রা. এর আক্রমণ, সায়্যিদুনা তলহা ও যুবায়ের রা. এর জোয়ানি, আবু উবায়দা এবং সা'দ রা. এর সিপাহ সালারি, আবু দুজানা রা. এর কৌশল, মুসয়াব রা. এর জীবনবাজি, মুয়াবিয়া রা. এর রাজনীতি, আমর বিন জামুহ রা. এর শাহাদাতের তামান্নার শিক্ষা দিতেন।

আর এ জন্য তিনি সারাক্ষণ অস্থির থাকতেন। কখনো দরস-তাদরিসে ব্যস্ত থাকতেন আবার কখনো লেখালেখিতে ব্যস্ত থাকতেন। যার জ্বলন্ত সাক্ষী ফেকাহ শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ কিতাব হেদায়ার হাশিয়া[১৫]। আবার কখনো তিনি অস্ত্র উঠিয়ে কিতালের ময়দানে বের হয়ে যেতেন। তার চঞ্চল হৃদয় সেদিন শান্ত হয় যেদিন তিনি শাহাদাতের আলখিল্লা পরিধান করে চিরদিনের জন্য স্থির হয়ে যান।

---

[১৫]. টীকা বা নোট।

শিনে যাত্রা

আমি এসব চিন্তায় মশগুল ছিলাম। এরইমধ্যে গোলাব খান দুপুরের খাবার নিয়ে আসেন। আমি খাবার খেয়ে অল্প কিছুক্ষণ আরাম করে যোহরের নামাজ আদায় করি। তারপর গোলাব খানের কাছে অনুমতি নিয়ে শিনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই।

আব্দুস সবুরের গ্রেফতার

আমি আসরের আগেই শিনে মুসা খানের কাছে পৌছে যাই। আসর নামাজ আদায় করার পর আমি মুসা খান এবং খলিফা ভাইয়ের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করি। কিছুক্ষণের মধ্যে ওয়ারলেসে তাদের সাথে যোগাযোগ হয়। তারা মাগরিবের আগেই মুসা খানের এখানে পৌছে যাওয়ার ওয়াদা করে। মাগরিবের আগে তারা এলে তাদের অবস্থা জানতে চাই। মহব্বত খান এক বেদনাদায়ক সংবাদ শোনালেন। আব্দুস সবুর নামে এক তালেবানকে কানাডিয়ান আর্মি গ্রেফতার করে নিয়ে গেছে। আমি তার কারণ জানতে চাইলে মহব্বত খান বলেন, আমরা গম্বুজের নিকটবর্তী আরো একটি জায়গায় উপযুক্ত মনে করে মাইন বিছাই। তখন আমার সাথে আব্দুস সবুর এবং আব্দুল হাই ছিলো। আমরা সেখানে রিমোট কন্ট্রোল লাগাই। হঠাৎ সেখানে কানাডিয়ান আর্মি তল্লাশি নিতে চলে আসে। আমরা রিমোট কন্ট্রোল ব্লাস্টিং করতে চেষ্টা করি কিন্তু সেটি ব্লাস্ট হয়নি। যখন কনভয় সামনে চলে যায় তখন আমি তাকে বলি, এখন আমরা রিমোট বের করে খাঞ্চা ফিট করবো। যখন কনভয় আসবে তখন তারা এর শিকারে পরিণত হবে। আমরা তখনো খাঞ্চা ফিট করছিলাম, হঠাৎ কানাডিয়ান আর্মির তল্লাশি বিমান আমাদের মাথার উপর পৌছে যায়। আমি এবং মহব্বত খান ঘেরাও থেকে বের হয়ে যাই কিন্তু আব্দুস সবুরকে কানাডিয়ান আর্মিরা গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। সেই সাথে খাঞ্চাও তাদের সাথে নিয়ে যায়। এভাবে আব্দুস সবুরের সাথে সাথে আমাদের নতুন প্রযুক্তি খাঞ্চাও কানাডিয়ান আর্মির হাতে পড়ে যায়। আমি এই ঘটনা শুনে খুবই আফসোস করতে থাকি। অন্তর খুবই পেরেশান হয়ে যায়। তারপর আমি মহব্বত খান এবং খলিফা ভাইকে জিজ্ঞেস করি, আমি চুনার যাওয়ার সময় যে জায়গার কথা বলে গিয়েছিলাম, আপনারা কি সেখানে মাইন বিছিয়েছেন? তারা বললেন, মাইন বিছিয়েছি এবং খাঞ্চাও লাগিয়েছি। সেটি একদমই প্রস্তুত।

কানাডিয়ান আর্মির উপর দ্বিতীয় আঘাত

আমি চুনার যাওয়ার আগে মহব্বত খান এবং খলিফা ভাইকে শিন বসতির সামান্য একটু আগে মাইন বিছানোর কথা বলে গিয়েছিলাম। সেখানে খলিফা ভাই এবং মহব্বত খান উপরে-নিচে ৩টি মাইন এ্যামা কার্ডের মাধ্যমে সংযুক্ত করে বিছিয়েছেন। যদি সেগুলোর সাথে খাঞ্চা ফিট করে থাকে তাহলে মাইনগুলো ক্রুসেডারদেরকে তাদের আসল ঠিকানা জাহান্নামে পৌছানোর জন্য একদমই প্রস্তুত ছিলো।

পরদিন কানাডিয়ান আর্মির ডিউটি পরিবর্তনের সময় ছিলো। আমরা কানাডিয়ান আর্মির সংবাদদাতা অর্থাৎ ওয়ারলেস সেটে জ্যামিং টোন আসার অপেক্ষা করছিলাম। যখনই ওয়ারলেসে তাদের আসার সংবাদ পেলাম তখন সংবাদের ভিত্তিতে আসরের কাছাকাছি সময়ে মাইনগুলোর সাথে খাঞ্চা ফিট করে দেই। আমি, মহব্বত খান এবং খলিফা ভাই শিন বসতির সাথে অবস্থিত একটি পাহাড়ে চলে আসি। এখান থেকে মাইনের জায়গাটি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিলো এবং ক্যামেরার চোখে সেখানের দৃশ্য ভিডিও করা সহজ ছিলো। গম্বুজ থেকে কান্দাহার যাওয়ার উদ্দেশ্যে কনভয়টি কয়েক মুহূর্তে আমাদের নিকট পৌছে যাবে। এটি গম্বুজে নিযুক্ত সদস্যদেরকে কান্দাহারে বিশ্রামের জন্য নিয়ে যাচ্ছে। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে রাস্তায় কানাডিয়ান আর্মির কনভয় দেখতে পাই। সবার সামনে একটি ট্যাংক, তার পেছনে জ্যামিং সিস্টেম গাড়ি, তারপর দু'টি ট্যাংক, তারপর জ্যামিং সিস্টেম গাড়ি, তারপর ট্যাংক এবং তারপর একটি ফৌজি ট্রাক ছিলো। খুব দ্রুত সেটি আমাদের বিছানো মাইনের দিকে এগিয়ে আসছিলো। রাস্তা পরিষ্কার, ফলে ট্যাংকের গতি ছিলো প্রচুর। ট্যাংক শিন বসতির দিকে এগিয়ে এলে সেখানকার রাস্তা সংকীর্ণ থাকায় আমাদের বিছানো খাঞ্চার সাথে লেগে যায়। সাথে সাথে আমাদের মাইন খুবই বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হয়। ট্যাংক এবং তাতে থাকা সৈন্যদের টুকরোগুলো উড়ে যায়। তিনটি মাইনই একসাথে ব্লাস্ট হওয়াতে ট্যাংকের বডি উড়ে যাওয়ার সাথে সাথে রাস্তায় একটি বড় গর্ত হয়ে যায়। কয়েকটি ভারি পাথরও উড়ে গিয়ে নিক্ষিপ্ত হয়।

কানাডিয়ান আর্মির উপর তালেবানের ভয়ভীতি

কানাডিয়ান আর্মির বাকি তিনটি ট্যাংক, যেগুলো ধ্বংসের হাত থেকে বেঁচে গেছে, সেগুলোতে স্থাপিত গানের মাধ্যমে তারা এলোপাথাড়ি ফায়ারিং করতে শুরু করে। তারা নিকটবর্তী পানির নালা এবং ছোট পাহাড়গুলোকে নিশানা বানাতে থাকে। বাকিরা পিছনে রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে থাকে। কনভয়ের সেন্য

সদস্যদের উপর ভয়-ভীতির স্পষ্ট আলামত দেখা যাচ্ছে। তারা ওয়ারলেস সেটে চিৎকার চেঁচামেচি করে আরো সাহায্য চাইতে থাকে। এরই মধ্যে অবশিষ্ট কাফেলার হেফাজতের জন্য একটি জঙ্গী হেলিকপ্টার আকাশে গর্জন করতে শুরু করে।

খাঞ্জার প্রভাব

এলাকার কিছু গোত্রীয় সরদারকে কানাডিয়ান আর্মির এক বড় অফিসার তাদের ক্যাম্পে তলব করে। কারণ, এলাকার সরদার এবং কানাডিয়ান আর্মির মধ্যে একটি চুক্তি হয়েছিলো। চুক্তি অনুযায়ী কানাডিয়ান আর্মি এলাকার কাউকে নিজেরা গ্রেফতার করতে পারবে না বরং সর্দারগণের মাধ্যমে তাদের কাছে পাঠানো হবে। আজও সেই ধারাবাহিকতায় কানাডিয়ান আর্মির বড় অফিসার আব্দুস সবুরের পালাতক দুই সাথীকে গ্রেফতারের ব্যাপারে কথাবার্তা বলতে ডেকেছিলো। যখন এলাকার সর্দাররা সেখানে গিয়ে কথাবার্তা বলছিলেন, ঠিক তখনই সেই অফিসার ট্যাংক ধ্বংসের সংবাদ পায়। এতে সে খুবই পেরেশান হয়ে যায় এবং তৎক্ষণাৎ তাদের কেন্দ্রীয় কন্ট্রোলরুম কান্দাহারে যোগাযোগ করে ট্যাংক ধ্বংস হওয়ার সংবাদ দেয়। সে খুব ভয়ে ভয়ে সংবাদ দিচ্ছিলো। এলাকার মুরুব্বীরা অফিসারকে তার পেরেশানির কারণ জিজ্ঞেস করলে সে খুবই ভয় এবং পেরেশানির সাথে তার কাছে পড়ে থাকা একটি বাক্স থেকে কাঠ বের করে, যাতে একটি লোহার পাত লাগানো ছিলো। অফিসার সেই কাঠের দিকে ইশারা করে বলতে থাকে, এই সেই ভয়ানক হাতিয়ার যেটি দিয়ে তালেবানরা আমাদেরকে পরাজিত করছে। তালেবানরা এটির মাধ্যমে দুই সপ্তাহের মধ্যে আমাদের দু'টি ট্যাংক এবং ৩০ জনেরও বেশি সৈন্য ধ্বংস করে দিয়েছে। আমাদের কাছে এটির বিকল্প কোনো প্রযুক্তি নেই।

এলাকার মুরুব্বীরা বলেন, তারা এই কাঠটির ব্যাপারে খুবই ভীত ছিলো। তাদের উপর এই কাঠ এবং তালেবানের খুব বেশি প্রভাব দেখা যাচ্ছিলো। তারা পেরেশান হয়ে শেষ পর্যন্ত মিটিং সমাপ্ত ঘোষণা করে দেয় এবং বিভিন্ন জায়গায় ওয়ারলেস ও স্যাটেলাইট ফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ শুরু করে।

সুস্পষ্ট বিজয়

চারপাশ তখন ঘন অন্ধকারে ছেয়ে গেছে। কিন্তু কানাডিয়ান আর্মির কনভয় বিস্ফোরণের জায়গা থেকে একটু দূরেই দাঁড়িয়ে ছিলো। তাদেরকে হেফাজতের

জন্য আকাশে জঙ্গী হেলিকপ্টার গর্জন করছে। আমরা কনভয়ের এখানে দাঁড়িয়ে থাকার কারণ নিয়ে চিন্তা ভাবনা করছিলাম; কিন্তু আমরা এর কোনো কারণ বের করতে পারছিলাম না। রাত ১০ টার দিকে কানাডিয়ান আর্মির ক্যাম্প থেকে আরো ট্যাংক এবং ট্রাক আসে। তারা বিস্ফোরণের জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকা কনভয়কে সাথে নিয়ে কান্দাহারের দিকে রওয়ানা হয়ে যায়। মহব্বত খান বলেন, এরা রিজার্ভ ফোর্স। কনভয়কে কান্দাহার পর্যন্ত পৌছাতে গম্বুজ ক্যাম্প থেকে এসেছে। কিন্তু আমি বললাম, এটা মুশকিল ব্যাপার। কারণ, ব্যাপারটা যদি শুধু ট্যাংক পর্যন্ত সীমাবদ্ধ হতো তাহলে রিজার্ভ ফোর্স কিংবা সাহায্য মনে করা যেতো। কিন্তু কনভয়ের সাথে সামানপত্রের ট্রাকতো অন্য কিছুর ইঙ্গিত বহন করছে। আমি এবং মহব্বত খান এসব কথাবার্তায় ব্যস্ত ছিলাম। এরই মধ্যে গম্বুজ বসতিতে অবস্থানরত এক মুজাহিদ আমাকে বলল, কানাডিয়ান আর্মি ক্যাম্প খালি করে চলে গেছে, আমি এখন ক্যাম্পের ভিতর দাঁড়িয়ে আছি। আমি এমন কিছুই শুনতে চেয়েছিলাম। এ কথা শুনে আনন্দে আমার চোখ চিকচিক করে ওঠে। আমরা আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার বলে শ্লোগান দিতে থাকি। আমি এই সুসংবাদ তৎক্ষণাৎ এলাকাতে অবস্থানরত তালেবান কারী ফয়জুল্লাহ সাহেব এবং আব্দুশ শুকুরকে জানাই।

তালেবানের অভিনন্দন

যখনই কানাডিয়ান আর্মির ক্যাম্প খালি করে চলে যাওয়ার সংবাদ এলাকাতে ছড়িয়ে পড়ে তখন ওয়ারলেসে তালেবানের অভিনন্দন আসতে শুরু হয়ে যায়। তালেবানরা ফায়ারিং করে তাদের আনন্দ প্রকাশ করতে থাকে। আমি মহব্বত খানকে বলি, আমরা রাতে এখানেই অবস্থান করবো। সেমতে সেখানেই রাত কাটাই। সকালে ফজর নামাজ আদায় করে ধ্বংসপ্রাপ্ত ট্যাংকের দিকে রওয়ানা হই। আমরা সেখানে পৌছে দেখি ট্যাংকের টুকরোগুলো একটি গর্তে দৃষ্টান্তমূলক দাস্তান হয়ে আছে।

বিবিসির পশতু বিভাগের সংবাদ

আমি ট্যাংক ধ্বংস হওয়ার সাথে সাথেই মোল্লা আব্দুশ শুকুরকে সুসংবাদ দিয়েছিলাম। তিনি এই সংবাদ বিবিসিকে জানিয়ে দেন। সন্ধ্যায় বিবিসি লন্ডনের পশতু শাখায় ট্যাংক ধ্বংস হওয়ার খবর প্রচার করে, যাতে তালেবান প্রতিনিধি ১২ কানাডিয়ান আর্মির সদস্য নিহত হওয়ার দাবি করেন।

কাজি শের জামান ক্রুসেডারদের এজেন্ট

কানাডিয়ান আর্মির ক্যাম্প খালি হয়ে যাওয়ার পর মাওলানা হামিদুল্লার নিকট আমরা সবাই উপস্থিত ছিলাম। তখনই মোল্লা সরদার ও অন্যান্য তালেবান মুজহিদীন চলে আসেন এবং কানাডিয়ান আর্মির ক্যাম্প খালি করে যাওয়ার জন্য অভিনন্দন জানাতে থাকেন। সেখানে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়। কথাবার্তার মাঝখানে মোল্লা সরদার আমাকে বললেন, তালেবানরা যখন পিছু হটেছিলো তখন ক্রুসেডার বাহিনী তাদের এজেন্টদের মাধ্যমে কারজাই হুকুমত প্রতিষ্ঠা করেছিলো। যা নিরাপত্তা এবং পুণর্গঠনের পতাকা উঁচু করে আছে। অথচ তাদের মূল উদ্দেশ্য হলো পুণর্গঠনের ফান্ডে আসা টাকাগুলো মায়ের দুধ মনে করে হজম করা। এটি তাদের জীবনের মূল উদ্দেশ্যে পরিণত হয়েছে। আফগান জনসাধারণের উপর জুলুম ও নির্যাতনের মধ্যে এটি আরেকটি নতুন সংযোজন।

এভাবে ক্রুসেডাররা ইনসাফের নামে কাজি কোর্টসমূহ প্রতিষ্ঠা করে। যাদের দাবি আফগান জনসাধারণকে ইনসাফ উপহার দেয়া। কিন্তু বাস্তবে কাজি কোর্টগুলোতে নিযুক্ত কাজিরা জাতির ধনসম্পদ এবং উপার্জনের উপর হাত পরিষ্কার করছে। আদালতের ইনসাফি পাল্লার নিচে বসে ইনসাফ বেঁচা কেনা করছে। এভাবে ন্যায় ও ইনসাফকে খুন করা হচ্ছে। মোল্লা সরদার আরো বলেন, ক্রুসেডারদের এ ধরনের এজেন্টদের মধ্যে একটি নাম হলো কাজি শের জামান। সে আদালতকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে জুলুম ও অন্যায়ের বাজার গরম করে রেখেছে। সে জুলুম এবং নির্যাতনের এক ভয়ানক নেতা। জনসাধারণ তাকে খুবই ভয় করে। এখনতো এই এলাকা ক্রুসেডারদের সম্মিলিত বাহিনী থেকে পবিত্র হয়ে গেছে। তাই ক্রুসেডারদের এই এজেন্টকেও সবক দিয়ে দেয়া হোক। তার অন্যায় কৃতকর্মের শাস্তি দেয়া হোক। তাকে বলা হোক, এখনো জমানার ফেরাউনদের সামনে মুসার লাঠি পেশ করার মতো তালেবান বিদ্যমান আছে। আমি এবং অন্য সকল সাথীরা এ কথাকে সমর্থন করলাম। তারপর তাকে সবক দেয়ার প্রোগ্রাম ঠিক করতে লাগলাম।

কাজি শের জামানের উপর গুপ্তচরবৃত্তি

প্রোগ্রামের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমাদেরকে কাজি (বিচারপতি) শের জামানের উপর গোয়েন্দাবৃত্তি করতে হবে। এজন্য আমাকে এবং আব্দুল মান্নানকে আগে যেতে হবে। বাকিরা বাবাজান বসতিতে পৌঁছে আব্দুল মান্নানের ঘরে অবস্থান করবে। পরের দিন আমরা সাথীদের নিয়ে বাবাজান বসতিতে পৌঁছে যাই। আব্দুল মান্নান এবং আমাকে কাজি শের জামানের উপর গোয়েন্দাবৃত্তির জন্য

নির্ধারণ করা হয়। কাজি শের জামানের অবস্থা আমাদেরকেই সংগ্রহ করতে হবে।

আব্দুল মান্নানও একজন তালেবান মুজাহিদ। কয়েক বছর যাবত তিনি তালেবানের সাথে সম্পৃক্ত। আমরা তাকে এখানে আসার কারণ জানিয়ে বলি, এ কাজটি খুব দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। তিনি এই এলাকারই বাসিন্দা। তিনি আমাদেরকে সহযোগিতা করার সাথে সাথে কাজি শের জামানের উপর গোয়েন্দাবৃত্তির জন্য আমাদের সাথে যেতেও প্রস্তুত। সিদ্ধান্ত হলো, বাকি সাথীরা বাবাজান বসতিতে থাকবে এবং আমি আর আব্দুল মান্নান সামনে যাবো। আমরা উভয়ে পৃথক মোটর সাইকেলে চড়ে কাজি শের জামানের বসতির দিকে রওয়ানা হই। আমরা তার বসতির কাছাকাছি পৌঁছে দেখলাম, বসতিটি একটি কেল্লার মতো। যার ভেতরে আক্রমণ পরিচালনা করা খুবই কঠিন। যাই হোক, আমরা সেখানে নিজেদেরকে আফিম ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচয় দিয়ে বসতির ভেতরে চলে যাই। আমরা লোকদেরকে আফিমের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতে থাকি এবং গোয়েন্দাবৃত্তিও করতে থাকি। এরই মধ্যে শের জামানের ঘর দেখতে পাই। আমরা সেটি বিস্তারিত পর্যবেক্ষণ করি। কিন্তু শের জামানকে দেখতে পাইনি। যখন আমরা এই কেল্লা সাদৃশ বসতি থেকে বের হই তখন দেখি বসতির বাইরে একটি মেহমানখানা বানানো আছে। সেখানে বহু লোক খোশ গল্পে লিপ্ত এবং তাদের মাঝখানে একজন মোটা লোক বসে আছে। মোল্লা আব্দুল মান্নান ইশারা করে বললেন, সে-ই কাজি শের জামান। দিনের অধিকাংশ সময়ই তার এই মেহমানখানায় কাটে। আমরা গোয়েন্দাবৃত্তি পূর্ণ করি এবং আব্দুল মান্নানের সাথে বাবাজান বসতিতে ফিরে আসি। মোল্লা সরদার আমার সাথে খুবই আবেগের সাথে সাক্ষাৎ করেন। আমরা মোল্লা সরদারের নিকট কাজি শের জামানের বসতির অবস্থা ও বিস্তারিত ঘটনা জানাই। তারপর মোল্লা সরদার প্রোগ্রাম সেট করেন। আমরা কাজি সরদারের ঘরে অতর্কিত আক্রমণ করবো এবং তাকে জীবিত গ্রেফতার করবো। এই আক্রমণ পরিচালনা করার জন্য প্রস্তুত সাথীদেরকে সে অনুযায়ী হুকুম দেয়া হলো। মোল্লা সরদার এটাও বললেন যে, আজ রাতেই এই আক্রমণ পরিচালনা করা হবে।

ক্রুসেডীয় জজ আপন পরিণামে

আমরা মাগরিবের নামাজ আদায় করে কাজি শের জামানকে জীবিত গ্রেফতার করার জন্য রওয়ানা হই। যখন আমরা কাজি শের জামানের মেহমানখানার কাছে পৌঁছি তখন আমাদের গাড়ি পেছনে রেখে সশস্ত্র তালেবানদেরকে পজিশন

নিয়ে বসিয়ে দেই। ভাই নজিবুল্লাহ, মোল্লা সরদার এবং আমি কাজি শের জামানের মেহমানখানার ভিতরে চলে যাই। ভিতরে গিয়ে কাজি শের জামানের কথা জিজ্ঞেস করলে তার ছেলে বলল, সে ঘরে আছে। মোল্লা সরদার বললেন, তাকে ডাকো, তার সাথে আমাদের জরুরি কাজ আছে। আমরা এখানে কাজি সাহেবের অপেক্ষায় আছি। কাজি শের জামানের ছেলে তাকে ডাকতে গিয়ে আর ফিরে আসেনি। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর আমরা মেহমানখানায় অবস্থানরত অন্য দু'জনকে কাজি শের জামানকে মেহমানখানায় ডেকে আনতে পাঠাই। তারা সেখানে গিয়ে বলবে, কিছু লোক মেহমানখানায় আপনার সাথে দেখা করতে এসেছে। কিন্তু কিছুক্ষণ পর তারা দু'জন ফিরে এসে বলল, কাজি সাহেব বলছেন, দেখা করতে চাইলে তারা যেনো আমার ঘরে এসে দেখা করে। আমি মেহমানখানায় আসতে পারবো না। কিন্তু আমরা তার ঘরে যেতে প্রস্তুত ছিলাম না। কারণ, সেখানে অভিযান পরিচালনা করে বের হয়ে আসা খুবই কঠিন ছিলো। আগত ব্যক্তিদ্বয় এ কথাও বলল যে, কাজি শের জামান এবং তার ছেলে সশস্ত্র অবস্থায় কালাশনিকভ হাতে নিয়ে বসে আছে। এ কথা শুনে আমি সন্দেহ প্রকাশ করলাম, সম্ভবত তার ছেলে আমাদের সশস্ত্র তালেবান সাথীদেরকে পজিশন নিয়ে বসে থাকতে দেখেছে। যারফলে সে ভয় পেয়ে মেহমানখানায় আসছে না। এরপর আরো দু'জন তালেবান সাথীকে কাজি শের জামানের কাছে পাঠানো হয়; কিন্তু সে তালেবান সাথীদের কথা শোনার পরিবর্তে তাদের উপর দু'টি বড় বড় কুকুর ছেড়ে দেয়। যখন কুকুর দু'টি সাথীদেরকে কামড় দিতে ছুটে আসে তখন তারা ফায়ারিং করে জান বাঁচায়। কুকুর ছুটে পালিয়ে যায়, দ্বিতীয়বার আর দেখা যায়নি। ফায়ারিংয়ের আওয়াজ শুনে নজিবুল্লাহ আশঙ্কা প্রকাশ করলেন, আমাদের সাথীদের উপর ফায়ারিং হয়নি তো! আমরা সকল তালেবান মোল্লা সরদারের সাথে কাজি শের জামানের মেহমানখানা থেকে বের হয়ে তার ঘরের দিকে রওয়ানা হই। তার ঘরের কাছে সাথীরা নিজ নিজ পজিশন নিয়ে দাঁড়িয়ে যায়। তার কেল্লা সাদৃশ ঘরের মূল দরজার ভিতরে মোল্লা সরদার, নজিবুল্লাহ, নাসরুল্লাহ এবং আমি প্রবেশ করি। নজিবুল্লাহ কাজি সাহেবকে আওয়াজ দিলে সে কথা বলতে বাইরে আসে। তার সাথে সাথে তার ছেলেও আসে। তার ছেলে কালাশনিকভে সজ্জিত। কাজি শের জামান নিজেও টিটি-৩০ বোর পিস্তল নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো। কাজি সাহেবের সাথে সালাম ও দোয়ার পর বিস্তারিত আলোচনা হয়। আমরা কাজি শের জামানকে বলি, সে যেনো স্থানীয় লোকদের উপর জুলুম নির্যাতন না করে। কারণ, তাকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে ইনসাফ করার জন্য, ক্রুসেডারদের এজেন্ট হওয়ার জন্য নয়। আমরা তাকে বলি, সে যেনো স্থানীয় লোকদের উপর

বাড়াবাড়ি করা, তাদের উপার্জনের উপর হস্তক্ষেপ করা এবং ইনসাফকে ডলারের বিনিময়ে বিক্রি করা বন্ধ করে। কিন্তু তাকে বুঝানো আর উটকে রিক্সায় বসানো সমান কথা। সে তার বিদেশি প্রভু এবং তার পদবির উপর গর্ব করতে গিয়ে বড় অহংকার প্রকাশ করে। তালেবানকে কোনো গণনাতেই ধরেনি; বরং ধমক দিতে দিতে ভেতরে চলে যেতে থাকে। আমি নজিবুল্লাকে বললাম, এই লোক পৃথিবীর বোঝা, সুতরাং পৃথিবীর বোঝা তার উপরই উঠিয়ে দেয়া হোক। এমন সুযোগ আর হাতে আসবে না। তাকে তার পরিণামে পৌঁছে দিলেই ভালো, অন্যথায় সে খুবই বেপরোয়া হয়ে যাবে। নজিবুল্লাহও তা সমর্থন করলো।

কাজি শের জামানের ছেলে যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য দাঁড়িয়ে ছিলো। আমি তার কাছে গিয়ে বলি, কী খবর জনাব? আপনি কেমন আছেন? সে জবাব দিলো, 'আমি বিলকুল ঠিক আছি।' এসব কথাবার্তার এক পর্যায়ে সে কিছুটা নিশ্চিত হয়ে যায় যে, তালেবান কোনো গড়বড় করবে না। আমি তাকে বললাম, আপনার গানের লকটা বন্ধ করুন, ফায়ার হয়ে যেতে পারে। যখন সে তার গানের দিকে মনোযোগী হলো, আমি থাবা মেরে তার কালাশনিকভ ছিনিয়ে নেই এবং নজিবুল্লাহ তাকে জোরে এক থাপ্পড় বসিয়ে দেয়। এতে সে দূরে গিয়ে ছিটকে পড়ে।

এরই মধ্যে কাজি শের জামান পিস্তল দিয়ে ফায়ার করতে চাইলো। সে যখন বুলেট লাগাতে শুরু করলো, আমি মুহূর্তের মধ্যে কালাশনিকভ আমার সাথে দাঁড়ানো তালেবানের কাছে দিয়ে কাজি শের জামানের পিস্তলের ব্যারেল শক্ত করে ধরে তার মুখ উপর দিকে ফিরিয়ে দেই। কাজি শের জামান তখনই ট্রিগার টিপে দেয়, ফলে একটি ফাঁকা ফায়ারিং হয়। ফায়ারিং হতেই আমার সাথে দাঁড়ানো তালেবান আমাকে ইশারা করলো, আমি যেনো কাজিকে পিছনে ধাক্কা দেই। কারণ, সে ফায়ার করবে। সুতরাং আমি ধাক্কা দিতেই আমার সাথী কাজি শের জামান এবং তার ছেলের উপর এলোপাথাড়ি ফায়ার করে দেয়। এভাবে দু'জনই আপন পরিণামে পৌঁছে যায়। আর এলাকার লোকজন তার জুলুম-নির্যাতন ও বিচারিক সন্ত্রাস হতে মুক্তি পায়।

ফিরতি সফর

কাজি শের জামান এবং তার ছেলের মৃত্যুর পর এই এলাকাতে অবস্থান করা বিপদমুক্ত ছিলো না। এরই মধ্যে রাস্তায় এক পাহাড়ে রেখে আসা আমাদের এক সাথী সংবাদ দেয় যে, দু'টি ল্যান্ড ক্রুজারে করে সশস্ত্র লোক আমাদের দিকে আসছে। কিন্তু আমরা কাউকে এদিকে আসতে দেখলাম না। হতে পারে সে

অন্ধকারে ভুল দেখেছে। তারপরও নিরাপত্তার খাতিরে একটি গাড়িকে আগে রওয়ানা করে দেই। সেটিতে সশস্ত্র সাথীদেরকে আরোহন করতে বলি এবং তাদেরকে হুঁশিয়ার থাকতে বলি। তারা যে কোনো বিপদ মোকাবিলা করতে প্রস্তুত ছিলো। দ্বিতীয় গাড়িটি অনেক দূরত্ব বজায় রেখে রওয়ানা হয়। এতে সাথীদেরকে এভাবে বসানো হয়– দু'জন ডানে, দু'জন বামে এবং দু'জন পেছনের দিকে মুখ করে। সবাই সশস্ত্র অবস্থায় ছিল। অপর একজনকে জারকাই দিয়ে গাড়ির ছাদের সামনের দিকে লক্ষ রাখতে বলা হয়। এভাবে আমরা ফিরে আসার সফর শুরু করি। রাত একটার দিকে মোল্লা আব্দুল মান্নানকে তার বসতি বাবাজানে নামিয়ে আমরা আড়াইটার দিকে শিন বসতিতে পৌঁছাই।

সকালে ফজর নামাজ আদায়ের পর নাশতা করে এলাকার তালেবানের সাথে যোগাযোগ করতে চেষ্টা করি। রাতে কাজি শের জামানকে হত্যার সংবাদ শোনালে তারা খুব খুশি হয়। দুপুরে মিঞাশিন বসতিতে কমান্ডার মোল্লা নকিবের সাথে দেখা হলে তাকে কাজি শের জামানের মৃত্যুর সংবাদ শোনাই। তিনি বললেন, মিঞাশিনই শের জামানের পূর্ব পুরুষের এলাকা। যখন তার লাশ এই এলাকায় আনা হয় তখন আমরা ঘোষণা করি, কোনো মুসলমান তার জানাজায় অংশগ্রহণ করবেন না। এর প্রতিক্রিয়া এই হয় যে, দু'একজন সরকারি কর্মচারী ছাড়া কোনো স্থানীয় লোক তার জানাজায় শরীক হয়নি। কাজি শের জামানের জানাজা উপলক্ষে আফগান ন্যাশনাল আর্মির প্রচুর সংখ্যক সদস্য উপস্থিত হয়, যা কাজি শের জামান ক্রুসেডারদের এজেন্ট হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে। এরই মধ্যে আমি মোল্লা নকিবকে বলি, আপনার এলাকাতে কানাডিয়ান আর্মির ক্যাম্প রয়েছে, অথচ তাদের উপর কোনো আক্রমণ হয়নি। তিনি জবাবে বললেন, খুব দ্রুতই আপনি সুসংবাদ পাবেন।

গম্বুজ বসতিতে রেপিয়েটার স্থাপন

আমরা গম্বুজ বসতির নিকটে এক উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় একটি রেপিয়েটার স্থাপন করি এবং তার এন্টিনাকে ভালো করে ক্যামোফ্লাজ করে রাখি। রেপিয়েটার-এর সাথে সংযুক্ত ব্যাটারি চার্জ করার জন্য একটি সোলার প্যানেল লাগিয়ে দেই। সেই রেপিয়েটারের সাহায্যে আমরা এখন সহজেই খাকরিজ, মিঞাশিন, কান্দাহার, উরগান্দাব, তরিনকোট এবং শাহ ওলিকোটে যোগাযোগ করতে পারি। আগে যখন আমরা রেপিয়েটারের মাধ্যমে যোগাযোগ করতাম তখন সেটি চুনার বসতির উপর এক পাহাড়ের চূড়ায় স্থাপন করে ছিলাম। এখন এই

রেপিয়েটার স্থাপনের পর আমাদের যোগাযোগ হেলমন্দ প্রদেশের প্রসিদ্ধ শহর সঙ্গিন পর্যন্ত হয়।

রেপিয়েটার কী?

আমরা এই পৃষ্ঠাতে এবং এই পুস্তকের বিভিন্ন জায়গায় রেপিয়েটার (Repeater)-এর মাধ্যমে যোগযোগের কথা আলোচনা করেছি। আমাদের পাঠক হয়তো ভাবছেন, রেপিয়েটার কী জিনিস? সেটার ব্যবহার কী ধরনের? এক জায়গায় থেকে অন্য জায়গায় যোগাযোগের জন্য আমরা ৫ ওয়াটের হ্যান্ডসেট ব্যবহার করি। কিন্তু সমস্যা তখনই দেখা দেয়, যখন মাঝখানে বাধা এসে যায়। যেমন পাহাড় ইত্যাদি। তখন সেখানে দাঁড়িয়ে সাথীদের সাথে যোগাযোগ করা মুশকিল হয়ে দাঁড়ায়। এজন্য প্রত্যন্ত অঞ্চল, ঘন জঙ্গল, পাহাড়ি নালা এবং পাহাড়ের উপর থেকে যোগাযোগের জন্য একটি যন্ত্র ব্যবহার করা হয়, যা ভিএইচএফ তরঙ্গকে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে দেয়। এ যন্ত্রকে রেপিয়েটার বলা হয়।

এই রেপিয়েটারের জন্য ৯ ভোল্ট ডিসি বিদ্যুতের প্রয়োজন হয়। যা অত্যন্ত উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ভিএইচএফ (Very High Frequency) ক্রস ফ্রিকোয়েন্সির (Cross Frequency) মাধ্যমে কাজ করে। যার একটি ফ্রিকোয়েন্সি ট্রান্স (Trans) এবং অপরটি রিসিভ (Received)-এর জন্য ব্যবহার হয়। প্রত্যেক ফ্রিকোয়েন্সির মাঝখানে কমপক্ষে ৫০০ মেগাহার্জ দূরত্ব থাকা আবশ্যক। রেপিয়েটারকে উঁচু জায়গায় স্থাপন করা হয়, যাতে যোগাযোগের রেঞ্জ সর্বোচ্চ পাওয়া যায়। তারপর আপনি সেই রেপিয়েটারের মাধ্যমে আপনার হ্যান্ডসেট, ওয়ারলেস সেটের সাথে রেপিয়েটারের রেঞ্জের আওতায় অবস্থিত সকল হ্যান্ডসেট, ওয়ারলেস সেটের সাথে সহজে যোগাযোগ করতে পারবেন।

বি-৫২ বিমানের ভীতিকর বোম্বিং

কাজি শের জামানের মৃত্যুর শানদার আক্রমণ পরিচালনার পর আমরা ফিরে এসেছি আজ দ্বিতীয় দিন হলো। আমরা এখন মাওলানা হামিদুল্লার মেহমান। আমরা মাগরিবের নামাজের প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। মিঞাশিনের দিকে আমেরিকান বি-৫২ বিমানের ভীতিকর এবং অন্তর নাড়িয়ে দেয়ার মতো বোম্বিংয়ের আওয়াজ আসতে থাকে। সেই সাথে আমেরিকান জেট বিমানও বোম্বিংয়ের জন্য আকাশে চক্কর দিতে থাকে। মিঞাশিনের দিকে হওয়া এই ভীতিকর বোম্বিং দেড় ঘণ্টা ধরে চলে। আমরা মাগরিবের নামাজ আদায়ের পর মিঞাশিনের তালেবানের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করি; কিন্তু সংযোগ স্থাপন করতে ব্যর্থ হই।

মোল্লা তোর নকিবের সাথে যোগাযোগ

আমরা বোম্বিংয়ের কারণে খুবই পেরেশান ছিলাম। এই বি-৫২ বিমান এবং আমেরিকান জেট বিমান কেনো এই ভীতিকর বোম্বিং করছে এবং কাদের উপর করছে কিছুই জানা নেই। আমরা এই পেরেশানি নিয়েই এশার নামাজ আদায় করি। তারপর মোল্লা নকিবের সাথে যোগাযোগ করতে চেষ্টা করি। মোল্লা নকিবের এলাকা ছিলো খেজুরদোর। আমরা মোল্লা তোর নকিবের সাথে যোগাযোগ করছিলাম। অনেক চেষ্টা-তদবিরের পর মোল্লা নকিবের সাথে যোগাযোগ হয়। আমি তাকে জিজ্ঞেস করি, বি-৫২ বিমান কেনো বোম্বিং করছে? মোল্লা তোর নকিব প্রশ্নে জবাবের পরিবর্তে মোবারকবাদ দিয়ে বলতে থাকেন– আপনাকে মোবারক বাদ। যুদ্ধ চলছে, কিছুক্ষণ পর যোগাযোগ করবো।

খেজুর যুদ্ধ

আমরা ওয়ারলেস সেট নিয়ে বসে মোল্লা তোর নকিবের যোগাযোগের জন্য অপেক্ষা করতে থাকি এবং খেজুর বসতির তালেবানের নিরাপত্তার দোয়া করতে থাকি। এরই মধ্যে বি-৫২ আমেরিকান বিমান বোম্বিং বন্ধ করে দেয়। বোম্বিং বন্ধ হয়ে যাওয়ার আধা ঘণ্টা পর মোল্লা তোর নকিব আমাদের সাথে যোগাযোগ করেন। তিনি খেজুর যুদ্ধের বর্ণনা এভাবে পেশ করেন যে, আমাদের খেজুর বসতিতে কানাডিয়ান আর্মির এক বড় ক্যাম্প ছিলো। আমরা দীর্ঘদিন থেকে সেটি পর্যবেক্ষণ করছিলাম। দুইদিন আগে আমরা প্রস্তুতিপর্ব সম্পন্ন করে এশার নামাজের পর ক্যাম্পে হামলা চালাই। আমরা যখন ক্যাম্পে প্রবেশ করি তখন ক্যাম্প একদম ফাঁকা, তাতে কোনো সৈন্য ছিলো না। কোনো ফৌজি গাড়িও ছিলো না। আমরা ক্যাম্প দেখে পেরেশান হয়ে যাই। ভাবলাম, এখন যদি আমরা ক্যাম্পের কোনো ক্ষতি করে যাই তাহলে কানাডিয়ানরা সতর্ক হয়ে যাবে। তাই আমরা ফিরে আসি। তারপর তদন্ত করে জানতে পারি, যখন কানাডিয়ান আর্মি গম্বুজ বসতি খালি করে চলে যায় তখন থেকে এই ক্যাম্পের কানাডিয়ানরাও খুব ভীত এবং পেরেশান ছিলো। তারা আসর নামাজের পর পরই গাড়িগুলোকে খোলা জায়গায় রেখে দেয় এবং জঙ্গলে গিয়ে রাত কাটায়। সকালে আবার ক্যাম্পে ফিরে আসে। আর তারা এসব কিছু কেবল তালেবানের আক্রমণের ভয়েই করছে।

মোল্লা তোর নকিব আরো বলেন, যখন আমরা এই তথ্য জানতে পারি তখন নতুন পরিকল্পনা সংযোজন করে কর্মপদ্ধতি ঠিক করি এবং আজ আসরের আগে দ্বিতীয়বার ক্যাম্পে হামলা চালাই। দিনের আলোতেই ক্যাম্পে চড়াও হওয়ার সাহসিকতা এবং বাহাদুরি দেখে কানাডিয়ানরা খুবই ভয় পেয়ে যায়। কানাডিয়ান আর্মি অল্প কিছুক্ষণ মোকাবিলা করে। এতে তাদের পাহারায় নিযুক্ত সদস্যরা মারা যায় এবং বাকিরা পালাতে শুরু করে। এরই মধ্যে তাদের একজন বড় অফিসার, তিনজন জুনিয়র অফিসার এবং কয়েকজন সেনা সদস্য মারা যায়। বাকিরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

আমরা ক্যাম্পে তল্লাশি চালিয়ে গনিমত হিসেবে ছোট হাতিয়ার, কালাশনিকভ, মর্টার এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে গোলাবারুদ পাই। এছাড়াও ৬টি ওয়ারলেস সেটও গনিমত হিসেবে আমাদের হাতে আসে। তারপর ক্যাম্পে থাকা লোহার কপাটবদ্ধ গাড়ি, ট্যাংক এবং ফৌজি ট্রাকগুলোতে আগুন লাগিয়ে দেই। যুদ্ধ বন্ধ হয়েছে অনেকক্ষণ হলো। বিমানের বোম্বিংয়ের সঙ্কা বাড়তে থাকে। কারণ, কানাডিয়ান আর্মিরা ক্যাম্প খালি করে গিয়েছিলো। এখন যেহেতু ক্যাম্পে কেবল তালেবানরা আছে, তাই ক্যাম্পের উপর বোম্বিং হতেই পারে। সুতরাং আমরা দ্রুতই ক্যাম্প ত্যাগ করি। আমরা ক্যাম্প থেকে বের হবার পর পরই আকাশে বিমান চক্কর দেয়ার আওয়াজ আসতে থাকে। আমরা দ্রুত আমাদের গাড়িগুলো আড়ালে থামিয়ে দেই এবং সেগুলোর লাইট বন্ধ করে দেই। তারপর আমরা একটু দূরে নিরাপদ জায়গায় অবস্থান নেই। ক্যাম্পে তখন আগুন জ্বলছিলো। যারফলে বেঁচে যাওয়া গোলাবারুদগুলো বিস্ফোরিত হয়ে বিকট আওয়াজ হতে থাকে। এরই মধ্যে বি-৫২ ও আমেরিকান জেট বিমান বোম্বিং শুরু করে এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত ক্যাম্পকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়।

এই যুদ্ধে কোনো তালেবান শহীদ কিংবা আহত হয়নি। সব তালেবানই তাদের নিরাপদ জায়গায় রয়েছে। অপরদিকে ক্যাম্পে অনেক কানাডিয়ান আর্মির সদস্যের লাশ বিক্ষিপ্ত ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। সেগুলো তারা পলায়নের সময় ফেলে গেছে। এখন বোম্বিং বন্ধ হয়েছে এবং বিমান চলে গেছে।

সুস্পষ্ট বিজয়

সকালে ফজর নামাজ আদায়ের পর আমরা নাশতা করি এবং ৮টার দিকে মোল্লা তোর নকিবের সাথে পুনরায় যোগাযোগ করি। তখন তিনি আরো একটি সুসংবাদ শোনান। তিনি বলেন, এখনই ক্রুসেডারদের হেলিকপ্টার এসেছে। সাথে প্রচুর সংখ্যক সেনা রয়েছে। তাদের সাথে ট্রান্সপোর্ট হেলিকপ্টারও

এসেছে। তারা এখান থেকে ক্যাম্প গুটিয়ে ফেলছে এবং বেঁচে যাওয়া সরঞ্জাম উঠাচ্ছে। ছিন্নভিন্ন লাশগুলোও বের করেছে নিয়ে যাচ্ছে। এভাবে মিঞাশিনের খেজুরে আমাদের বিজয় অর্জিত হয়।

কমান্ডার মোল্লা তোর নকিবকে মোবারকবাদ

আমি যখন মোল্লা তোর নকিবের মুখে কানাডিয়ান আর্মির পিছু হটা এবং তালেবানের বিজয়ের কথা শুনি, তখন আমি খুবই আনন্দিত হই। তার কারণ, আজ শহীদানের রক্তের বরকতে জালেম ক্রুসেডাররা ব্যর্থ এবং শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে এখান থেকে পালাচ্ছে। এই বড় বিজয়ের জন্য আমি মোল্লা তোর নকিবকে মোবারকবাদ দেই। কারী ফয়জুল্লাহ সাহেব ছাড়াও আমি মোল্লা আব্দুশ শুকুর, মৌলভী বায মুহাম্মাদ, খাকরিজ, মিঞাশিন, শাহ ওলিকোট এবং নিশের তালেবানকে এই বিজয়ের সুসংবাদ দেই। এতে সবাই খুবই খুশি হয় এবং রেপিয়েটার নম্বরে মোল্লা তোর নকিবকে বিজয়ের জন্য মোবারকবাদ দেয়। তারা এই বিজয়কে সুস্পষ্ট বিজয় বলে আখ্যায়িত করেন।

তালেবানি হুকুমত

খেজুর যুদ্ধের পর চারটি জেলা ক্রুসেডারমুক্ত হয়ে যায়। কারণ, খাকরিজে চুক্তি হয়েছে। গম্বুজে কানাডিয়ান আর্মির ক্যাম্পও একের পর এক মাইন আক্রমণের পর খালি হয়েছে। আর মিঞাশিনে দাররাহনুর যুদ্ধের পর ক্রুসেডার সৈন্যদের কঠিন অবস্থা বিরাজ করছে। তাদের স্থল পথে যাতায়াত বন্ধ। তারা শুধু অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য হেলিকপ্টারে আফগান ন্যাশনাল আর্মির ক্যাম্পে আসে। দাররাহনুর যুদ্ধের পর আফগান ন্যাশনাল আর্মিও তালেবানের সাথে গোপনে চুক্তি করে নেয়। এভাবে এই চার জেলাতেই বাস্তবে তালেবানের হুকুমত প্রতিষ্ঠিত হয়। কারজাইয়ের গভর্নরের হুকুমত কেবল মিডিয়া এবং কাগজপত্র পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে।

কান্দাহারের দরজায় করাঘাত

মোল্লা তোর নকিবের সফল আক্রমণের পর এলাকা ক্রুসেডারমুক্ত হয়ে যায়। যারফলে এই বিজয়কে মুজাহিদীনরা 'ফাতহে মুবীন' (সুস্পষ্ট বিজয়) আখ্যায়িত করেন। এরপর তারা কান্দাহারের দরজায় করাঘাত করার পরিকল্পনা তৈরি

করেন। এ জন্য তারা কারী ফয়জুল্লাহ সাহেবের নিকট অনুমতি চাইলে তিনি খুশি খুশি অনুমতি দিয়ে দেন।

রওয়ানা

মাওলানা হামিদুল্লার মেহমানখানায় কান্দাহারের দরজায় করাঘাত করার পরিকল্পনা এমনভাবে নেয়া হয় যে, কান্দাহারের নিকটে গিয়ে মেইন রোডে ওত পেতে বসে থাকবে, গাড়িতে তল্লাশি নেয়া হবে এবং ফৌজি গাড়িগুলোকে নিশানা বানানো হবে। এই আক্রমণ পরিচালনার জন্য আব্দুল মান্নানের বসতি বাবাজানের নিকটে, যেখান দিয়ে কান্দাহারের পথ চলে গেছে, সেই এলাকা নির্ধারণ করা হয়। এই আক্রমণের জন্য আমরা যোহর নামাজ আদায় করে রওয়ানা হওয়ার সিদ্ধান্ত নেই। সুতরাং আমরা যোহর নামাজ আদায় করি এবং মোল্লা সরদারের নেতৃত্বে তালেবানের জানবাজ এই কাফেলা বাবাজান বসতির দিকে রওয়ানা হই।

বিশ্বরোডে রেকি

বাবাজান বসতিতে গিয়ে আসর নামাজের পর কান্দাহার টু উর্জেগান বিশ্বরোডে এ্যাম্বুশ লাগানোর জন্য তালেবান মুজাহিদীন একত্রিত হয়ে যায়। মোল্লা সরদার আব্দুল মান্নানের নেতৃত্বে তিনজন তালেবান মুজাহিদকে পাঠানো হয় বিশ্বরোড পর্যবেক্ষণ করে জায়গা নির্ধারণ করার জন্য। তাদের রওয়ানা হওয়ার পর মোল্লা সরদার এ্যাম্বুশে বসার জন্য সাথী নির্বাচন করেন। এশার নামাজের পর এ্যাম্বুশে বসার সময় নির্ধারণ করা হয়। আব্দুল মান্নান এলাকায় গিয়ে গোটা এলাকা পর্যবেক্ষণ করেন। এ জন্য তারা রাস্তাগুলো খুব মনোযোগ সহকারে পর্যবেক্ষণ করেন যে, কোন জায়গাটি এ্যাম্বুশের জন্য অধিক উপযোগী হবে? যেখানে আফগান ন্যাশনাল আর্মি এবং সম্মিলিত ক্রুসেডারদের কাফেলাকে থামিয়ে স্পষ্ট ঘোষণা করতে পারবে যে, তালেবান এখন পূর্ণ শক্তিতে তাদের সাথে লড়তে প্রস্তুত। তালেবানের ধারাবাহিক আক্রমণের পর এখন কান্দাহারও তাদের থেকে নিরাপদ নয়। এসব ক্রুসেডারের নিরাপত্তা এতেই নিহিত যে, তারা মুসলমানদের উপর জুলুম নির্যাতন বন্ধ করবে এবং আফগানিস্তান ছেড়ে চলে যাবে। আব্দুল মান্নান তার নির্বাচিত জায়গায় তার সাথে থাকা একজনকে নিযুক্ত করে বলেন, সে যেনো এই জায়গার প্রতি খেয়াল রাখে। অপর একজনকে বাবাজান বসতির দিকে আগত রাস্তায় নিযুক্ত করেন, যাতে দুশমন চালাকি করে আমাদের উপর

এ্যাম্বুশ করতে না পারে। আব্দুল মান্নান এশার নামাজের কিছুক্ষণ আগে বাবাজান বসতিতে ফিরে আসেন এবং সার্বিক অবস্থা মোল্লা সরদারের নিকট বর্ণনা করেন।

কান্দাহার টু উর্জেগান বিশ্বরোডে এ্যাম্বুশ

এশার নামাজের পর আমরা সব তালেবান মোল্লা সরদারের নেতৃত্বে বিশ্বরোডে এ্যাম্বুশ করার জন্য রওয়ানা হই। তথ্য আগেই সংগ্রহ করা ছিলো। পর্যবেক্ষণের জন্য রাস্তায় সাথী নিযুক্ত ছিলো। সে আগেই প্রতি মুহূর্তের সংবাদ সরবরাহ করছিলো। দু'টি গাড়ি এবং ৩টি মোটর সাইকেলে চড়ে তালেবান কাফেলা এগিয়ে চলে। আমরা আধা ঘণ্টার পথ অতিক্রম করার পর নির্বাচিত জায়গায় পৌঁছে যাই। আমাদের ১৫ জন সাথী এই এ্যাম্বুশে অংশ নেয়। তারা দু'টি গ্রুপে বিভক্ত। এই রোডটিকে একটি পানির নালা এমনভাবে ক্রস করেছে যে, সেটির পানি রাস্তার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়। তার সাথে একটি পাহাড় ছিলো, যার উপর এক গ্রুপ এ্যাম্বুশ লাগায়। তারা উর্জেগান থেকে আগত গাড়িগুলো চেক করবে। এই পানির নালার অপর পার্শ্বে একটি পাকা নালা ছিলো, যেটি বাগানে পানি দেয়ার জন্য বানানো হয়েছে এবং রোড থেকে একটু উঁচুতে অবস্থিত। তার উপর অপর গ্রুপ এ্যাম্বুশ লাগায়। এ গ্রুপটি কান্দাহার থেকে আগত গাড়ি চেক করবে। সিদ্ধান্ত হয়, কেবল ফৌজি গাড়িকেই টার্গেট করা হবে, কিন্তু চেক করা হবে সকল গাড়িকেই। কারণ, অনেক সময় সম্মিলিত ক্রুসেডার বাহিনীর সদস্য এবং আফগান ন্যাশনাল আর্মির সদস্যরা তালেবানের ভয়ে রাতে সাধারণ গাড়িতে সফর করে। যেসব গাড়িকে চেক করা হবে সেগুলোতে আমাদের টার্গেট না থাকলে তাদের কোনই ক্ষতি করা হবে না। তবে তাদেরকে নিরাপদে পানির বড় নালাতে রোড থেকে একটু দূরে থামিয়ে রাখা হবে। এ্যাম্বুশ শেষ হলে তাদেরকে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হবে। নিরাপত্তার জন্য তিনজন তালেবান তাদেরকে পাহারা দেবে।

সকল তালেবানের কাজ নির্ধারণ করা ছিলো। কে কোথায় কী কাজ করবে সবকিছুই। এসবের পর আমরা এশার নামাজের এক ঘণ্টা পর কান্দাহার টু উর্জেগান রোডে এ্যাম্বুশ লাগাই। সাথীরা আগের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নিজ নিজ অবস্থানে পজিশন নিয়ে নেয়। রাস্তায় শুধু দু'জন তালেবান নিযুক্ত থাকেন, যাদের একজন কালাশনিকভ এবং অপরজন টিটি পিস্তলে সজ্জিত। তারা কান্দাহার এবং উর্জেগান থেকে আগত গাড়িগুলো থামাবে। এ দু'জন ছাড়া আরো তিনজন তালেবান ছিলেন, যারা গাড়িগুলো তল্লাশি নিবে এবং টার্গেট না

পেলে সেগুলোকে পানির বড় নালায় আড়ারে থামিয়ে রাখবে। এই ধারাবাহিকতা অর্ধেক রাত পর্যন্ত চালু থাকে। কিন্তু কোনো সম্মিলিত ক্রুসেডার অথবা আফগান ন্যাশনাল আর্মির কনভয় রাস্তায় আসেনি, যাদের সাথে যুদ্ধ বাঁধতে পারে। কিন্তু এশা থেকে অর্ধেক রাত পর্যন্ত রাস্তা দখলে রাখা এবং গাড়ি তল্লাশি নেয়ার পদক্ষেপ কান্দাহারের দরজায় তালেবানের করাঘাতের নামান্তর ছিলো। যা পয়গাম দিচ্ছিলো ইনশাআল্লাহ আমাদের আগামী আক্রমণ কাঁচঘেরা অফিসে অবস্থানরত ক্রুসেডারদের উপর হবে। এরপর মোল্লা সরদার সাথীদেরকে ফিরে যাওয়ার হুকুম দেন। সব সাথী এ্যাম্বুশ থেকে বের হয়ে গাড়িতে উঠে বাবাজান বসতিতে ফিরে আসেন।

তালেবানের অসাধারণ বৈঠক

মোল্লা তোর নকিবের দেখার মতো এবং দেখানোর মতো আক্রমণের পর খাকরিজ, মিঞাশিন, শাহ ওলিকোট এবং শিন জেলার ভিনদেশি সম্মিলিত ক্রুসেডার বাহিনী বহিষ্কৃত হয়েছে। আফগান ন্যাশনাল আর্মির সদস্যরা তাদের জিন্দেগির দিনগুলো তালেবানের সাথে সমঝোতা করে কাটাচ্ছে। যারফলে এমনিতেই অঘোষিতভাবে এই জেলাগুলোতে তালেবান হুকুমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এতে তালেবানের উপর কিছু বড় বড় দায়িত্ব এসে গেছে। সেসব দায়িত্ব আদায় করা এবং সামলানোর জন্য পরিকল্পনা তৈরি করতে আজ শিন বসতিতে চার জেলার সাধারণ জিম্মাদারদেরকে কারী ফয়জুল্লাহ সাহেবের নেতৃত্বে একটি বৈঠক ডাকা হয়েছে। এখানে উক্ত চার জেলার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বশীলগণও উপস্থিত হয়েছেন। এই বৈঠক যোহরের পর শুরু হয়ে আসরের কিছুক্ষণ আগ পর্যন্ত চলমান থাকে।

বৈঠকের ঘোষণা

আসর নামাজ আদায়ের পর মোল্লা আব্দুশ শুকুর কারী ফয়জুল্লাহ সাহেবের অনুমতিক্রমে আল্লাহর প্রশংসা আদায় করার পর বৈঠকের ঘোষণাপত্র পাঠ করেন। যা ছিল নিম্নরূপ:

খাকরিজ, মিঞাশিন, শিন এবং শাহ ওলিকোট– এই চার জেলা থেকে ক্রুসেডার বাহিনী পালিয়েছে। এখন এসব এলাকার জনসাধারণের জান, মাল এবং ইজ্জতের হেফাজতের দায়িত্ব তালেবানের উপর এসেছে। সুতরাং-

১. এসব জেলায় কার্যত তালেবানের হুকুমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাই আল্লাহর বিধি-বিধান বাস্তবায়নের পূর্ণ চেষ্টা করা হবে।

২. এসব জেলাতে জনসাধারণের নিত্যদিনের মামলা মুকাদ্দামা, ঝগড়া-বিবাদ এখন থেকে ক্রুসেডারদের আদালতে পেশ হবে না বরং তালেবানের নিযুক্ত লোকেরা সমাধান করবেন।

৩. অন্যান্য জেলায় যেসব তালেবান যুদ্ধরত রয়েছেন তাদেরকে নৈতিক, আর্থিক এবং সামরিক পূর্ণ সহযোগিতা করা হবে। যাতে সেখানকার ক্রুসেডাররাও দ্রুত থেকে দ্রুত সময়ে বহিষ্কৃত হয়।

জেলার দায়িত্বশীলগণ

ঘোষণাপত্র পাঠের পর মোল্লা আব্দুশ শুকুর বলেন, কারী ফয়জুল্লাহ সাহেব নিম্নলিখিত ব্যক্তিদেরকে চার জেলার দায়িত্বশীল নিযুক্ত করেন–

১. খাকরিজে মোল্লা আব্দুশ শুকুর।
২. শিনে মৌলভী বায মুহাম্মাদ।
৩. মিঞাশিনে মোল্লা তোর নকিব এবং কারী ফয়জুল্লাহ।
৪. শাহ ওলিকোটে মোল্লা সরদার।

তালেবানের আদালতি ফায়সালা

এই বৈঠকের আলোকে তালেবানের উপদেষ্টাগণ জনসাধারণের নিত্যদিনের মামলা মুকাদ্দামার ফায়সালা করতে শুরু করেন। তাদের জন্য কর্মস্থল তৈরি করতে শুরু করেন। যারফলে খুব সাহসী ফলাফল আসতে থাকে। এ ছাড়া তালেবান মুজাহিদীন বিদেশি ক্রুসেডারদেরকে জাবেল, হেলমন্দ, নিমরোজ, উর্জেগান, পাকতিয়া, পাকতিকা, গজনি, ভিরদাক, ফারাহ এবং কান্টার এসব প্রদেশের এয়ারপোর্ট এবং ছাউনির মধ্যে তাদেরকে সীমাবদ্ধ থাকতে বাধ্য করেন। হ্যাঁ, কখনো কখনো ক্রুসেডার ফৌজ যখন নিজেদের ছাউনি থেকে বের হয় তখন যুদ্ধ হয়ে যায়। যদিও ক্রুসেডার সৈন্যরা এলাকাতে বেশিরভাগ টহল হেলিকপ্টারেই করে থাকে। উল্লেখিত সবগুলো প্রদেশে তালেবানের নিয়মতান্ত্রিক শরয়ী আইন চলছে। এখন তালেবানরা উত্তরাঞ্চলেও তাদের নেটওয়ার্ক বাড়াতে এবং সম্মিলিত ক্রুসেডারদের উপর হামলা করতে শুরু করেছেন। কন্দুজ, বাগলান, মাজার শরীফ এবং শিবারগান ইত্যাদি এলাকাতে তালেবানরা তাদের কাজ শুরু করেছেন। তালেবানের দিন দিন বাড়তে থাকা বিজয় সেসব এলাকার সাধারণ মানুষরাও ব্যাপকভাবে গ্রহণ করে নিচ্ছেন।

আগামী দিনগুলোতে তালেবানের পক্ষে সাধারণ মানুষের সমর্থন ব্যাপক হারে বাড়তে থাকবে। উল্লেখিত আদালতি নিয়মের রক্ষণাবেক্ষণ নির্ভরযোগ্য

আলেমগণ করে থাকেন। নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্য অপরাধীকে পূর্ণ সুযোগ দেয়া হয়। যারফলে বাদি এবং বিবাদি উভয়ের কথা শুনে দায়িত্বশীল তালেবান সঠিক ফায়সালা দেন। তালেবানের এই আদালতি আইনে ঘুষখুরি এবং সুপারিশের কোথাও কোনো জায়গা নেই।

প্রেমের পরীক্ষা আরো বাকি

শিন বসতিতে তালেবানের বৈঠক এবং বিভিন্ন জেলার দায়িত্বশীল নির্ধারণ করার পর কিছুটা প্রশান্তি ফিরে আসে। ভাবতে থাকি এখন কিছুদিন শান্তি এবং নিশ্চিন্তে থাকার সুযোগ হবে। গত ৩/৪ মাস যাবত ধারাবাহিক আক্রমণ এবং দুশমনের পিছু নেয়ার যে চাপ মাথার উপরে ছিলো তা থেকে মুক্তি মিলবে। কিন্তু মরহুম কবি আল্লামা ইকবালের বাণী অনুযায়ী এখনো মহব্বতের পরীক্ষা আরো বাকি ছিলো। যা আমাদেরকে উত্তীর্ণ হতে হবে।

ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ::

یہاں سنکڑوں کارواں اور بھی ہے

تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا ::

تیرے سامنے آسمان اور بھی ہیں

নক্ষত্ররাজির উর্ধ্বেও আরো জগৎ আছে
সেখানে লাখো কাজ এখনো বাকি আছে।
তুমি বাজ পাখি তোমার কাজ, তুমি ওড়ো
তোমার সামনে আসমান বাকি আরো।

আমি শিন বসতিতে মোল্লা আব্দুশ শুকুরের সাথে চুনার চলে আসি। আমরা এখানে এসেছি মাত্র দু'দিন হলো। একদিন আমি যখন বাগানে ঘোরাফেরা করে মেহমানখানায় ফিরে আসছিলাম তখন মোল্লা আব্দুশ শুকুর আমাকে জিহাদের ফজিলত শোনান এবং তালেবানের গোটা আফগানের যুদ্ধ বিষয়ক দায়িত্বশীল মোল্লা বেরাদারের সংবাদ দেন। তিনি আমাকে কেজিবির এজেন্ট, কমিউনিস্ট নেতা এবং উত্তরাঞ্চলীয় জোটের কুখ্যাত খুনী কমান্ডার আব্দুর রশিদ দোস্তামের বিরুদ্ধে আক্রমণের জন্য নির্বাচিত করেন। মোল্লা আব্দুশ শুকুর তার পাশে বসা একজন মুজাহিদের দিকে ইশারা করে বলেন, আপনি তার সাথে মাজার শরীফ যেতে প্রস্তুতি নিন। কাল সকালে আপনি এখান থেকে রওয়ানা হবেন। তারপর সেই দিনটি এভাবেই গল্প করে কাটিয়ে দেই।

দোস্তামের জীবন এবং বর্বরতা

উজবুক গোত্রের আব্দুর রশিদ দোস্তাম ১৯৫৫ সালে জুরজান প্রদেশের শহর শিবারগান এর উপকূলীয় গ্রামের এক গরীব ঘরে জন্মগ্রহণ করে। দোস্তাম গতানুগতিক সাধারণ শিক্ষা লাভ করে। ১৯৭৮ সালে আফগান সেনাবাহীনিতে ভর্তি হওয়ার আগে ক্ষেত খামারে কাজ করতো। তার মাথার চুল সাদা। বড় চোয়াল এবং ধূসর চোখ বিশিষ্ট চেহারায় কোনো লাবণ্য নেই। মদের উপর তার চরম আসক্তি। দোস্তাম উত্তরাঞ্চলীয় জোটের এক শক্তিধর যুদ্ধবাজ নেতা। তার উচ্চতা ৬ ফুট। সে এক বিশাল দেহের অধিকারী। দেখতে তাকে মানবাকৃতির ভালুক মনে হয়। সে যখন হাসে তখন মনে হয় সে অহংকার করছে। জেনারেল আব্দুর রশিদ দোস্তাম উজবুক বংশদ্ভুত। উজবুক অর্থ হলো স্বেচ্ছাচারী। উজবুকরা নিজেদেরকে চেঙ্গিসখানের মোঘলদের সাথে সম্পৃক্ত করে। যাদের একটি শাখা শানেবাই গোত্র ১৫০০ সালে নতুন উজবেকিস্তান এবং উত্তর আফগানিস্তান বিজয় করে। উজবুকরা বদমেজাজি, ধূর্ত এবং বিদ্রোহী মনোভাবাপন্ন হয়ে থাকে। আর এ জন্যই উজবুকদের শক্তি অর্জনের ইচ্ছা আজও আগের মতোই রয়ে গেছে। জেনারেল আব্দুর রশিদ দোস্তামের ব্যক্তিগত উপাধি 'দোস্তাম'। যার অর্থ উপচে পড়া বন্ধুত্ব। কিন্তু দোস্তাম তালেবানের উপর জুলুমের পাহাড় চাপিয়ে বর্বরতার ক্ষেত্রে চেঙ্গিস খান এবং হালাকু খানকেও ছাড়িয়ে গেছে। তাই যদি তার উপাধিতে 'জের' দিয়ে দেয়া হতো তাহলে সেটাই হতো তার জন্য যথার্থ। এ ক্ষেত্রে 'দোস্তাম' হয়ে যেতো 'দোসেতাম' তথা বিশ্বাস ঘাতক। আর ইতিহাসে আব্দুর রশিদ দোস্তাম তালেবানের সাথে বহু বিশ্বাস ঘাতকতা করেছে। যারফলে তালেবানের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে।

১৯৯৭ সালে তালেবানের সাথে গাদ্দারি করাদের মধ্যে জেনারেল দোস্তাম এবং জেনারেল মালেক উভয়ে শরিক ছিলো। তালেবানকে নির্দয়ভাবে হত্যা করা এবং দাশতে লাইলা[১৬]তে দাফন করার ক্ষেত্রে তারাই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। দোস্তাম সেসব মজলুম ও নিরুপায় ৮ হাজার তালেবানের দায়িত্ব জেনারেল মালেকের হাতে দেয়। কয়েদিদের এই বলে নিয়ে যাওয়া হয় যে, তাদেরকে হস্তান্তর করা হচ্ছে। তারপর তাদেরকে ট্রাকে উঠিয়ে নিয়ে কূপের মধ্যে জীবিত ফেলে দেয়া হয়। যেসব কয়েদি বাধা দিতে চাইতো তাদেরকে গুলি করে কূপে ফেলে দেয়া হতো। তারপর তাদের উপর হাত বোম মেরে কূপ বন্ধ করে

---

[১৬]. লাইলা মরুভূমি।

দিতো। কিছু কিছু প্রত্যক্ষদর্শীর মতে, কয়েদিদেরকে দাশতে লাইলাতে নিয়ে যেতো এবং ১০ জন করে সারিবদ্ধ করে গুলি করা হতো। তারপর কূপে ফেলে দেয়া হতো। এই কাজ ধারাবাহিকভাবে ৬ রাত পর্যন্ত চালু থাকে।

আমেরিকার সন্ত্রাসী হামলার পরও দোস্তাম তার এই ভূমিকাই পালন করতে থাকে। কন্দুজে মুজাহিদীনের সাথে চুক্তি করার পর তাদেরকে কন্টিনারে করে মরুভূমিতে নিয়ে যেতো এবং গাদ্দারি করে শহীদ করে দিতো। তারপর গণকবরে দাফন করে দিতো।

২০০৪ সালের শুরুর দিকে সংবাদ আসে, আমেরিকা আফগানিস্তানে যুদ্ধাপরাধ বিষয়ক আদালত প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করে। এ বিরোধিতার কারণ স্পষ্ট হয় তখন, যখন আইরিশ সাংবাদিক 'জিমি ডোরান' জার্মান পার্লামেন্টে ২০ মিনিটের ফিল্ম The Afghan Massacre, The convey of Death দেখায় এবং তা জনসম্মুখে প্রকাশ পায়। যার মধ্যে মাজার শরীফ এবং শিবারগানে পাওয়া দু'টি গণকবরের দৃশ্য দেখানো হয়। তাতে প্রায় ৩ হাজারের মতো তালেবান, আরব এবং পাকিস্তানি মুজাহিদীন চির নিদ্রায় শায়িত আছেন। উভয় গণকবর থেকে মানব দেহের অঙ্গপ্রতঙ্গ বাহির থেকেই দেখা যাচ্ছিলো। মাজার শরীফ ও শিবারগান উভয় এলাকা উজবুক জঙ্গী কমান্ডার আব্দুর রশিদ দোস্তামের নিয়ন্ত্রণে ছিলো। অবশ্য ২০০৬ থেকে বর্তমান পর্যন্ত মাজার শরীফ তাজুক কমান্ডার উস্তাদ আতা এর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

এই সেই আব্দুর রশিদ দোস্তাম, যার নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতা বিশ্বখ্যাত। সেগুলোর মধ্যে শহীদ তালেবানের একটি গণকবর আব্দুর রশিদ দোস্তামের পিতৃ এলাকা 'জুনবাশে মিলি'র হেড কোয়ার্টার শিবারগান থেকে আধা ঘন্টার দূরত্বে অবস্থিত। গণকবরটি দুই লক্ষ পঁচিশ হাজার ছয়শ পঁচিশ বর্গফুট জায়গা জুড়ে বিস্তৃত। অর্থাৎ দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ প্রায় ৪৭৫ ফুট করে। সেখানে তিন হাজার শহীদ তালেবান শায়িত আছেন।

দোস্তাম সীমাহীন জালেম এবং নিষ্ঠুর ব্যক্তি। আহমদ রশিদ তার 'তালেবান' নামক গ্রন্থে লেখেন, যখন আমি দোস্তামের সাথে সাক্ষাৎ করতে তার কাছে পৌঁছি তখন সে জঙ্গী কেল্লায় অবস্থান করছিলো। জঙ্গী কেল্লার আঙ্গিনায় ছোপ ছোপ রক্তের দাগ এবং বিক্ষিপ্ত গোশতের টুকরো ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলো। জিজ্ঞেস করলে বলা হয়, এক ঘন্টার অধিক সময় ধরে দোস্তাম এক সিপাহীকে চুরির অপরাধে শাস্তি দেয়। তাকে ট্যাংকের সাথে বাঁধা হয় এবং এক চক্কর ট্যাংক চালানো হয়। ফলে তার দেহ কিমা হয়ে যায়। দোস্তাম এবং তার রক্তপিপাসু সৈন্যরা তা খুব আগ্রহের সাথে দেখতে থাকে।

দোস্তামের হিংস্রতার আরেক অধ্যায় হলো সে বুজকাশির আশক্ত ছিলো। এটি দক্ষিণ আফগানিস্তানের একটি প্রচলিত খেলা। দোস্তাম এবং তার রক্তপিপাসু কমান্ডাররা শিবারগানের মরুভূমিতে এটি খেলে থাকে। বুজ শব্দের অর্থ বকরি। এই খেলায় ঘোড়সাওয়ার একটি দল একটি মৃত বকরিকে মাঠের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে নিয়ে যেতে প্রচেষ্টা চালায়। আর বিপক্ষ দল তাদের থেকে বকরি ছিনিয়ে বিপরীত প্রান্তে নিয়ে যেতে চেষ্টা করে। কেউ হারতে রাজি নয়। তীক্ষ্ণ ধারালো ফলা বিশিষ্ট বর্ষা হাতে নিয়ে ঘোড়াকে চাবুক মারতে থাকে। এতে রক্ত প্রবাহিত হয়, হাড্ডি ফেটে যায় এবং মাঠ রক্তাক্ত হয়ে যায়। দোস্তামের সাথী বলেন, এই বিপজ্জনক খেলা রক্তপিপাসু দোস্তামের রক্তের সাথে মিশে আছে। প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে তার বংশের কিছু না কিছু প্রভাব থাকে। আমার অনুসন্ধান মতে, দোস্তামের একটি বংশধারা পশুত্বের নিদর্শন বহন করে। মাথার খুলির মিনার তৈরিকারী রক্তপিপাসু চেঙ্গিস খানের সাথে তার এই বংশধারা মিলে যায়। আর অপর বংশধারা অনুযায়ী সে উজবুক। যার অর্থ স্বেচ্ছাচারী। এই দুই বংশধারার প্রভাবের ভিত্তিতেই দোস্তাম রক্তপিপাসু।

১৯৭৮ সালে আফগানিস্তানে কমিউনিস্ট বিপ্লব সংঘটিত হয়। নুর মুহাম্মাদ তারাহকাই নেতৃত্বে আসলে দোস্তাম সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়। আমু নদীর বন্দর দিয়ে যেসব জিনিস সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে আফগানিস্তানে আসতো, দোস্তাম সেগুলোর সাপ্লাই লাইনের নিরাপত্তায় নিযুক্ত ছিলো। ১৯৮০ সালের অক্টোবরে সে মিলিশিয়া ব্যাটালিয়নের কমান্ডার নিযুক্ত হয়। তারপর এক ডিভিশন ফৌজের কমাণ্ডিংয়ের দায়িত্ব তার হাতে দেয়া হয়। ১৯৮৮-৮৯ সালে রুশরা আফগানিস্তান থেকে বের হয়ে যায়। তখন দোস্তামের ডিভিশন সৈন্য বিশেষ গুরুত্ব পায়। মুজাহিদীনের আক্রমণাত্মক হামলার কারণে যখন সরকারি ফৌজ নিজের ঘর সামলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, তখন কমিউনিস্ট প্রধান নজিবুল্লার একমাত্র ভরসা ছিলো দোস্তামের রুশি মদদপ্রাপ্ত অনিয়মতান্ত্রিক ফৌজ। যা কট্টর উজবুকদের নিয়ে গঠিত ছিলো। ড. নজিবুল্লাহ তাকে মুজাহিদীনের বিরুদ্ধে দ্রুতগামী ফোর্স হিসেবে ব্যবহার করতে থাকে।

দোস্তাম যখন দেখলো, ড. নজিবুল্লার হুকুমত কয়েক দিনের মেহমান মাত্র; শেষ পর্যন্ত তাকে ক্ষমতা থেকে বিদায় নিতেই হবে, তখন সে কমিউনিস্ট লিডার ড. নজিবুল্লার সাথে বিদ্রোহ করে আহমদ শাহ মাসউদের দলে যোগ দিয়ে কমিউনিস্ট হুকুমত বিলুপ্ত করতে মৌলিক ভূমিকা পালন করে। দোস্তাম মাজার শরীফ দখল করে 'জুনবাশ মিলি ইসলামী' নামক একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে।

বিগত বছরগুলোতে আফগানিস্তানে জাতিগত গোষ্ঠীগুলোর অবস্থা এমন ছিলো যে, সমস্যা হলে কারো সাথে হাত মিলাতো আবার সুযোগে তার পিঠে খঞ্জর মেরে দিতো। তাদের মধ্যে দোস্তাম সবাইকে ছাড়িয়ে যায়। সে ঐক্য করতে থাকে এবং তা ভাংতে থাকে। প্রথমে সে জমিয়তে ইসলামীর তখনকার কমান্ডার আহমদ শাহ মাসউদের সাথে ঐক্য করে। তারপর মাসউদের দুশমন গুলবদ্দিন হেকমতিয়ারের সাথে ঐক্য করে। সবশেষে উল্লেখিত দু'জনেরই দুশমন তালেবানের সাথে সঙ্গ দেয়। যদিও তালেবানের সাথে তার ঐক্য চুক্তিপত্রের কালি শুকানোর আগেই ভেঙ্গে যায়। এরই মধ্যে জুনবাশ মিলি ইসলামী-এর শীর্ষনেতৃত্ব ও ব্যক্তিত্বশীলদের মধ্যে বুজকাশির মতোই মতানৈক্য দেখা দেয়। ব্যক্তিত্বের লড়াইয়ে প্রথমে দোস্তামকে তার সহকারী আব্দুল মালেক গ্রুপের হাতে পিছু হটে তুর্কীদের কাছে আশ্রয় নিতে হয়। তারপর দোস্তাম ফিরে এলে আব্দুল মালেক গ্রুপকে তাদের পরিবারসহ উজবুক চলে যেতে হয়। এই রক্তারক্তি সংঘর্ষে ব্যাপকহারে ধ্বংসযজ্ঞ, হেলিকপ্টার ধ্বংস এবং কয়েকটি নাটকীয় ঘটনা সামনে আসে।

দোস্তাম প্রত্যেকবার কোনো প্রকার চিন্তাভাবনা ছাড়াই সবার সাথে গাদ্দারি করে। দোস্তাম প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই বেতনভূক্ত থাকে। দোস্তাম রুশ, উজবেকিস্তান, ইরান, পাকিস্তান এবং পরে তুর্কিদের থেকে আর্থিক সহযোগিতা নেয়। ১৯৯৫ সালে দোস্তাম একই সময়ে পাকিস্তান এবং ইরান দু'দেশ থেকেই টাকা নিতে থাকে। অথচ ইরান এবং পাকিস্তানের মধ্যে কঠিন জাতিগত বিরোধ রয়েছে। ইরান, উজবেকিস্তান এবং রাশিয়া তাকে সেকুলার লিডার হিসেবে উৎসাহিত করে। তারা মনে করে, সে কেবল পশতুনবাদীদের বিরুদ্ধে জঙ্গী কেল্লার কাজ দিতে পারে এবং উত্তর আফগানকে তালেবানের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে। এসব দেশের তত্ত্বাবধানে তার কোনো গুণ থেকে থাকলে তা হলো সে তালেবান জনসম্মুখে আসার আগেও মুজাহিদীনের দুশমন ছিলো। তালেবানের আক্রমণে দোস্তাম পালিয়ে তুরস্কে চলে যায়। কিন্তু ২০০১ সালে আমেরিকান ক্রুসেডারদের হামলার পর দোস্তাম আফগানিস্তান ফিরে আসে। সে আমেরিকার ছত্রছায়ায় মাজার শরীফ, রাজিয়া সুলতানা স্কুল, কেল্লায়ে জঙ্গী, শিবারগান জেল ও দাশতে লাইলাতে মুজাহিদীনকে গণহত্যা করে এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের রেকর্ড করে। আমেরিকান পত্রিকা 'নিউ টাইমস' মে ২০০২ সংখ্যায় দোস্তামকে ঠগবাজ জঙ্গী সরদার আখ্যায়িত করে বলে, এই উজবুক জেনারেল নিজের চেহারা পরিবর্তন করে নিয়েছে। দাড়ি মুণ্ডিয়ে ফেলেছে এবং তার সাথে ঘন গোফ রেখেছে। সাথে কিছু নতুন নির্লজ্জ নারী খরিদ করেছে।

কাবুলে অবস্থানরত এক ইউরোপিয়ান পর্যটক বলেন, দোস্তাম রাজনীতিবিদে রূপান্তরিত হওয়ার সফরও অধিকাংশ আফগান নেতাদের বদৌলতে খুব দ্রুতই শেষ করেছে। দোস্তাম এমন এক যুদ্ধবাজ সরদার, যে কেবল ফৌজি মুখোশ খুলে ব্যবসায়ী কোট পরিধান করেছে। কিন্তু এখনো তার পাশে তার ব্যক্তিগত ফৌজ রয়েছে। তার কমান্ডিংয়ে থাকা যুদ্ধবাজ সৈন্যরা পরস্পরে লড়াই করে নিঃশেষ হয়ে গেছে। তারপরও সে তখন প্রায় ৭ হাজার সৈন্যের জেনারেল ছিলো। দোস্তামের অধীনস্ত এলাকা জুরজান, শ্রিপুল, বলখ ফারইয়াব এবং সমঙ্গানের সীমান্ত উজবেকিস্তান ও তুর্কমিনিস্তানের সাথে মিশেছে। এসব গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক শহরগুলোতে ব্যবসা এবং রাষ্ট্রীয় ট্যাক্স দোস্তাম ও তার কমান্ডার নিজেদের মৌজ-মাস্তিতে খরচ করে। দোস্তামের লোকেরা তাকে জেনারেল সাহেব, আলহাজ্ব আব্দুর রশিদ দোস্তাম এবং দোস্তাম বাদশাহ নামে স্মরণ করে। এসব এলাকার সরকারি অফিস-আদালত এবং পাবলিক গাড়িগুলোতেও জেনারেল দোস্তামের বড় বড় ছবি লাগানো আছে।

আফগানিস্তানে ২০০৪ সালে অনুষ্ঠিত সংসদ নির্বাচনে আব্দুর রশিদ দোস্তাম প্রতিরক্ষামন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ার আগে আমেরিকান পত্রিকা 'ওয়ালস্ট্রিট জার্নাল' একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে, যাতে এক সাংবাদিক ঘুরতে ঘুরতে দক্ষিণ আফগানের শহর শিবারগান চলে যায়। এই শহরটি আব্দুর রশিদ দোস্তামের নিয়ন্ত্রণে ছিলো। সাংবাদিক লেখেন, দোস্তামের ঘোড়সাওয়ার ফৌজ যখন রাস্তা দিয়ে যায় তখন রাস্তায় চলমান নারীরা ভয়ে তাদের চেহারা ঢেকে নেয় এবং এদিক-ওদিক পালিয়ে যায়। সাংবাদিক আরো লেখেন, তালেবানের যুগে নারীরা তালেবানদের দেখা ছাড়াই পর্দা করতো। কারণ, আফগানিস্তানে ইসলামী আইন অনুযায়ী নারীদের জন্য বেপর্দা চলার অনুমতি ছিলো না। তাই তালেবানের দেখা ছাড়াই তারা পর্দা করতো। কিন্তু দোস্তামের সৈন্য দেখে নারীরা এজন্য পর্দা করে যে, সৈন্যরা মৌজ-মাস্তি এবং কুকর্মের জন্য নারীদেরকে রাস্তা থেকে উঠিয়ে নিয়ে যায়।

২০০৫ সালে দোস্তাম আফগানিস্তানের চিফ অব আর্মি স্টাফ নিযুক্ত হয়। দোস্তাম এই পদে ভূষিত হওয়ার ৫ মাস আগেই তাকে আমেরিকা চিফ অব আর্মি স্টাফ হওয়ার সিদ্ধান্ত দিয়েছিলো। যারফলে আফগানিস্তানের নেতৃস্থানীয় লোক, পশতুন, তাজুক এবং হাজারাহসহ সকল গোত্রের মন্ত্রীদের তীব্র সমালোচনার মুখে পড়ে। ২০০৫ সালের ২০ জানুয়ারিতে দোস্তামের উপর এক আত্মঘাতি হামলা হয়। এ সময় দোস্তাম শিবারগানের জামে মসজিদে ঈদুল আযহার নামাজ আদায় করে জনসাধারণের সাথে সাক্ষাৎ করছিলো। হঠাৎ

কয়েক মিটার দূরে একজন আত্মঘাতি হামলাকারী নিজেকে উড়িয়ে দেয়। এ সময় দোস্তাম অল্পের জন্য বেঁচে যায়। কিন্তু এতে বেশ কয়েকজন নিহত এবং আহত হয়। এরপর থেকে দোস্তাম জনসাধারণের মাঝে আসতে ভয় পায়। আফগানিস্তানে আমেরিকার ক্রুসেডীয় হামলা ছিলো ইমারাতে ইসলামিয়া শেষ করার জন্য। সেই সাথে আফগানিস্তানের খনিজ সম্পদ হাত করাও তাদের উদ্দেশ্য ছিলো। সেই ধারাবাহিকতায় ২০০৫ সালে আফগান শিল্প মন্ত্রণালয় এবং আমেরিকার মধ্যে আফগানিস্তানের খণিজ সম্পদের ব্যাপারে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। যার মধ্যে উত্তরাঞ্চলে মজুদ মূল্যবান হীরা-জহরতের খনিও শামিল ছিলো। এগুলোর মধ্যে কোট পরিহিত প্রধানমন্ত্রী হামিদ কারজাইয়ের কব্জায় ১০ ভাগ এবং আব্দুর রশিদ দোস্তামের কব্জায় ৫ ভাগ ছিলো। আর এরাই এই চুক্তি বাস্তবায়নের পথে একমাত্র বাধা ছিলো।

আমেরিকা গোপন চক্রান্ত করে হামিদ কারজাইয়ের মাধ্যমে দোস্তামের কব্জায় থাকা খনিগুলো রাষ্ট্রীয় কব্জায় ফিরিয়ে দিতে নোটিশ পাঠায়। আমেরিকা এবং আব্দুর রশিদ দোস্তাম মুখোমুখি হওয়া এটাই প্রথম ছিলো। যারফলে আমেরিকা আফগান হিউম্যান রাইটস কমিশনের নেতৃত্বে তদন্তের মাধ্যমে জাতিসঙ্ঘের সহায়তায় একটি রিপোর্ট তৈরি করে। যার মধ্যে আফগানিস্তানের কমান্ডারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধ এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ আনা হয়। এতে সবচেয়ে বেশি অভিযোগ আনা হয় আব্দুর রশিদ দোস্তামের বিরুদ্ধে, যার সংখ্যা ৬ শ'রও অধিক। তার বিরুদ্ধে হাজারো মানুষকে হত্যার অভিযোগ ছিলো। তা ছাড়া মাজার শরীফ এবং কুন্দুজ পরাজয়ের পর হাজারো মুজাহিদীনকে শহীদ করার অপরাধেও সে অপরাধী। মানবাধিকার কমিশন দোস্তাম এবং অন্যান্য কমান্ডারের বিরুদ্ধে শতাধিক পৃষ্ঠার প্রমাণ যোগান দিতেও প্রস্তুত ছিলো।

এই রিপোর্ট প্রকাশ হওয়ার পর যদিও কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি, কিন্তু এই রিপোর্ট আমেরিকানদের খুব কাজে আসে। দেখতে দেখতে আমেরিকা এবং আব্দুর রশিদ দোস্তামের মধ্যে বন্ধুত্ব হয়ে যায়। খনিজ সম্পদ থেকে হাত গুঁটিয়ে নিতে আব্দুর রশিদ দোস্তামকে পনের কোটি ডলার, কাবুলে আলিশান প্রাসাদ, নতুন মডেলের কয়েকটি গাড়ি দেয়া হয়। এভাবে আমেরিকা এই যুদ্ধবাজকে উত্তর আফগানিস্তান থেকে বের করে কাবুলের রঙিন জগতে নিয়ে আসে। আমেরিকা দোস্তামকে কাবুলে এনে জাতিসঙ্ঘের ডিডিআর প্রোগ্রামের মাধ্যমে অস্ত্রমুক্ত করতে রাজি করিয়ে ফেলে। দোস্তাম যে সেনাবাহিনীর দাপটে উত্তর আফগানিস্তানে রাজত্ব করতো, সেই বাহিনী অস্ত্রমুক্ত হয়ে যায়। এখনো দোস্তাম এবং তার রক্তপিপাসু কমান্ডারদের জখম শুকায়নি, এরই মধ্যে তার সর্বশেষ

শক্তি, নিজ হাতে গড়া সংগঠন 'জুনবাশ মিলি ইসলামী' থেকে ৭ এপ্রিল ২০০৫ সালে বাধ্য হয়ে ইস্তফা নিতে হয়। যার সত্যায়ন করে তার স্থলাভিষিক্ত রক্তপিপাসু কমান্ডার জেনারেল মাজিদ রুজি। আমেরিকা এমনিভাবে আফগানিস্তানের সবচেয়ে বড় যুদ্ধবাজ শক্তিকে মাকড়সার জালের মতো ভেঙ্গেচুড়ে তছনছ করে নিজেদের অনুগত করে নেয়। কিন্তু সম্ভবত আমেরিকা দোস্তামের গিরগিটির মতো রঙ্গ পরিবর্তনের স্বভাব সম্পর্কে অবগত নয়।

দোস্তামের জীবন ও হিংস্র কর্মকাণ্ডের অতীত ও বর্তমান অবস্থার বিস্তারিত বিবরণ শেষে ইতিহাসে দোস্তাম কয়েকটি আকৃতিতে সামনে আসে– কখনো সে রুশ তত্ত্বাবধানে কমিউনিস্ট হয়ে মুজাহিদীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে; কখনো মুজাহিদ হয়ে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে; আবার মুজাহিদীনের সাথে মিলে যাওয়ার পর পরস্পরে গৃহযুদ্ধের লড়াইয়ে বিদ্রোহী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে; কখনো তালেবানের সাথে ঐক্য করে চুক্তিভঙ্গের মাধ্যমে মুনাফিকের কলঙ্ক নিজের মাথায় উঠিয়েছে; এবং সবশেষে আমেরিকার গোলামির লাঞ্ছনা গলায় পরিধান করেছে। দোস্তাম যেনো একই সময়ে কমিউনিস্ট, মুজাহিদ, বিদ্রোহী, মুনাফিক এবং গোলাম– সবকিছুর দায়িত্বই পালন করেছে।

কামাল শহীদ রহ.

এসব অবস্থাদি ও ঘটনাবলি আব্দুর রশিদ দোস্তামের জিন্দেগি ও বর্বরতার সংক্ষিপ্ত ঝলক মাত্র। এগুলোর উপর ভিত্তি করে তালেবানের নেতৃত্বে এই রক্তপিপাসু নেকড়ের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। তাই তালেবানের যুদ্ধবিষয়ক জিম্মাদার মোল্লা আব্দুল গনি বেরাদার দা.বা. পূর্ণ দূরদর্শিতার প্রকাশ করতে তার ডানহাত কামাল শহীদ রহ.কে আমার সাথে পাঠান। তিনি আব্দুর রশিদ দোস্তামের পিতৃ এলাকা শিবারগানের বাসিন্দা ছিলো। তিনি গোটা আফগানিস্তানে তালেবান কমান্ডারদের যুদ্ধাস্ত্র (যেমন ট্যাংক, মাইন, গুলি, গান, বারুদ, প্রাইমা কার্ড, রিমোট কন্ট্রোল প্রভৃতি) যোগান দেয়ার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

কামাল শহীদ রহ. কামেল আলেম এবং উত্তম চরিত্রের লোক ছিলেন। তিনি নামাজ রোযা পালন করা এবং ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সর্ব প্রকার কুরবানী দিতে তৈরি থাকতেন। কামাল শহীদ রহ. এর মুখে দাড়ি কম ছিলো এবং গায়ের রং ছিলো গৌর বর্ণের। আমি এবং কামাল শহীদ যখন আব্দুর রশিদ দোস্তামের উপর ব্যর্থ আক্রমণের পর ফিরে আসছিলাম, তখন কামাল শহীদ রহ. কোয়েটায় চলে যান। সেখানে তার পিতামাতা, স্ত্রী এবং সন্তানরা থাকতো। এক

রাতে অনাকাঙ্ক্ষিত এক ঘটনায় কামাল তার মা, স্ত্রী ও একটি শিশু সন্তানসহ শহীদ হয়ে যান।

মঞ্জিলের দিকে রওয়ানা

মোল্লা আব্দুশ শুকুর থেকে নতুন পরামর্শ নিয়ে এশার নামাজ আদায় করি। এরপর আমরা আরাম করার জন্য চলে যাই। পরদিন মোল্লা আব্দুশ শুকুরের পরামর্শ অনুযায়ী চুনারের ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে চলে আসে। তার দায়িত্ব ছিলো আমাকে এবং কামাল শহীদকে নিরাপদে কান্দাহার পৌছানো। আমরা যোহরের নামাজ রাস্তায় আদায় করি এবং প্রায় তিনটার দিকে কান্দাহার পৌছে যাই। গাড়ির ড্রাইভারকে কামাল শহীদ মেইন রোডেই গাড়ি থামাতে ইশারা করেন। আমরা দু'জনই ড্রাইভার থেকে অনুমতি নিয়ে গাড়ি থেকে নিচে নামি। আমাকে কান্দাহারের এক নিরাপদ জায়গায় পৌছে দিয়ে কামাল শহীদ স্টেশন থেকে পরদিন কাবুলে যাওয়ার টিকেট সংগ্রহ করে আনেন। আমরা দিনটি কান্দাহারে কাটাই এবং কিছু প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয় করি। পরদিন সকাল ৫ টায় আমরা কান্দাহার থেকে কাবুলের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। কান্দাহার থেকে বাইরে বের হয়ে অবস্থা দেখে অবাক হয়ে যাই। কাবুল টু কান্দাহার বিশ্বরোড যুদ্ধের কারণে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু এখন খুবই আরামদায়ক, প্রশস্ত এবং শানদারভাবে নির্মাণ করা হয়েছে। সড়কের ডান পাশে শহীদানের কবরস্থান। সেগুলোর উপর আমার দৃষ্টি পড়তেই চোখ অশ্রুতে ভিজে আসে। এরা সেসব শহীদান, যাঁদেরকে মাজার শরীফের বধ্যভূমিতে ১৯৯৭ সালে শহীদ করে দেয়া হয়েছিলো। তাদের মধ্যে বহু হাফেজ, আলেম, সালেহীন, মুফতিয়ানে কেরাম, সৎ নওজোয়ান এবং ইসলামপ্রিয় সাধারণ জনতা ছিলেন। না জানি তাঁরা তাদের অন্তরে কতো আশা, কতো স্বপ্ন লালন করতেন। ইসলামকে বিজয়ী করার এই যুদ্ধে তাঁরা তাদের পূর্ণ ভূমিকা আদায় করার কতো পবিত্র উদ্দেশ্য অন্তরে পোষণ করতেন। কিন্তু জেনারেল আব্দুল মালেক এবং জেনারেল আব্দুর রশিদ দোস্তাম এসব আল্লাহওয়ালাদেরকে ক্ষুৎপিপাসায় ধুকিয়ে ধুকিয়ে শহীদ করেছে। দাশতে লাইলার ঘাস ও পানিহীন মরুপ্রান্তরে তাদের লাশগুলোকে কবর ও কাফনহীন নিক্ষেপ করে নিজেদের আমলনামাকে কালো করেছে।

যখন আমি এই কবরস্থানের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলাম তখন আমার মনে হচ্ছিলো এখানে শায়িত শহীদরা বলছেন, আমরা আজ ইসলামের জন্য কুরবানী দিয়ে আল্লাহর দরবারে হাজির হয়ে কামিয়াব হয়ে গেছি। তোমরা আজো

নিজেদের জানের হেফাজতে ব্যস্ত হয়ে আছো, অথচ আমাদের হত্যাকারী এখনো জীবিত।

আমার আনন্দ অনুভব হচ্ছিলো এ জন্য যে, আমি এবং আমার সাথী কামাল শহীদ আজ সেই জালেম, আগ্রাসী, নিকৃষ্ট এবং রক্তপিপাসু কমান্ডার আব্দুর রশিদ দোস্তামের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করতে যাচ্ছি। যার জুলুম এবং পশুত্বের শিকার হয়ে এসব মজলুম শহীদ হয়েছিলেন। আমার রবের নিকট মিশনে সফলকাম হওয়ার জন্য দোয়া করছিলাম। প্রায় এক ঘণ্টার পথ অতিক্রম করার পর কলাত শহর আসে। এটি জাবেল প্রদেশের রাজধানী। কলাতে এক বড় টিলার উপর কলাতের পুরাতন ঐতিহাসিক কেল্লা অবস্থিত। কলাত থেকে দুই ঘণ্টারও বেশি সময় সফরের পর গজনি শহর আসে। যা মহান বীর সুলতান মাহমুদ গজনবী রহ. এর জন্মস্থান এবং বাসস্থান। সুলতান মাহমুদ গজনবী রহ. হিন্দুস্তানের তৎকালীন প্রসিদ্ধ মন্দির সোমনাথ ভাঙ্গার জন্য ১৭ বার হামলা করেছিলেন। তাছাড়া পাকিস্তানের লাহোরের প্রসিদ্ধ রুহানী ব্যক্তিত্ব হযরত সাইয়েদুনা আলী হাজবেরি রহ. এর পিতৃভূমি 'হাজবির'ও এই গজনিতে অবস্থিত। যেখানে তার সম্মানিত পিতা সাইয়েদুনা উসমান রহ. এর মাজার আজও লাখো মানুষের আশ্রয় হিসেবে বিদ্যমান। গজনি থেকে বাহিরে কয়েকটি হোটেলের কাছে ড্রাইভার বাস থামায়। বাস এখানে আধা ঘণ্টা থাকবে। তাই সকল যাত্রী নেমে যায় এবং প্রয়োজন পূরণে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। আমি এবং কামাল শহীদও নিচে নামি। এক হোটেল থেকে কাবাব এবং আফগানি রুটি খাই। তারপর কফি পান করে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি। এরই মধ্যে বাসও কাবুল যেতে প্রস্তুত হয়ে যায়। আমরা বাসে উঠে বসি এবং বাস কাবুলের দিকে রওয়ানা হয়ে যায়। প্রায় দুই ঘণ্টার পথ অতিক্রম করে আমরা কাবুল পৌঁছে যাই।

হায়রে তোমার আমেরিকান ইসলাম!

কান্দাহার থেকে কাবুলের দিকে সফরের মধ্যে এক আবাক ঘটনা ঘটে। যার মধ্যে তালেবানের প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং কারজাইয়ের বাবা-মা মুক্ত সমাজব্যবস্থার প্রতিবিম্ব ফুটে ওঠে। কান্দাহার থেকে কাবুল যাওয়ার জন্য বাসে সাওয়ার হলে কিছুক্ষণের মধ্যে একটি বিদেশি কোম্পানির গাড়ি আসে। সেটি থেকে দু'জন নেকাব লাগানো পর্দানশিন মহিলা কাবুল যাওয়ার জন্য আমাদের বাসে উঠেন। এই মহিলাগুলোকে মনে হচ্ছিলো কোনো কোম্পানি অথবা কোনো প্রতিষ্ঠানের চাকরীজীবি। তারা পূর্ণ শরয়ী পর্দা করছিলেন। আমি মনে মনে

ভাবছিলাম, এই মহিলাগুলো পর্দার কতো গুরুত্ব দিচ্ছেন। তারা আমাদের কয়েক সিট সামনে বসেন। কিন্তু যখনই আমরা ময়দান শহর থেকে বের হয়ে কাবুলের উপকূলে প্রবেশ করি তখনই তারা তাদের নেকাব খুলে ফেলেন এবং যখন কাবুল স্টেশনে নামছিলেন তখন তারা তাদের বোরকা খুলে ব্যাগে রেখে দেন। তারা উভয়েই আফগানি স্টাইলে ফ্যাশনের পোশাক পরিহিত ছিলেন। আমি চিন্তা করে এর কারণ বের করি যে, কান্দাহার থেকে ভিরদাক প্রদেশ পর্যন্ত তালেবানের হুকুমত না থাকলেও এসব এলাকাতে তাদের যথেষ্ট পরিমাণ প্রভাব রয়েছে। যার কারণে এসব মহিলা কান্দাহার থেকে ভিরদাক প্রদেশ পর্যন্ত বেপর্দা থাকার সাহস করেনি। কিন্তু যখনই তারা কারজাইয়ের দারুল হুকুমতের নিকটে আসে তখন প্রথমে তারা নেকাব খুলে ফেলে। তারপর কারজাইয়ের শহরের বরকতে বেপর্দা হয়ে যায়! এতে আমি বলি, হায়রে কারজাই! এই হলো তোমার আমেরিকান ইসলাম।

কাবুল

কাবুলের সৌন্দর্যের কারণে তাকে এশিয়ার দিল বলা হয়। কাবুল আফগানিস্তানের রাজধানী। একটা সময় ছিলো যখন বিশ্বের সুন্দরতম শহরগুলোর মধ্যে একে গণনা করা হতো। কিন্তু আজ যুদ্ধের কারণে তার সৌন্দর্য হারিয়ে গেছে। তার শীতলতা এবং ঐতিহাসিক স্মৃতি আজো পর্যটকদের দৃষ্টি কাড়ে। কাবুল ইউনিভার্সিটি, কাবুলের প্রেসিডেন্ট ভবন, কাবুলের বিশ্বখ্যাত পুলখাশতি মসজিদ, কাবুল কন্টিনেন্টাল হোটেল, গভর্নর হাউজ, জাদুঘর, জহিরুদ্দিন বাবর এবং আমির আমানুল্লার মাজার, সাইয়েদ জামালুদ্দিন আফগানির মাজার এবং কাবুলের খুব সুন্দর প্রসিদ্ধ করগাহ ঝিল আজো কাবুলের উল্লেখযোগ্য বিশ্রামস্থল। যেগুলোর সৌন্দর্য আজো পর্যটকদের অবাক করে দেয়।

কাবুল শহরের চারদিকে সুউচ্চ পাহাড় রয়েছে। যেগুলো পেয়ালার আকৃতি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কাবুলের মাঝখানে কাবুল নদী শতাব্দি জুড়ে বয়ে চলছে। এটি কাবুলের কয়েকটি উত্থান-পতনের চাক্ষুস সাক্ষী। তালেবানরা কাবুল বিনির্মাণের জন্য ১৯৯৯ সালে এক মাস্টার প্লান তৈরি করে ছিলো। যার মাধ্যমে কাবুলের হারানো সৌন্দর্য ফিরিয়ে আনা যেতো। প্রাথমিক পর্যায়ে কাবুলের রাজপথগুলো প্লাস্টার করা হয়েছিলো। তালেবানের এই মাস্টার প্লানের উপর কাজ করার জন্য কয়েকটি বছর সুযোগ পাওয়া গেলে কাবুল একেবারে পূর্ণ দুলহানের মতো

সাজ ধারণ করতো এবং একে দুনিয়ার সুন্দরতম শহরগুলোর মধ্যে গণনা করা হতো।

কোথায় পবিত্র হিজাজ, কোথায় কাবুল!

কাবুল একটি ঐতিহাসিক শহর। ইসলামের প্রথমিক যুগেই মুসলমানগণ কাবুল আগমন করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামাতা, দয়া ও দানশীলতার প্রতিক, লজ্জাশীলতার উপমা, মজলুম শহীদ উসমান বিন আফফান রা. এর যুগে হযরত আব্দুর রহমান বিন সামুরা রা.-এর কাবুলে আগমন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তিনি কাবুল বিজয়ের সময় মধ্য-কাবুলে গনিমতের মাল, জিহাদী মাসায়েল ও জিহাদের ফজিলতের উপর ভাষণ দেন। যার আলোচনা হাদীসের প্রসিদ্ধ ৬ কিতাবেই রয়েছে। কাবুলের উল্লেখিত কেল্লার নিকট একটি কবরস্থানে ৭২ জন সাহাবায়ে কেরাম রা. এর গণকবর এবং তার একটু দূরেই দু'জন সাহাবীর পৃথক কবর রয়েছে। এসব সাহাবায়ে কেরামও কাবুলের জিহাদের সময় শহীদ হয়েছেন। যে দু'টি কবর পৃথক রয়েছে সেগুলোর একটিতে হযরত তামীম রা. এর মোবারক নাম খোঁদাই করা আছে। আল্লাহ তায়ালা এসব পবিত্র গুণাবলির মানুষ এবং আগত উম্মত পর্যন্ত ইসলাম পৌছানোর চিন্তায় পেরেশান দয়ালু লোকদের উপর রহমত বর্ষণ করুন, আমীন। কোথায় পবিত্র হিজাজ আর কোথায় কাবুল? হাজারো কুরআনের আয়াতের সাক্ষ্য, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সাহাবায়ে কেরাম রা. কেবল এবং কেবলই ইসলামের প্রচার ও দীনের বিজয়ের জন্য এখানে এসেছিলেন। এখানেই নিজের রক্ত ইসলামের ভিত্তিতে প্রবাহিত করে মাটির পেটে আশ্রয় নিয়েছেন। আর আমরা যেখানে নিজেরাই দীনের আহকামের উপর আমল করি না, সেখানে অন্যদেরকে কী শিখাবো?

তালেবান আফগানিস্তানকে কী দিয়েছে

আমি তখন কাবুলে ছিলাম। আমি আমার যিন্দেগির কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বছর তালেবানের বরকতময় হুকুমতের সময় এখানে কাটিয়েছি। আমি তালেবানের বরকতময় যুগের বিভিন্ন স্মৃতির পৃষ্ঠাগুলো উল্টাচ্ছিলাম। তখন এখানে শতভাগ ইসলামী নেযাম চালু ছিলো। এখানে মানুষ এবং মানবতা নিরাপদ ছিলো। আদর্শ শান্তি ও নিরাপত্তা বিরাজ করতো। কিন্তু এই বরকতময় নেযাম কাফের এবং মুনাফিকরা এক চোখেও দেখতে পারতো না। যখন সকাল হওয়ার দৃশ্য

এবং দাশতে লাইলার কেয়ামত সাদৃশ দাস্তানের দৃশ্য মনে পড়ে, তখন চোখদ্বয় শ্রাবনের বর্ষা ঝরাতে থাকে। কেল্লায়ে জঙ্গীর মর্মান্তিক ঘটনা তো কেবল ধারণাকেই থামিয়ে দিতে পারে, কিন্তু তালেবানের কুরবানী এবং ত্যাগের অবিচল ঘটনা রয়েছে যেগুলোকে দেখে খায়রুল কুরুনের কথা মনে পড়ে যায়। ইসলাম প্রতিষ্ঠার এই আন্দোলনের জন্য হাজারো নয়, লাখো লোক নিজের জানের নজরানা পেশ করেছেন। মায়েরা নিজেদের সন্তানদেরকে দুলহার মতো সাজিয়ে রণাঙ্গনে পাঠিয়েছেন। আর সেই অনুগত ছেলের মুখেও তখন ছিল এমন বাণী–

جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے

یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی تو کوئی بات نہیں

যে কোনোভাবে রণাঙ্গনে গেছে, সে আল্লাহর আশ্রয়ে থাকে
এই জীবন তো আশা যাওয়ার জন্যই, তার আবার কিসের কথা?

এবং এই দৃঢ় সংকল্প মনে ধারণ করে যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছে, বিজয় অথবা শাহাদাত, গাজি নয়তো শহীদ। এ ছাড়া তৃতীয় কোনো সুযোগ ছিলো না। আর তাদের কেউ কেউ তো শহীদ হওয়ার সময় ওসিয়ত করে গেছেন, আমরা কালাশনিকভ জড়িয়ে ধরে চিৎকার করছি, তোমরা এই পবিত্র রক্তের মান রেখো, একে হেফাজত করো। যতক্ষণ না আল্লাহর জমিনে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা হবে এবং মুসলিম উম্মাহ শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে আপন রবের ইবাদত করতে পারবে, শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত এই ভূখণ্ডে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদ করতে থাকবে। আগত পৃষ্ঠাগুলোতে দেখবেন, তালেবানরা তাদের শাসনামলে শহীদানের ওসিয়তের কতটুকু বাস্তবায়ন করেছেন। তারা এমন পদক্ষেপ নিয়েছিলো যাতে ছন্নছাড়া আফগান জনগণ শান্তি ও নিরাপত্তার জীবন যাপন করতে পারে এবং উম্মাতে মুসলিমা তাদের হারানো ঐতিহ্য ফিরে পেতে পারে। আপনি দেখুন! তালেবান আফগানিস্তানকে কী দিয়েছে।

শান্তি ও নিরাপত্তা

তালেবানের আগে আফগান জনগণ শান্তি তো দূরের কথা, বেঁচে থাকার অধিকার থেকেও বঞ্চিত ছিলো। কারোরই জান-মাল নিরাপদ ছিলো না। সশস্ত্র ব্যাক্তি যে কাউকে হত্যা করতে পারতো। তালেবান এসে যুগ যুগ ধরে চলে আসা খুনাখুনির এই খেলা বন্ধ করে। আফগানিস্তানে তাদের নিয়ন্ত্রিত এলাকায় উপমাহীন নিরাপত্তা ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করে গোটা বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দেয়।

যতদিন তালেবানের নেতৃত্ব থাকে, ততদিন কখনো আইনি সমস্যা সামনে আসেনি।

ন্যায় ও ইনসাফ

তালেবান যেখানে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করেছে, সেখানে ন্যায় এবং ইনসাফও প্রতিষ্ঠা করেছে। তালেবানরা জনসাধারণকে দ্রুত এবং সহজে ইনসাফ উপহার দেয়। তালেবানের দুশমন কিংবা দোস্ত সকলেই এই সাক্ষী দিবে যে, তালেবানের কাছে বিনামূল্যে এবং দ্রুততম সময়ে ইনসাফ পাওয়া যেতো। জনসাধারণের জন্য আদালত পর্যন্ত সহজেই পৌছা নিশ্চিত করতে তারা কয়েকটি পদক্ষেপ নেয়। শুনানিভূক্ত মামলাগুলোর সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তি সহজে আদালত পর্যন্ত যাতায়াতের খরচ পর্যন্ত হুকুমত বহন করে। মামলা চলাকালীন যদি তাকে আদালতের নিকট থাকা প্রয়োজন হয়, তাহলে তাও তালেবান বিনামূল্যে ব্যবস্থা করবে। বাদি-বিবাদি উভয়জনই জজের সাথে সরাসরি কথা বলার অনুমতি ছিলো। জনসাধারণের জন্য উকিল ধরার কোনো প্রয়োজন হতো না। তালেবানের যুগে আফগানিস্তানই একমাত্র রাষ্ট্র ছিলো যেখানে শয়তানের কোনো সন্তান ছিলো না।

কাজি (জজ) কুরআন, সুন্নাহ এবং হানাফি মাযহাব অনুযায়ী ফায়সালা করতেন। অফিসার, মন্ত্রী, এমনকি প্রেসিডেন্টও আইনের উর্ধ্বে ছিলো না। কাজি তালেবানের কর্মীদেরকেও আদালতে ডাকতেন এবং অন্যায় প্রমাণিত হলে শাস্তির রায় দিতেন। সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোও জনগণের অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে আদালতের কাছে দায়বদ্ধ ছিলো। ১৯৯৭ সালের আগস্টে সেই মুকাদ্দামা কেবলই আন্তরিক প্রশান্তি, যেটি কাবুলের আদলতে হয়েছিলো। তাতে একজন মাজুর ব্যক্তি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি ভবনের মালিকানা দাবি করে আদলতে মুকাদ্দামা পেশ করে। শেষপর্যন্ত ঐ ব্যক্তি মামলায় জয়ী হয়। আদালত তার সিদ্ধান্তে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বশীলদেরকে তাৎক্ষণিকভাবে ভবনটি মাজুর ব্যক্তির কাছে হস্তান্তরের আদেশ জারি করে।

শরয়ী শাস্তি

তালেবান কোনো ইংরেজি কিংবা কমিউনিস্ট আইনের অধীনস্ত নয়। শরীয়তে মুহাম্মাদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অধীনে ফায়সালা করে শরয়ী শাস্তি বাস্তবায়ন করতো। আর তালেবান কর্তৃক এই ইসলামী আইন, শাস্তি এবং

কেসাসকে জীবিত করার বরকতে মানুষের মধ্যে আখেরাতের চিন্তা এবং আল্লাহর ভয় জন্ম নিতে থাকে।

অপরাধের প্রতিকার

ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার বরকতে তালেবানরা আফগানিস্তানে অধিকাংশ অপরাধই নিয়ন্ত্রণ করে ফেলে। চুরি, ডাকাতি, ব্যাভিচার, মদ এবং অন্যায়ভাবে হত্যার মতো অপরাধগুলো তো হতো না বললেই চলে। আফগানিস্তানে অপরাধ যেখানে গর্বের বস্তু ছিলো, সেখানে ইসলামী আইন বাস্তবায়নের বরকতে সেসবকে ত্রুটি মনে করতে থাকে। ইসলামের প্রাথমিক যুগের মতো দৃশ্য দেখা যেতে থাকে। অপারাধী নিজেই আদালতে এসে শরয়ী শাস্তি দাবি করে। যাতে তার গুনাহ মাফ হয়ে যায়। ২০০১ সালের ১০ মে আফগানিস্তানের সুপ্রিম কোর্টে একজন অবিবাহিত নওজোয়ান ৪ বার ব্যভিচারে লিপ্ত হবার কথা স্বীকারোক্তি দিয়ে শরয়ী শাস্তি প্রয়োগের দরখাস্ত করে। আদালতের বাউন্ডারিতে সবার সামনে তাকে ১০০ দোররা লাগানো হয়। শাস্তির পর নওজোয়ানের চেহারায় আনন্দ প্রকাশ পায়। নিঃসন্দেহে তার ঈমান ঈর্ষা করার মতো। সে এই ফেতনা ফাসাদের যুগেও হযরত মায়েজ আসলামী রা. এর স্মৃতি তাজা করে দেয়। আর এটি কেবল ইসলামী আইনের কারণেই সম্ভব হয়েছে।

কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা

তালেবানের আগে আফগানিস্তানে কেন্দ্রীয় হুকুমতের কেবল নামটাই ছিলো। বাস্তবে প্রত্যেক এলাকায় একেকজন যুদ্ধবাজ কর্তৃত্ব করতো। আফগানিস্তান মূলত টুকরো টুকরো ছিলো। তালেবান সাধারণ জনগণকে একটি শক্তিশালী এবং প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা দান করে। যার প্রধান ছিলেন আমিরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর মুজাহিদ দা.বা.। তিনি দেশের ৯৮ভাগ এলাকাতে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করেন এবং হানাফি মাজহাবকে নাগরিক আইন হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন। যারফলে পশ্চিমা শক্তিগুলোর আশার গুড়ে বালি পড়ে।

নেশাজাতদ্রব্যের উৎপাদন বন্ধ

তালেবানের আগে এবং আমেরিকার হামলার পর গোটা পৃথিবীর আফিম এবং অপরাধ জগতের সবচেয়ে বড় কেন্দ্র ছিলো এই আফগানিস্তান। পৃথিবীর ৯০ ভাগ নেশাদ্রব্য আফগানিস্তানে তৈরি করা হয়। কিন্তু ২০০০ সালের ১ আগস্ট

তালেবান প্রধান আমিরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর মুজাহিদ দা.বা. হুকুম জারি করেন। তাতে তিনি আফিমের চাষ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন এবং পরবর্তী বছর আফগানিস্তানে আফিম চাষ শূন্যের কোটায় নেমে আসে। যা জাতিসঙ্ঘের অধিনস্ত প্রতিষ্ঠান 'ইউনাইটেড ন্যাশন ড্রাগ' প্রোগ্রামের প্রধান বর্ণা রেডিফও তার ভাষণে স্বীকার করেন। আফিম চাষের সমাপ্তির টার্গেট ইউনাইটেড ন্যাশন ড্রাগ প্রোগ্রামের ৭০০ কর্মীও পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। যা আমিরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর মুজাহিদ দা.বা. একটি মাত্র আদেশের মাধ্যমে অর্জন করে নিয়েছেন। এরপর আফগানিস্তানে নিযুক্ত ইউনাইটেড ন্যাশন ড্রাগ প্রোগ্রামের ৭০০ কর্মীকে বেকার আখ্যায়িত করে অব্যাহতি প্রদান করা হয়।

খুন-খারাবির সমাপ্তি

যখন তালেবান নেতৃত্বে আসে তখন অযথা সময় নষ্ট করে এমন অনৈতিক কাজ এবং খুন খারবি বন্ধ করে দেয়। সেগুলোর মধ্যে আফগানিস্তানের জনপ্রিয় খেলা বুজকাশি সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। এটি একটি রক্তক্ষয়ী খেলা। যা গলফের মতো খেলা হয়। কিন্তু এতে বলের পরিবর্তে মৃত বকরি এবং স্টিকের পরিবর্তে বর্শা ব্যবহার করা হয়। এতে মানুষের জীবনও বিপন্ন হয় আবার প্রাণীর উপরও জুলুম করা হয়। তাই তালেবানরা এটিকে অমানবিক, অনৈতিক এবং খুনি খেলা আখ্যায়িত করে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।

অবৈধ ট্যাক্স বন্ধ

তালেবানের আগমনের আগে প্রত্যেক এলাকার গডফাদাররা নিজ নিজ এলাকা থেকে জোরপূর্বক ভ্যাট ও ট্যাক্স আদায় করতো। ফলে জনসাধারণের উপার্জনের একটা বড় অংশ সেসব যুদ্ধবাজ গডফাদারদের অবৈধ এবং জোর পূর্বক ট্যাক্সের অধিনে চলে যেতো। তালেবান জনসাধারণের কাছ থেকে এ ধরনের সকল অন্যায় ট্যাক্স বন্ধ করে দেয়। এতে জনসাধারণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে এবং তাদের উপার্জনের পুরোটাই তাদের পকেটে থেকে যায়।

সুদের সমাপ্তি

কুরআন ও সুন্নাহে সুদের ব্যাপারে কঠিন নিষেধাজ্ঞা এসেছে। সুদকে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণার সাথে

তুলনা করা হয়েছে। তালেবান প্রকৃত ইসলামের সংরক্ষক ছিলো। তারা ইসলাম প্রতিষ্ঠা এবং সংরক্ষণের কসম করেছিলো। তারা কোনো ধরনের সুদী লেনদেনকে সহ্য করতো না। তাই তারা সুদকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে এবং আফগানিস্তান থেকে সুদকে সম্পূর্ণ বিদায় করে দেয়। ব্যাংকের সকল নীতিমালা সুদ থেকে পবিত্র ছিলো। তালেবান ইসলামের আলোকে এবং মানবতার কল্যাণের জন্য অর্থনৈতিক নীতিমালা প্রণয়ন করেছিলো। যারফলে তাদের জীবন যাত্রার মান দিন দিন উন্নত হচ্ছিলো ।

অস্ত্রবাজি বন্ধ

তালেবান আসার পূর্বে অস্ত্র এতোটা ব্যাপক ছিলো যে, প্রতিটা গলি, মহল্লায় পৃথক পৃথক সশস্ত্র গ্রুপের ভাড়া চলতো। গডফাদার নিজে এবং তার কমান্ডারদের নিকট সর্ব প্রকার অস্ত্র ছিলো। যেগুলোর মধ্যে কালাশনিকভ, তোপ, ট্যাংক, হেলিকপ্টার এমনকি জঙ্গী জেট বিমানও থাকতো। এসব কমান্ডারদেরকে বিশ্বের বড় বড় সুপার পাওয়াররাও অস্ত্রমুক্ত করতে পারেনি। এমনকি ১৯৯২ সালে জাতিসঙ্ঘ এসব কমান্ডারদেরকে ৩ বিলিয়ন রুপিয়ার বিনিময়ে অস্ত্র জমা করতে চেষ্টা করে কিন্তু এই চেষ্টাও ব্যর্থ হয়। অথচ তালেবান এই অসম্ভব কাজকে সম্ভব করে দেখায়। জনসাধারণ তালেবানের উপর ভরসা করে নিজেরাই অস্ত্র জমা দেয় এবং আল্লাহর সাহায্য ও মদদে খুব অল্প সময়ে তালেবান এসব অবাধ্য কমান্ডারদেরকে অধীনস্ত করে দেখায়। হয়তো তারা শান্তিতে জীবন-যাপন করতে শুরু করে, নতুবা আফগানিস্তান থেকে পালিয়ে যাওয়ার মধ্যেই নিরাপত্তা মনে করে।

দীনি এবং সাধারণ শিক্ষা

তালেবান আসার আগে দেশে শিক্ষাব্যবস্থা প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। কলেজ এবং ভার্সিটিগুলোতে বেদীন শিক্ষকরা কেবল নিজেদের নাস্তিকি আকিদা প্রচারের কেন্দ্র বানিয়ে রেখেছিলো। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে গুণ্ডা বদমাশদের রাজত্ব ছিলো। তালেবান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে এসব ঝঞ্জাল মুক্ত করে শিক্ষার্থীদের পড়ালেখার সুস্থ পরিবেশ ফিরিয়ে দেয়। দীনি এবং সাধারণ শিক্ষার জন্য গ্রামে গ্রামে, শহরে শহরে মকতব ও স্কুল প্রতিষ্ঠা করে। নতুন এবং সমকালীন শিক্ষালয়গুলো এতোটা আবাদ হয় যে, শুধু কাবুল ইউনিভার্সিটিতে গ্রাজুয়েট এবং পোস্ট গ্রাজুয়েটের শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৮ হাজার ছাড়িয়ে যায়।

তালেবান দীনি শিক্ষার প্রসারের জন্যও আপ্রাণ চেষ্টা চালায়। ১৯৯৭ সালে হযরত আমিরুল মুমিনীন দা.বা. দীন প্রচারের সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠান 'জামিয়ায়ে ওমর কান্দাহার' প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন। সিদ্ধান্ত হয় এই জামিয়াকে এক হাজার শিক্ষার্থীর উচ্চতর শিক্ষার কেন্দ্র বানানো হবে।

নারী শিক্ষা

তালেবানের উপর নারী শিক্ষার ব্যাপারে কয়েকটি অপবাদ দেয়া হয়। প্রসিদ্ধ কলামিস্ট এবং সাংবাদিক আনোয়ার গাজীর সাথে কাবুল ইউনিভার্সিটিতে সংঘটিত কাহিনীটি পড়ুন। সে তার ভ্রমণ কাহিনী 'সীমান্তের ওপাড়ে' গ্রন্থে 'আমি তার জীবন্ত উপমা' শিরোণামে লেখেন, আমি একজন শিক্ষার্থীকে লাইব্রেরি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে সে আমাকে একটি আলিশান মহলের দিকে ইশারা করে। আমি খুঁজতে খুঁজতে লাইব্রেরিতে পৌঁছি এবং সেখানে এক নেকাব পরিহিতার সাথে ধাক্কা খাই। তাকে আমি পর্যটক মনে করি। অথচ সেও ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থী ছিলো। আমার এক বন্ধু তাকে জিজ্ঞেস করে, তালেবানরা কি মেয়েদের ভর্তি হওয়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করেনি? আমরা শুনেছিলাম, তালেবানরা মেয়েদের জন্য শিক্ষাকে একদমই নিষিদ্ধ ঘোষণা করে দিয়েছে। এতে সে এক অর্থবহ হৃদয়কাড়া মন্তব্য করে– 'তালেবান নারী শিক্ষা নিষিদ্ধ করেনি, বরং সঠিক শিক্ষা অর্জনের নীতিমালা প্রনয়ন করেছে। নিষেধাজ্ঞা তো নির্লজ্জতা, অশ্লীলতা, নগ্নতা এবং অবৈধ প্রেমপ্রীতির উপর জারি করেছে। তালেবান যদি মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করতো তাহলে আমি কিভাবে লেখা পড়া করছি? আমি তো তার জীবন্ত উপমা।'

জেলখানা সংশোধনী কেন্দ্র

তালেবানের আগে জেলগুলোতে অমানবিক জুলুম নির্যাতন হতো। সাধারণ বন্দীদেরকে অল্প পরিমাণে নিম্নমানের খাবার দেয়া হতো। তাদেরকে আপনজনের সাথে দেখা করতে দিতো না। অথচ বড় বড় অপরাধের সাথে জড়িত কমান্ডারদের উপর হাত দিতো না। যারফলে জেল থেকে মুক্তি পাওয়া ব্যক্তি সংশোধন হওয়ার পরিবর্তে পাক্কা অপরাধী হয়ে বের হতো। কিন্তু তালেবান এসে এই প্রথাকে পবিবর্তন করে সকল কয়েদিদেরকে জেলের মধে নিয়মতান্ত্রিক সুযোগ সুবিধা দেয় এবং জেলখানাগুলো থেকে ঘুষের প্রথা বিলুপ্ত করে। অমানবিক নির্যাতনকারীদেরকে কঠিন শাস্তি দেয়। জেলখানাগুলোতে ওয়াজ-নসিহত এবং শিক্ষাদীক্ষার পূর্ণ নীতিমালা চালু করে। যা কয়েদিদেরকে

ইসলামী শিক্ষা, গুনাহের দুনিয়াবি এবং আখেরাতের শাস্তি সম্পর্কে অবগত করে। তালেবানের এই সৎব্যবহারে কয়েদিরা নিজেদের অপরাধ থেকে তওবা করে আগামীতে এ ধরনের অপরাধ না করার প্রতিজ্ঞা করে। কয়েদিরা জেলখানাগুলোতে কয়েকটি শিক্ষা কোর্স সম্পন্ন করে। এভাবে তালেবানরা জেলখানাকে সংশোধনের কেন্দ্রে পরিণত করে। যা আগে অপরাধের ঘর ছিলো।

কৃষি উন্নয়ন

তালেবানের আগে আফগানিস্তানের কৃষি ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো। তালেবান এসে কৃষি উন্নয়নের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়। পুরাতন নদীগুলো পরিষ্কার করে, টিউবঅয়েল স্থাপন করে। স্পেন বুলদাক থেকে কান্দাহার পর্যন্ত বিস্তৃত ভূমিতে শুধু ধুলো উড়তে দেখা যেতো। কিন্তু তালেবান কৃষি সংস্কারের মাধ্যমে এখানে কয়েক হাজার টিউবঅয়েল স্থাপন করে। যারফলে এই এলাকা লকলকে ফসলের ক্ষেতে রূপান্তরিত হয়। ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বরে তালেবানরা জালালাবাদ ড্যাম মেরামতের কাজ সম্পন্ন করে তা নতুনভাবে চালু করে। এর দ্বারা ৭০ হাজার একর কৃষি জমিতে পানি সেচ হতে থাকে। তালেবানের এসব কৃষি সংস্কারের ফলে আফগানিস্তান ২০০০ সালের মধ্যে গম চাষে স্বয়ংসম্পন্ন হয়ে যায়। এটাই প্রথম ছিলো যে, আফগানিস্তান কোনো দেশ থেকে গম আমদানি করতে বাধ্য ছিলো না।

নতুন শিল্প কারখানা স্থাপন

তালেবানরা দেশে শিল্প এবং কর্মসংস্থানকে নতুনভাবে জীবন দেয়। পুরাতন ফ্যাক্টরিগুলো চালু করে এবং নতুন নতুন কারখানা স্থাপন করে। ১৯৯৯ সালের মার্চে তারা ১০২টি নতুন শিল্প কারখানার অনুমোদন দেয়। যেগুলোর মধ্যে ঔষধ, খাদ্য সামগ্রী, নির্মাণ সামগ্রী, প্লাস্টিকপণ্য তৈরি অন্তর্ভূক্ত ছিলো। এভাবে দেশে কয়েকটি শিল্প চালু হয় এবং হাজারো মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়। কাবুলে প্লাস্টিক কারখানা কাজ করতে থাকে, জালালাবাদে মার্বেল পাথরের কারখানা চালু হয়ে যায়।

টেক্সটাইল মিল চালু

জালালাবাদে টেক্সটাইল মিল বহুদিন থেকে বন্ধ পড়ে ছিলো। তালেবান বড় অংকের অর্থ ব্যয় করে তা চালু করে। ১৯৯৯ সালের জানুয়ারিতে এই

কারখানার শানদার কাপড় আফগানিস্তানের মার্কেটগুলোতে বিক্রি হতে থাকে। শিবারগান, মাজার শরীফ এবং কুন্দুজের টেক্সটাইল মিলগুলোকেও চালু করা হয়। যা দেশি জীবন-যাপনে বড় ধরনের এক সংযোজন।

তৈল শোধনাগার

তালেবান আসার আগে আফগানিস্তানের কেউ অয়েল রিফায়েজি বা তৈল শোধনাগারের নামও জানতো না। কিন্তু তালেবানরা হেরাত এবং মাজার শরীফে তৈল শোধনাগার প্রতিষ্ঠা করে আফগানিস্তানের ইতিহাসে এক নতুন বিপ্লব সাধন করে।

সার উৎপাদন

সোভিয়েত ইউনিয়নের রুশ আক্রমণের পূর্বে আফগানিস্তান সার উৎপাদনের এক বড় কেন্দ্র ছিলো। কিন্তু যুদ্ধের কারণে সার উৎপাদন একদম কমে যায়। তালেবান মাজার শরীফের সার কারখানা চালু করে এবং নতুন প্লান্টও স্থাপন করে। যারফলে দৈনিক ৫ হাজার বস্তা সার উৎপাদন হতে থাকে।

সেচ প্রকল্প চালু

তালেবানরা আফগানিস্তানে যেখানে কৃষি সংস্কার করেছে সেখানে সেচ প্রকল্পের প্রতিও বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। তালেবানরা জায়গায় জায়গায় খাল খনন এবং পুরাতন নদী পরিষ্কার করেছে। টিউবঅয়েল স্থাপন করেছে। শুধু কাবুলে খোদাই করা কূপের সংখ্যা ১২০০ থেকেও বেশি। ১৯৯৮ সালে তালেবান হেলমন্দ নদী থেকে লশকরগাহ পর্যন্ত প্রশস্ত মরুভূমির বুক চিড়ে ১০ কিলোমিটার দীর্ঘ এবং ৬ মিটার প্রশস্ত খাল খনন করে। যা ছিলো তালেবানের এক চমৎকার উপহার। এটি তারা সরঞ্জাম কম থাকা সত্ত্বেও সম্পন্ন করে ফেলেন।

বিশুদ্ধ খাবার পানির ব্যবস্থা

তালেবানরা সাধারণ মানুষের জন্য খাবার পানির যোগান দেয়ার জন্য পরিকল্পণা প্রস্তুত করে। যার অধীনে তারা হাজার হাজার হাত পাম্প স্থাপন করে। নিমরোজের লোকেরা লবণাক্ত পানি পান করতো কিন্তু তালেবান মাত্র ৬ মাসের মধ্যে ৪ কিলোমিটার দীর্ঘ খাল খনন করে নিমরোজ প্রদেশে মিঠা পানির ব্যবস্তা করে। যা তালেবানের মানব প্রেমের অনন্য প্রমাণ।

গ্যাসের সুব্যবস্থা

তালেবানরা যতটুকু সম্ভব, সীমাবদ্ধ বাজেট হওয়া সত্ত্বেও জনগণের সুবিধার জন্য কয়েকটি পরিকল্পনা হাতে নেয়। সীমিত সময়ের মধ্যে সেগুলোর কয়েকটি বাস্তবায়নও করে ফেলে। শিবারগানে গ্যাসের বিশাল মজুদ রয়েছে। তালেবানরা শিবারগান শহরে গ্যাসের ব্যবস্থা করার সাথে সাথে ২০০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত মাজার শরীফ শহরেও গ্যাসের ব্যবস্থা করে। জনগণের জন্য কল্যাণকর এই পদক্ষেপের প্রাথমিক টার্গেট তাদের শাসনামলেই পূর্ণ করে ফেলে। প্রতি ইউনিট গ্যাসের মূল্যও খুবই কম নির্ধারণ করে যাতে সাধারণ মানুষও ইচ্ছা করলে এ থেকে উপকৃত হতে পারে।

সহজ চিকিৎসা ব্যবস্থা

তালেবানের আগে যুদ্ধ বিগ্রহের কারণে আফগানিস্তানের চিকিৎসা ব্যবস্থা অচল হয়ে গিয়েছিলো। তালেবান এসে তা চালু করে এবং গোটা দেশে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদানের ঘোষণা করে আফগান জনগণের মন জয় করে নেয়। কাবুলের ৪০০ সিটের হসপিটালকে পুনরায় চালু করে এবং তাতে চিকিৎসায় ব্যবহৃত নতুন যন্ত্রপাতি সংযোজন করে। তাছাড়া কাবুলে বাচ্চাদের জন্য 'আল আতফাল' হসপিটাল প্রতিষ্ঠা করে। প্রত্যেক জেলায় জেলায় মেডিকেল হেডকোয়ার্টার স্থাপন করে জনগণের জন্য চিকিৎসা ব্যবস্থাকে সহজ করে। কান্দাহারে 'ওমর হসপিটাল' নামে বিশাল এক মেডিকেল ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা করে। যা থেকে বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করা হয়।

অসহায়দের পুনর্বাসন

আফগানিস্তানের জনগণ গত তিন যুগ ধরে যুদ্ধগ্রস্ত ছিলো। যারফলে বহু লোক অসহায় হয়ে পড়ে। তাদের অনেকেই এমন ছিলো যে, পরিবারে একমাত্র সে-ই উপার্জনকারী ছিলো। তালেবানরা সেসব অসহায়দের পুনর্বাসনের জন্য একটি মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করে। এর অধীনে তাদের পুনর্বাসনের জন্য বড় অংকের বাজেট প্রনয়ন করে। কাবুলে পঙ্গুদের জন্য বিনামূল্যে কৃত্রিম অঙ্গ স্থাপন করতে থাকে। উপযুক্ত পঙ্গুদের পরিবারের জন্য ভাতা নির্ধারণ করে। যার মাধ্যমে তালেবানরা অনেক রিক্তহস্তের লোকের ইজ্জতের পাহারাদার হয়ে যায়। আর তারা হাসিখুশিতে জীবন-যাপন করতে থাকে। অসহায় লোকদের আগের

জিন্দেগি পরিবারের লোকদের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো। তালেবানের তত্ত্বাবধানের পর তারা দেশের সম্মানিত নাগরিক হয়ে যায়।

যোগাযোগ ব্যবস্থা

যুদ্ধ বিগ্রহের কারণে আফগানিস্তানের যোগাযোগ ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো। তালেবান এসে তা পুনরায় সচল করতে শুরু করে। ১৯৯৭ সালে বহির্বিশ্বের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু করার জন্য সুইডেনের কোম্পানি 'ইয়ান এশিয়ান'-কে ঠিকাদারি দেয়। ৬ মিলিয়ন ডলার ব্যয়ের এই প্রকল্পের মাধ্যমে গোটা বিশ্বের সাথে আফগানিস্তানের যোগাযোগ স্থাপন সম্পন্ন করে। দেশের অভ্যন্তরেও টেলি যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করে। ১৯৯৮ সালে মার্চ পর্যন্ত কাবুলে ২১ হাজার, হেরাতে ১৭ হাজার, জালালাবাদে ১৪ হাজার এবং কান্দাহারে ১ হাজার স্থানীয় ডিজিটাল ফোন চালু করেন। লোকাল ফোনের লাইন এগুলোর বাইরে ছিলো। যেখানে ফোনের লাইন দেয়া সম্ভব হয়নি সেখানে জনসাধারণের সুবিধার্থে স্যাটেলাইট পিসিও স্থাপন করে।

সড়ক ব্যবস্থার উন্নয়ন

১৮ বছরের ধ্বংসাত্মক যুদ্ধে দেশের সড়ক ব্যবস্থা এবড়ো-থেবড়ো হয়ে গিয়েছিলো। সড়কগুলো নির্মাণের জন্য শত কোটি ডলারের প্রয়োজন ছিলো। ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এবং বহিঃশক্তিগুলোর সাথে শর্তের মিল না হওয়ায় তালেবানরা ঋণ পায়নি। কিন্তু নিজস্ব উদ্যোগে মাটি ভরাট করে চলার উপযোগী করে দেয়। কাবুল টু জালালাবাদ সড়কে তালেবানরা নতুনভাবে বিশ্বরোড নির্মাণ করে। কাবুল টু কান্দাহার রোডের কাজও খুব জোরেসোরে চলছিলো। সেই সড়কটি তালেবানরা দৈনিক প্রায় ৫ কিলোমিটার নির্মাণ করতো। এছাড়াও তালেবানরা বিশ্বরোডের জায়গায় জায়গায় মসজিদ নির্মাণ করে এবং কূপ খনন করে। যাতে মুসাফিরদের নামাজ, পানি এবং অন্যান্য প্রয়োজন পূরণ করতে পারে।

পানিসম্পদ উন্নয়ন

তালেবান তাদের স্বল্প সময়ের শাসনামলে সাধারণ প্রয়োজন ও রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করার সাথে সাথে পানিসম্পদের উন্নয়ন, কূপ নির্মাণ ও মেরামতের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করে। তারা সুরুবি ড্যাম মেরামত করে

এবং নতুনভাবে চালু করে। ১৯৯৮ সালে হেরমন্দের রোদ নদীর উপর কাজকি ড্যাম নির্মাণ করে। এছাড়া তারা পানিসম্পদ উন্নয়নের পরিকল্পনা প্রস্তুত করে।

বিদ্যুতের ব্যবস্থা

তালেবানরা জনসাধারণকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করার জন্যও কয়েকটি বড় বড় প্রজেক্ট হাতে নেয়। যেগুলোর মধ্যে ১৯৯৮ সালে কাজকি ড্যাম থেকে অন্ধকারে ডুবে থাকা কান্দাহারে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে আলোকিত করে দেয়। এছাড়া জালালাবাদ এবং কাবুলকে সুরুবি ড্যামের বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে। উত্তর আফগানিস্তানের শহরগুলোর মধ্যে মাজার শরীফ, শিবারগান, সমঙ্গান, আইবাক এবং তাশকরগানে উজবেকিস্তান থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে। খানাহ আবাদেও তালেবানরা একটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করে সেখানে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে। কুন্দুজ এবং তালেকানে স্থানীয় জেনারেটর সিস্টেমে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে। পুলখমরিতে নদীতে বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। যার বিদ্যুৎ পুলখমরি শহরে সরবরাহ করা হয়। তালেবান যদি আরো কয়েকটি বছর কাজ করতে পারতো তাহলে পৃথিবী অবাক হয়ে যেতো যে, তালেবানরা সীমাবদ্ধ বাজেট হওয়া সত্ত্বেও সকল কাঁচা-পাকা, কাছে ও দূরের ঘরগুলোতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে আফগানিস্তানকে আলোকিত করে দিয়েছে।

যাকাতের প্রচলন

তালেবান জনসাধারণকে কেবল অন্যায় ট্যাক্স থেকে মুক্ত করেনি বরং সব ধরনের ট্যাক্স থেকে মুক্ত করে দেয়। এটাই পৃথিবীর একমাত্র হুকুমত ছিলো যেখানে জনগণের উপর কোনো প্রকার ট্যাক্স ছিলো না। এখানে জনগণ সুদের অভিশাপ থেকেও মুক্ত ছিলো। কিন্তু জনগণ যাকাত এবং উশরকে (সেচ ও চাষ ব্যতীত উৎপাদিত ফসলে শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত অংশ) নিজের ধর্মীয় দায়িত্ব মনে করে আদায় করতো। তালেবানরা ধনী লোকদেরকে যাকাত এবং উশর দিতে আদেশ জারি করেছিলো। এর জন্য তারা যাকাত এবং উশর বিভাগ চালু করেছিলো। প্রত্যেক এলাকায় জমা হওয়া যাকাত এবং উশর সেই এলাকার লোকদের মধ্যেই বন্টন করা হতো। তালেবানরা যাকাতগুলো তার সঠিক খাতে খরচ করতো। এতে তাদের দীনের দরদও প্রকাশ পায়। এই তালেবানরাই জনগণের কল্যাণের জন্য কয়েকটি পরিকল্পনা যাকাত এবং উশরের টাকা দিয়েও সম্পন্ন করেছিলো।

জার্মান মার্সিডিজে মাজার শরীফ

আমি এবং কামাল শহীদ ১২ টার দিকে কাবুল পৌঁছি। মাজার শরীফ স্ট্যান্ড কাবুলের ইন্টার কন্টিনেন্টাল হোটেলের কাছে অবস্থিত। আমরা সেখান থেকে মাজার শরীফ যাওয়ার জন্য দু'টি টিকেট ক্রয় করি। বাস ছাড়ার তখনো তিন ঘণ্টা বাকি ছিলো। কামাল শহীদ এই সময়টুকু কাবুলের একটি হোটেলে কাটায়। আমরা পৌনে চারটায় স্টেশনে পৌঁছি। এরই মধ্যে একদমই নতুন ধরনের একটি গাড়ি মাজার শরীফ যাওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলো। যার উপর বড় অক্ষরে ৩০৩ লেখা ছিলো। এগুলোকে আফগানিস্তানে ৩০৩ গাড়ি বলে। আমি চিন্তা করছিলাম, এতো শানদার এবং আরামদায়ক গাড়ি আফগানিস্তানে কিভাবে সম্ভব? কিন্তু এর বাস্তবতাও খুব দ্রুত সামনে চলে আসে। এই নতুন মডেলের মার্সিডিজ গাড়িগুলো জার্মান সরকার ট্রান্সপোর্টের জন্য আফগানিস্তানকে দিয়েছে। কাবুল থেকে মাজার শরীফে আমাদের ১৪ ঘণ্টার সফর ছিলো। যা আমদেরকে এই আরামদায়ক এবং উন্নত গাড়িতে করতে হয়। তখনকার সময়টি তালেবান হুকুমত শেষ হওয়ার ৫ বছর গত হয়েছে। আফগানিস্তানের গদিতে কোট পরিহিত প্রধানমন্ত্রী হামিদ কারজাই বসেছে। সে তার পশ্চিমা প্রভুদের হাত ধরে এপর্যন্ত পৌঁছেছে। এটা সেই কাবুল যেখানে তালেবানের শাসনামলে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত ছিলো। এখন সবধরনের খেল-তামাশার প্রকাশ্য অনুমতি রয়েছে। এই অনুমতির কারণে হোটেলে মানুষ টিভি দেখছে। টিভিতে তখন ইন্ডিয়ান মুভি চলছিলো। হোটেল মনিতে সিনেমার দৃশ্য দেখাচ্ছিলো। যাই হোক তখন আমরা এসব প্রতিহত করার সামর্থ্য রাখছিলাম না কিন্তু হাদীসের আলোকে এই কাজকে আমরা খারাপ জানতে থাকি। ৪ টায় বাসের যাত্রি পরিপূর্ণ হয়। বাস কাবুল থেকে মাজার শরীফের উদ্দেশ্যে ছেড়ে দেয়। আমাদের বাস যখনই কাবুল শহর থেকে বের হয়ে আসে তখন একটি চেকপোস্ট আসে। যাতায়াতরত প্রত্যেক গাড়ি চেকপোস্টে থামানো হয় এবং তল্লাশির পর যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়। আমাদের গাড়িকে চেকপোস্টে নিয়োজিত এক সদস্য সামনে এসে থামার ইশারা করে। যখনই আমাদের গাড়ি থামে তখন আমি আমার সঙ্গী কামাল শহীদের দিকে তাকাই। তিনি তার সিটে নিশ্চিন্তে বসেছিলেন। কারণ, আমাদের মাঝে সফরে আগত অবস্থা সামলানোর সকল ব্যবস্থা আগে থেকেই সিদ্ধান্ত করা ছিলো। আমি কুন্দুজে তালেবানের হুকুমতের সময় অনেকদিন কাটিয়েছিলাম। যারফলে ফার্সি ভাষার উপর আমার যথেষ্ট দখল ছিলো। তল্লাশি চলাকালীন ফার্সিতে কথা বলার প্রয়োজন ছিলো।

কুন্দুজের ঠিকানাও আমার জানা ছিলো। যদি কেউ জিজ্ঞেস করে তাহলে নিশ্চিন্ত করার সময় বলা হবে। যাই হোক, যখন আমাদের বাস থামে তখন সকল মুসাফিরকে নিচে নামতে বলা হয়। সবাই নিচে নেমে আসে। জামা কাপড় তল্লাশি নেয়া হয়। কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদের পর বাসে হালকা তল্লাশি নেয়। এসবের পর বাসকে সামনে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়। আমরা সহজেই চারিকারের দিকে সফর শুরু করি।

চারিকার

চারিকার শহরের আগে মিরবাচ্চাহ কোট শহর। তালেবান যখন কাবুল দখলের পর চারিকার দখল করে তখন এই শহরের লোকেরা বিদ্রোহ করে। তালেবানরা দ্বিতীয়বার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে বিদ্রোহ দমন করেন। তালেবানরা মিরবাচ্চাহ কোটের লোকদেরকে সতর্ক করে দেয়। কিন্তু তারা এতো বদ স্বভাবের লোক যে, তারা ইসলামের হেফাজতকারী মুজাহিদীনের বিরুদ্ধে বার বার বিদ্রোহ করতে থাকে। এবারো তারা সতর্কবাণীতে শোধরায়নি এবং পুনরায় বিদ্রোহ করে বসে। তালেবানরা এইসব অবস্থা হযরত আমিরুল মুমিনীন দা.বা.কে অবগত করলে তিনি তাদের বিরুদ্ধে কঠিন আক্রমণের হুকুম দেন। তালেবানরা এদের বিরুদ্ধে কঠিন আক্রমণ পরিচালনা করে মিরবাচ্চাহ কোটের বিদ্রোহকে চিরতরে বন্ধ করে দেয়। মিরবাচ্চাহ কোটের একটু পরে মেইন রাস্তা থেকে পৃথক হয়ে বাগরাম বিমান বন্দরের দিকে গেছে, আর সোজা রাস্তাটি চারিকারের দিকে গেছে। তালেবান যখন কাবুল বিজয়ের পর বাগরাম দখল করে তখন মোর্চায় পাকিস্তানি মুজাহিদ নিযুক্ত ছিলো। তারা জানপ্রাণ দিয়ে ইমারতে ইসলামিয়ার হেফাজতের জন্য সেসব মোর্চায় দিনরাত শক্ত হয়ে দুশমনের মোকাবিলা করে। ইমারতে ইসলামিয়ার উপর ক্রুসেডারদের আক্রমণের আগ পর্যন্ত সেসব মোর্চা পাকিস্তানি মুজাহিদীনের দখলে থাকে। আমার কয়েকজন দেশি বন্ধুও এখানে জখমি এবং শহীদ হয়েছেন। তাদের মধ্যে ভাই সোহাইল শহীদ (গুজরানওয়ালা), সাইফুল্লাহ আফ্রিদি শহীদ (করাচি), ইউসুফ শহীদ (ডেরা ইসমাইল খান), মুন্না শহীদ (করাচি) রহ. উল্লেখযোগ্য। এদের ছাড়াও অনেক নওজোয়ান ইমারতে ইসলামিয়ার হেফাজতের জন্য শহীদ হয়েছেন। দু'চারজনের ব্যাপারে পৃথিবী খবর রাখে, কিন্তু নাম না জানা আরো কতজন যে আছে তার হিসেব কে রাখে?

যেখান থেকে বাগরাম যাওয়ার রাস্তা পৃথক হয়েছে সেখান থেকে সোজা চারিকার যাওয়ার রাস্তা তালেবানের আমলে পাথুরে ছিলো। কিন্তু এখন তা দূরপাল্লার

রোড হয়ে গেছে। এই নতুন রাস্তায় এক ঘন্টা সফর করার পর আমরা চারিকার শহরে পৌঁছি। চারিকার শহরে প্রবেশ করার আগে এই শহরের প্রবেশ ফটক আসে। যারমধ্যে শহর পরিচালনা পরিষদের পক্ষ থেকে খোশআমদেদ লেখা খোদাই করা রয়েছে। শহরে প্রবেশ করলে সর্বপ্রথম বাম দিকে ফৌজি ছাউনি আসে। এটি অনেক বড় ফৌজি ছাউনি। আমি তালেবানের হুকুমতের সময় ১৯৯৬-৯৭ সাল পর্যন্ত এখানে ছিলাম।

ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের নিপুণ শৈলি চারিকার ঝর্ণা

চারিকার শহরের মাঝখান থেকে একটি পাকা ঝর্ণা বহমান আছে। এই ঝর্ণা মূলত আহমদ শাহ মাসউদের পিতৃ এলাকা পাঞ্জশির উপত্যাকা থেকে প্রবাহিত হয়। এই ঝর্ণাটি চায়না ইঞ্জিনিয়াররা নির্মাণ করেছে। তার উভয় পাশ পাকা করা। এই ঝর্ণাটি গৌরবন্দ নদীর ৫০ ফুট গভীরতা দিয়ে প্রবাহিত করে চারিকারে আনা হয়েছে। যেখান থেকে এই ঝর্ণা গৌরবন্দ নদীর নিচে প্রবেশ করে এবং যেদিক দিয়ে নদীর অপর প্রান্তে বের হয়ে যায়– এই উভয় পাশের দূরত্ব প্রায় এক কিলোমিটার। উভয় পাশের পানি আপন লেবেল এবং গতিতে প্রবাহিত হয়। আর এই উভয় জায়গার মাঝখানে গৌরবন্দ নদী পূর্ণ গতিতে অহংকারের সাথে বহমান। এই ঝর্ণাকে পাঞ্জশির থেকে করাবাগ পর্যন্ত সম্পন্ন করতে ৫ বছর সময় লেগে যায়। এই ঝর্ণার কয়েক জায়গাতে বিদ্যুৎও উৎপাদন করা হয়। তাছাড়া ঝর্ণার পানি দ্বারা কয়েকটি বাগানেও সেচ দেয়া হয়। সেসব বাগান কয়েক মাইল জুড়ে বিস্তৃত।

নৌকা চালানো এবং কৃত্রিম পুল তৈরির প্রশিক্ষণ

আমরা যখন চারিকার থেকে বের হই তখন আমি কামাল শহীদকে গৌরবন্দ নদীর সেই জায়গাটি দেখাই যেখানে আমি আরব এবং আফগানি মুজাহিদীনের সাথে হযরত আমিরুল মুমিনীন দা.বা.এর আদেশে নৌকা চালানোর প্রশিক্ষণ নিয়েছিলাম। সেখানে আমরা কৃত্রিম পুল নির্মাণের প্রশিক্ষণও লাভ করি। এসবের প্রয়োজন এজন্য সামনে আসে যে, আহমদ শাহ মাসউদ তালেবানের অগ্রগতি রোধ করতে নদী এবং পানির নালার উপর থাকা পুলগুলো ধ্বংস করে দিতো। তাই আমরা রশি, প্লাস্টিক ও কাঠ দিয়ে কৃত্রিম পুল তৈরির প্রশিক্ষণ নিয়েছিলাম। কিছুদিন প্রশিক্ষণের পর আমরা ২০ মিনিটের মধ্যে কৃত্রিম পুল প্রস্তুত করে ফেলতাম।

জাবালুস সিরাজ

গৌরবন্দ নদীর উপর যেখানে আমরা নৌকা চালানো এবং পুল বানানোর প্রশিক্ষণ নিয়েছিলাম তার একটু সামনে সালাঙ্গ নামে আরো একটি নদীর উপর পুল আছে। এটি পার হয়ে জাবালুস সিরাজে প্রবেশ করতে হয়। জাবালুস সিরাজ একটি ছোট শহর। এখান থেকে ২/১টি রাস্তা বের হয়েছে। এগুলোর একটি গুলবাহার হয়ে পাঞ্জশির উপত্যকায় গিয়েছে এবং অপর একটি দারাসালঙ্গের দিকে গিয়েছে। পাঞ্জশিরের রাস্তায় আহমদ শাহ মাসউদের মেহমানখানা এবং বিদ্যুৎ হাউজ রয়েছে। আমি আহমদ শাহ মাসউদের মেহমানখানায় মোল্লা মুহিব্বুল্লাহ আখুন্দজাদার সাথে থেকেছি। এখানেই আমরা মুরগি রান্না করেছিলাম। (যার আলোচনা আমি অত্র পুস্তকে 'সাবউন খান এবং দেশি মুরগি' শিরোণামে করেছি।)

দাররাহসালঙ্গ থেকে খাঞ্জান পর্যন্ত

এখন আমরা সালঙ্গ নদীর তীর ঘেষে এবং কখনো নদী পার হয়ে অপর তীরে সফর করছিলাম। আমাদের এই সফর ছিল একদমই উপর দিকে আরোহণের। এখানে আমরা সমুদ্রপৃষ্ট হতে অনেক উপর দিয়ে সফর করছিলাম। আমরা যাচ্ছিলাম খানজান শহরের দিকে। সেখানে যেতে সালঙ্গ নামের একটি ছোট শহরও অতিক্রম করতে হয়। সে কারণে এই গিরিপথকে দাররাহ[১৭] সালঙ্গ বলা হয়। এই রাস্তা ততোটা ভালো নয় বরং এখনো এর উপর যুদ্ধের নিদর্শন পরিলক্ষিত হয়। রাস্তাকে বরফ থেকে নিরাপদ রাখার জন্য রাস্তার উপর কৃত্রিম টানেল তৈরি করা হয়েছে। উপরের উঁচু পাহাড় থেকে বরফের স্তুপ নেমে এলে সেগুলো টানেল দিয়ে সোজা নদীতে গিয়ে পড়ে। এতে করে রাস্তা ও রাস্তায় চলমান গাড়িগুলো মৌসুমী বিপদ থেকে নিরাপদ থাকতে পারে। আমি এবং কামাল শহীদ আসর এবং মাগরিব নামাজ দাররাহসালঙ্গে আদায় করি। এশার নামাজ এবং রাতের খাবার আমরা খানজানে পৌঁছে খাই। তখন ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি রাত ১০টা বেজেছে। সেখানে আমরা আধা ঘণ্টা আরাম করার পর সামনের সফর শুরু করি। কারণ, আমরা কাবুল থেকে দাররাহসালঙ্গ পর্যন্ত একটানা ছয় ঘণ্টা সফর করছিলাম।

---

[১৭]. গিরিপথ।

দোশি

আমরা আরো এক ঘণ্টা অতিরিক্ত সফর করি। সাড়ে ১১টার দিকে আমরা দোশি শহরে পৌঁছে যাই। দোশি বাগলান প্রদেশের জেলা। দোশির অধিকাংশ বাসিন্দা আফগান গোজরা। তালেবানের যুগে দোশির পরিচালনার দায়িত্বও এসব আফগান গোজরাদের হাতে ছিলো। শেষ পর্যন্ত এই গোজরা সম্প্রদায় ইমারাতে ইসলামিয়া এবং তালেবানের আজ্ঞাবহ থাকে। ১৯৯৭ সালে যখন আব্দুর রশিদ দোস্তাম, জেনারেল আব্দুল মালেক পাহলোয়ান তালেবানের সাথে গাদ্দারি করে এবং তালেবানকে মাজার শরীফ থেকে পিছু হটতে হয়, তখন কমান্ডার আরবাব হাশেম খান নিজের মাথা হাতের উপর রেখে তালেবানের সহযোগিতা করে। সেও গোজরা ছিলো এবং কুন্দুজ প্রদেশে বসবাস করতো। মাজার শরীফের দুর্ঘটনা থেকে বেঁচে বের হয়ে আসা তালেবানদেরকে হাশেম খানের সঙ্গীরা যেভাবে সাহায্য করেছে তার প্রতিদান একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই দিতে পারবেন।

হাশেম খানের সঙ্গীদের শাহাদাত

ক্রুসেডাররা যখন ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানে হামলা করে তখন দোস্তাম উত্তর আফগানিস্তানে তালেবানের সুপ্রিম কমান্ডার মোল্লা মুহাম্মাদ ফজল আখুন্দের সাথে অস্ত্র অর্পণের শর্তে নিরাপদ রাস্তা দেয়ার চুক্তি করে। তখন মোল্লা মুহাম্মাদ ফজল আখুন্দের পক্ষ থেকে গুরুত্বপূর্ণ এবং উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে হাশেম খানের সঙ্গীরা। কিন্তু সেখানে আব্দুর রশিদ দোস্তাম এবং তার কমান্ডাররা গাদ্দারি করে। কাউকে তারা নিজেরাই গ্রেফতার করে এবং কিছু তালেবানকে আমেরিকার হাতে তুলে দেয়, যারা আজও গোয়ান্তানামু বে কারাগারে বন্দী অবস্থায় শাস্তি ভোগ করছেন। যাদের মধ্যে সর্বাগ্রে আসে মোল্লা ফজল আখুন্দের নাম। এছাড়াও বহু তালেবানকে কন্টিনারে বন্ধ করে শহীদ করে দেয়। তাদেরকে দাশতে লাইলাতে দাফন করা হয়। এভাবে আব্দুর রশিদ দোস্তাম এবং তার কমান্ডাররা সেই চুক্তির প্রায় এক বছর পর হাশেম খানের সঙ্গীদের সাথেও গাদ্দারি করে এবং গ্রেফতার করে নেয়। কিন্তু হাশেম খানের সঙ্গীরা আগেই দোস্তামের এই গাদ্দারি টের পেয়েছিলো। যখন তাদেরকে হেলিকপ্টারে করে নিয়ে যাচ্ছিলো তখন তারা দোস্তামের গুণ্ডাদের উপর শহীদি হামলা করে। যারফলে হেলিকপ্টার ধ্বংস হয় এবং কয়েক দুশমন জাহান্নামে পৌঁছে যায়। তারাও শাহাদাতের পেয়ালা পান করেন। আল্লাহ তায়ালা তাদের উপর লাখো কোটি রহমত বর্ষণ করুন।

দোশির এক ভয়ানক রাত

দোশি থেকে একটি রাস্তা বামিয়ানে এবং অপর রাস্তাটি পুলখমরির দিকে গিয়েছে। যখন আমাদের গাড়ি দোশি শহরে পৌঁছে তখন আমার এক ভয়ানক রাতের কথা মনে পড়ে যায়। ১৯৯৯ সালে আমি যখন আমার জখমি সাথীদের নিয়ে বামিয়ান থেকে দোশি পৌঁছি, তখন বামিয়ানে তালেবানের নিয়ন্ত্রণ ছিলো। এরই মধ্যে আমাকে দায়িত্ব দেয়া হয় ওয়ারলেস অপারেটর হিসেবে। আমাদের মোর্চা ছিলো বামিয়ান এয়ারপোর্টের একটি পাহাড়ে। এক রাতে হঠাৎ দুশমন আক্রমণ করে। দুশমনের সৈন্যরা ছিলো হাজারগানের শিয়া সম্প্রদায়ের, যারা তালেবানের রক্ত পিপাসু ছিলো। মোর্চায় অবস্থিত সাথীরা দুশমনদেরকে দাঁতভাঙ্গা জবাব দেয় এবং তাদেরকে পিছু হটিয়ে দেয়। এ যুদ্ধ ফজর পর্যন্ত চলে। দুশমনরা পিছু হটেছিলো ঠিকই, কিন্তু তারা আবারো হামলা করতে সক্ষম ছিলো। তালেবানের সাহায্য আসতো সুদূর কাবুল থেকে, যে কারণে তাদের অবস্থান ছিল দুর্বল। তাই তারা মোর্চা ছেড়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। আমি মোর্চায় অবস্থিত সাথীদেরকে ওয়ারলেসের মাধ্যমে এই অবস্থা সম্পর্কে অবগত করি এবং তাদেরকে মোর্চা ছেড়ে দিতে বলি। কিন্তু সাথীরা মোর্চা ছাড়তে অস্বীকার করে। তারা বলে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমির সাহেব হুকুম না দিবেন ততক্ষণ আমরা মোর্চা ছাড়বো না। প্রয়োজনে আমরা শহীদ হয়ে যাবো। এরই মধ্যে দুশমনরা দ্বিতীয়বার হামলা করে বসে। মোর্চায় অবস্থিত দুই সাথী– ভাই বশীর পা মোল্লা (সাহিওয়াল) এবং ভাই আব্দুল্লাহ (ভাওয়ালনগর) শহীদ হয়ে যান। এরই মধ্যে মোর্চা ভেঙ্গে যায় এবং দুশমন দ্রুত পাহাড়ে উঠতে থাকে। মোর্চায় অবস্থিত আরো দুই সাথী শহীদ হয়ে যান এবং ৪ সাথী গ্রেফতার হন। শুধু একজন সাথী বেঁচে বের হয়ে আসতে সক্ষম হন।

فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ

তাদের কেউ কেউ স্বপ্ন পূরণ করে নিয়েছে এবং কেউ কেউ অপেক্ষায় আছে। *[আহযাব ৩৩:২৩]*

তালেবান কমান্ডার মোল্লা আব্দুস সাত্তার বললেন, এখন লড়াই করা বৃথা। পিছু হটে আসুক এবং যে কয়জনকে বাঁচানো সম্ভব বাঁচানো হোক। কারণ, অস্ত্রও শেষ হয়ে গেছে আবার কাবুল থেকেও তাৎক্ষণিক সাহায্য পাওয়ার আশা নেই। আমিও আমার যোগাযোগের সরঞ্জাম চেক করে নেই এবং ছোট ওয়ারলেস সেটের মাধ্যমে সাথীদের সাথে যোগাযোগ করতে চেষ্টা করি। এরই মধ্যে

তালেবানের গাড়ি রওয়ানা হয়ে যায়। আমিও আমার সরঞ্জাম উঠিয়ে একটি ৪/৪ গাড়িতে চড়ে বসি। এখন আমাদের যাত্রা বামিয়ান থেকে পুলখমরির দিকে যাওয়ার রাস্তা। এরই মধ্যে তালেবানের একটি হেলিকপ্টার আকাশে দেখা যায়, যেটি সাহায্য পৌঁছানোর দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলো। আমরা কাপড় নাড়িয়ে নিচের কঠিন অবস্থার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করি; কিন্তু তারা বেখবর থাকে এবং হেলিপ্যাডের দিকে এগিয়ে যায়। হেলিকপ্টার অবতরণের জায়গা এয়ারপোর্টের নিকটে ঘন গাছপালার মাঝখানে ছিলো। এয়ারপোর্টে অবস্থানরত দুশমনরা হেলিকপ্টারের আওয়াজ শুনতো কিন্তু হেলিকপ্টার দেখতে পেতো না। যখন পাইলট অবতরণের জন্য হেলিকপ্টারকে নিচু করে তখন হঠাৎ তার দৃষ্টি নিচে লুকিয়ে থাকা দুশমনের উপর পড়ে। পাইলট তখন খুবই বুদ্ধিমত্তার সাথে হেলিকপ্টারকে উপরে উঠিয়ে নেয় এবং দ্রুত শহরে চক্কর দিয়ে কাবুলের দিকে ফিরে আসে। আল্লাহ না করুন, যদি হেলিকপ্টার নিচে নামতো তাহলে হেলিকপ্টার তো দুশমনদের হাতে যেতোই, সেই সাথে সাথীরাও গ্রেফতার হতো। যাইহোক, আমরা ৪/৪ গড়িতে দ্রুততার সাথে সফর করে তালেবানের কাফেলার সাথে মিলে যাই। তারা ১০ মিনিট রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিলো। সেখানে পৌঁছে জানতে পারি, তালেবান কমান্ডারগণ পরস্পরে পরামর্শ করছেন, কারণ দ্রুতই কোথাও মোর্চা বানানো হবে। কিন্তু এখানে সীমাহীন বিপজ্জনক এবং উঁচু পাহাড় রয়েছে। সুতরাং আপাতত এখানে মোর্চা বানানো সম্ভব নয়। এরই মধ্যে একটি ৪/৪ ডাবল কেবিন গাড়িকে এদিকে আসতে দেখি। কাছে আসতেই আমি গাড়িটি চিনে ফেলি। এই গাড়ি আমাদের কমান্ডার আলী জুনাইদের ছিলো, যা রাতে সাথীদের সাহায্যের জন্য গিয়েছিলো এবং শত চেষ্টা সত্ত্বেও তাদের সাথে যোগাযোগ করতে ব্যর্থ হয়। যখন গাড়ি নিকটে আসে তখন দেখি উভয় পাশ থেকে গুলি লাগার কারণে গাড়ি চালনের মতো হয়ে আছে। গাড়িতে সাতজন সাথী ছিলেন। তারা ছিলেন খুবই জখমি। গাড়িতে কেবল রক্ত আর রক্ত ছড়িয়ে ছিলো। ড্রাইভার ভাই মাহমুদ কোমড়ে গুলি লাগার কারণে খুবই জখমি ছিলেন। তারপরও নিজে ড্রাইভিং করে সাথীদেরকে পূর্ণ দক্ষতার সাথে যুদ্ধের ময়দান থেকে বের করে নিয়ে আসেন। গাড়িতে আমাদের কমান্ডার উস্তাদ আলী জুনাইদ সবচেয়ে বেশি জখমি ছিলেন।

রাস্তায় আমি ভাই মাহমুদকে জিজ্ঞেস করি, এমন হলো কিভাবে? অর্থাৎ আপনারা জখমি হলেন কিভাবে? তিনি বললেন, আমরা গত রাতে ওয়ারলেসে আমাদের সাথীদের সাথে যোগাযোগ করতে থাকি। তারা যতক্ষণ মোর্চাতে ছিলো ততক্ষণ এই যোগাযোগ বহাল থাকে। কিন্তু দ্বিতীয়বার যখন মোর্চা

ছাড়তে বলতে থাকে তখন যোগাযোগ সম্ভব হয়নি। আমরা আপনার সাথেও যোগাযোগের চেষ্টা করি, কিন্তু ব্যর্থ হই। আমরা মনে করি, হয়তো আপনারা পরিস্থিতির ভয়াবহতার কারণে আগেই সাথীদেরকে মোর্চা ছাড়তে বলেছেন এবং সবাই বের হয়ে গেছেন। তাই আমরাও সেখান থেকে বের হয়ে বামিয়ান শহরের দিকে আসি। এক বাজারে প্রবেশ করে সম্মুখে অগ্রসর হতে গিয়েই মুশকিলে পড়ি। অনেক সামনে চলে যাওয়ার পর এমন একটি সংকীর্ণ রাস্তার উপর বাজার শেষ হয়ে যায়, যেখানে গাড়ি নেয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া আমাদের সাথে কোনো রাহবরও ছিলো না। তাই আমরা সেখান থেকেই গাড়ি ঘুরিয়ে পুনরায় বামিয়ান এয়ারপোর্টের দিকে যেতে থাকি। যখন আমরা পুনরায় রোডে উঠি তখন আমাদের সামনে একটি ট্রাক দেখা যায়, যার উপর এন্টি এয়ারক্রাফটও স্থাপন করা ছিলো। এটি এক তালেবান চালাচ্ছিলো। তা দেখে আমরাও তার পেছনে চলি। কিছুক্ষণ চলার পর তালেবান তার ট্রাককে ডান দিকের ক্ষেতে নামিয়ে দেয়। ট্রাক ফসল মাড়িয়ে সামনে চলে যায়। আমরাও তার অনুসরণ করে চলতে থাকি। সম্ভবত সে অবস্থা বেগতিক দেখে জেনেশুনেই সংক্ষেপে শহর থেকে দূরে যেতে চাচ্ছে। ভাই মাহমুদ বলেন, আমরা দ্রুততার সাথে সেই ট্রাকের পিছনে ছুটছিলাম। হঠাৎ ট্রাকের তালেবান ব্রেক কষে ট্রাকের ইঞ্জিন বন্ধ করে দেয় এবং ট্রাক থেকে নেমে যায়। আমরাও তাকে থামতে দেখে ব্রেক করি। আমি গাড়ি থেকে নেমে সামনে গিয়ে দেখি সামনে একটি বড় পানির নালা, যেটি অনেক গভীর। সম্ভবত এ কারণেই সে রাস্তা না পেয়ে ট্রাক থামিয়ে দিয়েছে। কারণ, রাশিয়ান ট্রাক খুব শক্তিশালী, এ ধরনের বাধাকে আমলে নেয় না; কিন্তু যেহেতু নালার কিনারা খুব উঁচু ছিলো তাই সে ট্রাক ছেড়ে দেয়। যাইহোক, ঐ তালেবান হেঁটে নালা পাড় হয়ে যায়। আমরা গাড়ি ঘুরিয়ে ক্ষেত থেকে বের হই এবং মেইন রোডেই চলে আসি।

আমি পুনরায় বামিয়ান এয়ারপোর্টের দিকে চলে যাওয়া রাস্তায় দ্রুত গাড়ি চালিয়ে যাই। হঠাৎ আমাদের সামনে ৩০০ মিটার দূরত্বে কিছু সশস্ত্র লোক দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি। তারা রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছিলো। আমরা তখন সেই জায়গার নিকটবর্তী ছিলাম যেখানে বামিয়ানের প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ মূর্তি অবস্থিত। সেই মূর্তির কাছেই একটি দ্বি-মুখী রাস্তা রয়েছে। একটি কাবুল ও পুলখমরির দিকে গিয়েছে, অপরটি বলখাবের দিকে গিয়েছে। আমরা দ্বি-মুখী রাস্তার নিকটে পৌঁছলে আমার সন্দেহ হয় যে লোকগুলো শিয়া এবং আমাদের দুশমনের লোক। এরই মধ্যে সশস্ত্র লোকদের একজন আরপিজি-৭ রকেট দিয়ে আমাদের গাড়ির উপর ফায়ার করে। রকেট গাড়ির বাম দিকে সামনের টায়ারের দুই

মিটার দূরে বিকট শব্দে ব্লাস্ট হয়ে যায়। রকেট ফেটে যাওয়াতে আমাদের গাড়ির বাম দিক চালনি হয়ে যায়। কিন্তু গাড়ির ভিতরে থাকা কারো কোনো ক্ষতি হয়নি। বাস্তব অবস্থা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, পরিস্থিতি বিপজ্জনক। আমি বুঝে নেই– যাই হোক না কোনো, গাড়ি থামানো যাবে না। তাই দ্বি-মুখী রাস্তায় পৌঁছে যখনই আমি গাড়িটি কাবুলের দিকে ঘুরিয়ে দেই ঠিক তখনই দেখি হিংস্র দুশমনরা সামনের রাস্তা আগেই বড় বড় পাথর দিয়ে পুরোপুরি বন্ধ করে রেখেছে। এখানে দুশমনরা কঠিন এ্যাম্বুশ করে রেখেছিলো। আমিও বুঝে ফেলি এখন আমরা দুশমনের এ্যাম্বুশের ফাঁদে আটকা পড়েছি। গাড়ি থামিয়ে গ্রেফতার হওয়া যাবে না বরং যেভাবেই হোক সামনে যেতে হবে। যদি আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে আমাদের ভাগ্যে শাহাদাত লেখা হয়ে থাকে তাহলে তা মিলে যাবে, অন্যথায় আমার রবের যা ইচ্ছা তাই হবে।

আমি মনে মনে আপন রবের নিকট দুশমনের বিরুদ্ধে দোয়া চেয়ে গাড়ির গতি আরো বাড়িয়ে দেই। পুরো রাস্তা যদিও পাথর দিয়ে বন্ধ করে রেখেছিলো কিন্তু রাস্তার কিনারে প্রায় সাড়ে ৩ফুট জায়গা খালি দেখতে পাই। আমি আল্লাহর উপর ভরসা করে পূর্ণ গতিতে গাড়ি ঘুরিয়ে রাস্তার একদম কিনারে এনে সামনে চালিয়ে দেই। গাড়ির একটি টায়ার রাস্তার বামদিকের একদমই কিনারে আর অপর টায়ার পাথরের উপর ছিলো। গাড়ি লাফিয়ে লাফিয়ে সামনে অগ্রসর হতে থাকে। জালেমরা সম্ভবত এই আশায় ছিলো যে, এখন গাড়ি থামাবে এবং তালেবান ও গাড়ি আমাদের হাতে এসে যাবে। কিন্তু আমি যখন গাড়ি পাথরের উপর দিয়ে সামনে চালিয়ে দেই তখন রাস্তার উভয় পাশে এ্যাম্বুশ করা দুশমনরা আমাদের উপর তুমুল ফায়ারিং শুরু করে। আমার পেছনের সিটে বসা ওমর ভাই এবং সামনের সিটে বসা আমাদের কমান্ডার আলী জুনাইদ ভাই দুশমনের উপর জবাবি ফায়ারিং করতে থাকেন। এরই মধ্যে আলী জুনাইদ ভাই জোরে আল্লাহু আকবার বলে ওঠেন এবং তার হাত থেকে গান পড়ে যায়। তিনি ক্লান্ত হয়ে সিটের সাথে লেপ্টে যান। আমি বুঝে ফেলি ভাই আলী জুনাইদ জখমি হয়েছেন। আমার মনোযোগ তখন সামনে ছিলো। আমি টের পাই আমার কোমড়ে আংটার মতো কিছু একটা ঢুকে যায়। মূলত আমার গায়ে গুলি লেগেছিলো। আমার গায়ে যে গুলিটি লেগেছিলো সেটি দুশমনের ছোড়া গুলি, যা ওমর ভাইয়ের হাঁটু জখম করে আমার সিট ছিদ্র করে কোমড়ে ঢুকে যায়। ওমর ভাই এবং জুনাইদ ভাইয়ের পক্ষ থেকে ফায়ারিং বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু গাড়ির আড়ালে বসা সাথীরা দুশমনের উপর ফায়ারিং করতে থাকেন। আমরা এ্যাম্বুশ ভেঙ্গে বের হয়ে এসে পূর্ণ গতিতে গাড়ি ছুটিয়ে দেই। যদিও আমার কোমড়ে

লাগা গুলি আমাকে কষ্ট দিচ্ছিলো কিন্তু হুঁশ ও অনুভূতি সক্রিয় রেখে গাড়ি চালাতে থাকি। এভাবে ছুটতে ছুটতে আপনাদের নিকটে এসে পৌঁছি। ভাই ওমরও খুব জখমি ছিলেন। তার হাঁটুর হাড্ডি ভেঙ্গে গিয়েছিলো। আমাদের সাথে থাকা ডাক্তার নাভিদ শহীদ রহ., যিনি পরে কাশ্মিরে মা-বোনদের ইজ্জত রক্ষার্থে শহীদ হন, তিনি জখমিদেরকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেন। ব্যথা কমার জন্য ইনজেকশনও দেন। এরই মধ্যে তালেবান দোশি যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। কারণ, দোশি শহরে তখনো তালেবানের নিয়ন্ত্রণ ছিলো। এখানে মোর্চা বানানো খুবই মুশকিল ছিলো। এরই মধ্যে গাড়িগুলো দ্রুত দোশির দিকে ছুটতে থাকে। আমিও সরঞ্জামাদি গাড়ি থেকে উঠিয়ে নিয়ে আমার জখমি সাথীদের সাথে গাড়িতে উঠে দ্রুত দোশির দিকে ছুটতে থাকি। এভাবে আমরা রাত ২টায় আমাদের জখমি সাথীদের সাথে দোশি পৌঁছি। অন্তর খুবই ব্যথিত ছিলো। শহীদ হয়ে যাওয়া এবং গ্রেফতার হওয়া সাথীদের বিচ্ছেদে চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরতে থাকে। আজও যখন আমার সেই রাতের কথা মনে পড়ে তখন গায়ের পশম দাঁড়িয়ে যায়।

বামিয়ান বিদ্রোহের কারণ

আজ যখন আমি এই বর্ণনা লিখছি তখন আফগানিস্তানে আমেরিকান ক্রুসেডারদের দখলদারিত্ব চলছে। অন্ধের যষ্ঠির মতো আমেরিকা ও বৃটেনকে আকড়ে ধরে হামিদ কারজাই কাবুলের মসনদে বসে আছে। ইতোপূর্বে আফগানিস্তানে আমেরিকা এবং ইরানের অনুপ্রবেশ তালেবানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কারণ ছিলো। একটু বাড়িয়ে বললে এটাকেই আপনি বামিয়ান বিদ্রোহের কারণ হিসেবে সহজে মেনে নিতে পারবেন।

তালেবানের বিরুদ্ধে দুই ধরনের বিদ্রোহ ছিলো। প্রথমত ভাষা এবং ভুল বোঝাবুঝির কারণে। যার উদাহরণ মিরবাচ্চাহ কোটের বিদ্রোহ। এটি মূলত তাজুক লিডার আহমদ শাহ মাসউদের উস্কানিতে হয়েছিলো। এই বিদ্রোহের মূল ভিত্তি ছিলো ভুল বোঝাবুঝি। তালেবানরা সেটিকে খুব দ্রুত নিষ্পত্তির মাধ্যমে বিদ্রোহকে দমন করে ফেলে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় প্রকারের বিদ্রোহ, যা ১৯৯৭ সালে মাজার শরীফে এবং ১৯৯৯ সালে বামিয়ানে সংঘটিত হয়েছিল, তার মূল কারণ ছিলো শিয়াদের সংগঠন 'হিজবে ওয়াহদাত'-এর ইসলাম বিদ্বেষ এবং আমেরিকা ও ইরান প্রেম। মাজার শরীফের বিদ্রোহ ইসলামের দুশমন কমিউনিস্ট লিডাররা করিয়েছে। এখানে আমি আরেকটি জিনিস স্পষ্ট করা আবশ্যক মনে করছি, ১৯৯৬ সালে কান্তারে তালেবানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হয়।

সেই বিদ্রোহের পতাকাবাহীরা আফগানিস্তানের অনুসারি ছিলো না। তাদের পৃষ্ঠপোষকের ভূমিকায় ছিলো পাকিস্তানি সংগঠন 'লশকরে তয়্যিবা' (জামাআতুদ দাওয়াহ)। তালেবানরা এই বিদ্রোহকেও কঠিন হাতে দমন করে। এতে বিদ্রোহীদের লিডার মারা যায়। এই বিদ্রোহে অনেক লোক গ্রেফতার হয়। যাদের মধ্যে অনেক পাকিস্তানিও ছিলো। এই বিদ্রোহ দমনের ক্ষেত্রে উত্তর ওজিরিস্তানের প্রসিদ্ধ মুজাহিদ কমান্ডার আব্দুল্লাহ মেহসুদ শহীদ রহ.ও শামিল ছিলেন। কাবুলে যখন তার সাথে আমার দেখা হয়, তখন তিনি বলেন, জিহাদের সাথে এদের কোনো সম্পর্ক নেই। এরা ইসলামের বিরুদ্ধে প্রোপাগাণ্ডা ছড়ায় এবং ফুকাহায়ে কেরামের সাথে শত্রুতা পোষণ করে। কখনো কখনো তারা সাহাবায়ে কেরামকে অপবাদ দিতেও কুণ্ঠাবোধ করে না।

তালেবানরা তাদেরকে প্রথমে সতর্ক করে এবং তারপরও যখন বিদ্রোহ করে তখন তালেবানরা এই ফেতনাকে নির্মূল করে।

২০০১ সালে যখন দখলদার ক্রুসেডারদের কারণে তালেবানরা পিছু হটে, তখন আরব মুজাহিদরা পাকিস্তানে চলে আসে। তাদেরকে তখন আশ্রয় দেয়া আবশ্যক ছিলো। তখন কল্যাণকামী ব্যক্তিবর্গ তাদেরকে যেখানে আশ্রয় দিচ্ছিলো সেখানে লশকরে তয়্যিবার লিডার সেসব আরব মুজাহিদীনকে আমেরিকার হাতে বিক্রি করে দিচ্ছিলো। যার সবচেয়ে বড় প্রমাণ আল কায়দার লিডার আবু যুবায়দাকে ফয়সালাবাদ থেকে লশকরে তয়্যিবার লিডার গ্রেফতার করিয়ে দেয়। তাদের আরো দুষ্কর্ম ও অপরাধের ফিরিস্তি জানতে আব্দুর রহীম মুসলিম দোস্ত এবং বদরুজ্জামান বদরের গ্রন্থ 'গোয়ান্তানামু বে কি টোটি জিঞ্জির' (গোয়ান্তানামু বের ভাঙ্গা শেকল) পুস্তকটি পড়তে পারেন। এই দু'জন লেখকই ইসলামের দুশমন লশকরে তয়্যিবা এবং জামাআতুদ দাওয়াহ এর ইঙ্গিতে গ্রেফতার হন। দীর্ঘ ৩ বছর পর্যন্ত গোয়ান্তানামু বে কারাগারে বন্দি থাকেন। তারা বলেন, সেখানে বন্দী মুজাহিদীন হাফেজ সাঈদ তার অন্যান্য লিডার এবং লশকরে তয়্যিবার বিরুদ্ধে নাম নিয়ে বদদোয়া করতো। ২০০৯ সালে বাজুড়ে এসব গায়রে মুকাল্লিদদেরই একটি গ্রুপ, যারা সালাফি তালেবান নামে পরিচিত, তারা আমেরিকার পক্ষে গোয়েন্দাবৃত্তি করতো। এর পূর্ণ প্রমাণ তালেবানের হাতে এলে এই গ্রুপকে শেষ করে আমেরিকান গোয়েন্দা জাল খতম করে দেয়। ১৪০০ বছরের ইসলামী ইতিহাসে মুসলমানদের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে ইহুদীরা। শিয়ারা ইহুদীদের চর হিসেবে কাজ করে। ১৯৯৮ সালে সংঘটিত বামিয়ান বিদ্রোহও হিজবে ওয়াহদাত মুনাফিক ইরানের তত্ত্বাবধানে ইসলাম বিদ্বেষীতার কারণে করে। আমি সকল মুজাহিদীনকে এই পয়গাম দিতে চাই যে,

যখনই আপনারা কোনো এলাকায় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করবেন তখন সেখানকার শিয়াদের উপর সবচেয়ে বেশি নজর রাখবেন। কারণ, যে কোনো সময় আপনার পিঠের উপর আক্রমণ করে বসতে পারে। ১৯৯৮ সালে যখন ইসলাম বিদ্বেষীতার কারণে হিজবে ওয়াহদাত বিদ্রোহ করে এবং তারা দেখলো তালেবানরা তাদের অন্যান্য কাজে ব্যস্ত, তখনই তারা হঠাৎ পিছন দিয়ে আক্রমণ করে বসে। এর ফলে যে ক্ষতি হয়েছে তার এক ঝলক 'দোশির এক ভয়ানক রাত' শিরোণামে আপনারা দেখেছেন।

বামিয়ান

বামিয়ান আফগানিস্তানের একটি প্রদেশ। এই প্রদেশের রাজধানীও বামিয়ান। এই প্রদেশের জেলা বলখাব এবং পাকালঙ্গ। বামিয়ান মধ্য আফগানিস্তানের বাবা পর্বতের সুউচ্চ পাহাড় এবং মধ্য দরজার মাঝখানে অবস্থিত। এখানকার লোকদের ভাষা ফারসী। স্থানীয় লোকেরা যাকে দরী বলে। এর আয়তন ১৪১৭৫ বর্গ কিলোমিটার। এখানে হাজারা শিয়াদের সংখ্যা ৬৭%। বৌদ্ধের পুরাতন মূর্তিও বামিয়ানে ছিলো। এই উঁচু আকৃতির বৌদ্ধ মূর্তি ১৯৯৯ সালে তালেবানরা ধ্বংস করে মূর্তি ভাঙ্গার সৌভাগ্যও অর্জন করে। যারফলে মুশরিকরা চিল্লাফাল্লা করে থেমে যায় আর তালেবানরা আবুল আম্বিয়া হযরত ইবারহীম আ.-এর সুন্নতকে জিন্দা করে।

বামিয়ান জেলে হাজারা শিয়াদের হামলা

১৯৯৮ সালে ১৩ সেপ্টেম্বর যখন তালেবানরা বামিয়ান দখলের জন্য হামলা করে এবং বামিয়ানে তাদের হামলা বাড়তে থাকে, তখন বামিয়ানের হাজারা গোত্রের লিডার করিম খলিল অনুভব করলো, এবার বামিয়ান আমাদের হাতছাড়া হচ্ছে এবং এখানে ইসলামের পতাকা উড়তে থাকবে, তখন সে মুসলমানদের উপর আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা থেকে ওয়ারিস সূত্রে পাওয়া হিংসা, বিদ্বেষ এবং শত্রুতা প্রকাশ করার জন্য এই হুকুম জারি করে। তার হুকুম পাওয়ার পর হিজবে ওয়াহদাতের হাজারা যুদ্ধবাজরা জুলুমের এমন অধ্যায় রচনা করে, যা দেখলে হালাকু খানের অন্তরও কেঁপে উঠতো, চেঙ্গিস খানের জুলুম লজ্জায় মুখ লুকাতে।

হিজবে ওয়াহদাতের নেতা করিম খলিল তার যুদ্ধবাজ সেনাদেরকে বামিয়ান জেলে বন্দী থাকা ৯৮ জন মুহাফিযে ইসলাম তালেবানকে কতল করার হুকুম জারি করে। তারা হাত বোমা, রকেট, কালাশনিকভ ও রাইফেল নিয়ে বামিয়ান

জেলের সেসব কালো কুঠুরীগুলোতে আক্রমণ করে, যেগুলোতে তালেবানরা বন্দী ছিলেন।

১৪/১০ ফুটের কামরাগুলো কয়েদিতে ঠাসা ছিলো। এলোপাথাড়ি ফায়ারিং, রকেট নিক্ষেপ, হাত বোমা বিস্ফোরণের কারণে ২৮ বন্দী জায়গাতেই শহীদ হয়ে যান। আর বাকি কয়েদিদের প্রায় সকলেই কঠিন জখমি হন। দু'একজন তালেবান অলৌকিকভাবে নিরাপদ থাকেন। হাজারাদের উপর যখন তালেবানের আক্রমণ আরো তীব্রতর হয় এবং বিজয়ের পতাকা হাতে তালেবানরা নিকটে চলে আসে, তখন তারা কতজন তালেবান শহীদ হয়েছে আর কতজন জীবিত আছে তা না দেখেই পালিয়ে যায়। কয়েক ঘন্টা পর যখন তালেবানরা সেখানে পৌঁছে, তখন একজন বন্দী তার ছিড়ে যাওয়া সাদা জামা পতাকা বানিয়ে উড়িয়ে দেয়। যার ফলে তালেবানরা জেলখানার দিকে মনোযোগী হয়।

বামিয়ান জেলে তালেবানের উপর শিয়াদের জুলুম

যখন জখমি তালেবানের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয় তখন তারা বামিয়ান জেলের যে নির্যাতনের কথা বর্ণনা করেন তা খুবই মর্মান্তিক। যা শুনে আমার পশম দাঁড়িয়ে যায়। আজ আমি সেসব জুলুম শুধু এ জন্যই বর্ণনা করছি যে, পাঠকরা যাতে এসব জুলুম সম্পর্কে ধারণা লাভের সাথে সাথে ইসলাম এবং মুসলমানদের সাথে তাদের কত দুশমনি তা যেনো অবগত হতে পারে।

গরম শলা দিয়ে ছ্যাঁকা দেয়া

জখমি সাথীরা বলেন, হিজবে ওয়াহদাতের লোকেরা যখন জেলে আসতো তখন তারা কয়েদিদের উপর বিভিন্নভাবে জুলুম করতো। কিন্তু কয়েদিদেরকে গরম শলা দিয়ে ছ্যাঁকা দেয়া তাদের প্রিয় কাজ ছিলো। এমনকি মজলুম কয়েদিদের শরীর থেকে গোশত ঝরে যেতো এবং যখন এই নির্যাতনে কয়েদিরা কান্নাকাটি করতো তখন তারা এতে খুশি হতো।

দাড়ির অবমাননা

তাদের দুশমনি তো ইসলামের সাথে। তাই তারা ইসলামের প্রত্যেক ওই নিদর্শনকে ঘৃণা করতো যার ব্যাপারে ইসলাম হুকুম করেছে। বামিয়ান জেলে দাড়ির অবমাননা করা হিজবে ওয়াহদাতের দৈনন্দিন কাজ ছিলো। কয়েকজন কয়েদির দাড়ি একটা একটা করে টেনে উঠিয়ে ফেলে। যখন তালেবান তাদেরকে বলতো, তোমরা দাড়ির অবমাননা কেনো করছো, এটিতো আল্লাহর

মাহবুব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় সুন্নত। তখন তারা এ নিয়ে ঠাট্টা করতো। যা তাদের কাফের হওয়ার প্রমাণ বহন করে। সহজ-সরল তালেবানের উপর হাজারাদের এই ভয়ানক জুলুম দেখে মানবতা দাঁত দিয়ে আঙ্গুল কামড়াতে থাকে। তালেবানরা তাদের শহীদ এবং জখমি ভাইদেরকে দ্রুত সামলে নিয়ে জেল থেকে বের হয়ে আসে। শহীদদেরকে দাফন করে জখমিদেরকে চিকিৎসার জন্য কাবুল পাঠিয়ে দেয়।

মৃত্যুদণ্ডের ভয়ানক পদ্ধতি

হাজারা শিয়ারা যখন কোনো তালেবানকে মৃত্যুদণ্ড দেয়ার সিদ্ধান্ত নিতো তখন তারা এর জন্যও ভয়ানক পদ্ধতি আবিষ্কার করে রাখতো। আর এই পদ্ধতি তারা কেবল তালেবান কয়েদিদের বিরুদ্ধেই ব্যবহার করতো। কারণ, মুসলমানদের সাথে তাদের দুশমনি তাদের অন্তর জুড়ে বিদ্যমান ছিলো। যা ঠাণ্ডা করতে তারা বামিয়ান জেল থেকে কয়েকজন আলেম, হাফেজ, কারী এবং সৎ নওজোয়ানকে বের করে শহীদ করে দেয়।

গাড়ির নিচে পিষ্ট করা

তারা যে কয়েদিকে শহীদ করার সিদ্ধান্ত নিতো তাকে সকাল সকাল বের করে সকল কয়েদিদের সামনে খোলা ময়দানে নিয়ে আসতো এবং কয়েদিকে ৪/৪ গাড়ির নিচে পিষে ফেলতো। যার ফলে কয়েদি তড়পাতে তড়পাতে শহীদ হতো।

বিরল পদ্ধতি

তারা তালেবান বন্দীদেরকে শহীদ করার জন্য আরো একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করে। সেটি হলো, দু'টি ধারালো খঞ্জর জমিনে পুতে দিতো এবং সেগুলোর উপর কয়েদিকে পেটের উপর শুইয়ে দিতো। যারফলে কয়েদির কঠিন কষ্ট হতো। যখন খঞ্জর কয়েদির পেটে ঢুকে যেতো এবং তার কষ্টে কয়েদি চিৎকার করতো তখন কয়েদির চিৎকারে বামিয়ান জেলও কেঁপে উঠতো। শেষপর্যন্ত অসহায় কয়েদি কঠিন কষ্ট সহ্য করতে করতে নিজের আত্মা জান কবজকারীর হাতে সোপর্দ করতো।

আবু জাহেলি চিন্তা-চেতনা

কখনো কখনো তারা এই বর্বর পদ্ধতি অবলম্বন করতো যে, কয়েদির দুই পা দুই গাড়িতে বেঁধে দিয়ে গাড়ি দুটো দু'দিকে চালিয়ে দিতো। যারফলে কয়েদির শরীর দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যেতো। এভাবে মজলুম, নিরুপায়, অসহায় কয়েদি ইসলামের প্রতিরক্ষার এই যুদ্ধে ইসলামের প্রথম শহীদা সাইয়িদা সুমাইয়া রা.-এর অনুকরণে নিজের জীবনকে ইসলামের ভিত্তি প্রতিষ্ঠায় ব্যয় করেন এবং সফল ও কামিয়াব হয়ে আপন রবের দরবারে হাজির হন। আর এর বিপরীতে শাস্তি দানকারী হাজারা শিয়াদের চিন্তা-চেতনাও ফেরাউন এবং আবু জাহেলের চিন্তা-চেতনার প্রতিবিম্ব। শিয়াদের দুশমনি তো তাদের দুশমনিকেও হার মানিয়ে খালেছ ইহুদী পদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলো। যার ভিত্তি ইসলামের দুশমন রইসুল মুনাফিকীন ইহুদী আব্দুল্লাহ বিন সাবা স্থাপন করেছিলো।

সাহাবায়ে কেরামের অবমাননা

সাইয়িদুনা সিদ্দিকে আকবর রা.-এর ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা ইরশাদ করেছেন তার মর্মার্থ অনেকটা এমনঃ

'হে আল্লাহ! আমি প্রত্যেকের অনুগ্রহের প্রতিদান দিয়েছি। শুধু একজন আবু কুহাফা রা. এর ছেলে আবু বকর রা.-এর অনুগ্রহের প্রতিদান তুমি দাও।'

উমর বিন খাত্তাব রা., যিনি ছিলেন ন্যায় ও আজাদির ইমাম, যার ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ অনেকটা এমনঃ

'যদি আমার পরে কোনো নবী থাকতো তাহলে ওমর রা. নবী হতেন।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামাতা, অনুগ্রহ ও দানশীলতার ইমাম, লজ্জাশীলতার অনুপম উপমা, মজলুম শহীদ সাইয়িদুনা উসমান বিন আফফান রা.। যিনি স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জবানে ৫ বার জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছেন।

এরা সেই ব্যক্তিত্ব যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন। যাঁরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামের প্রচার এবং প্রতিরক্ষার দায়িত্ব পালন করেছেন। পবিত্র কুরআনের সূরায়ে নূরের আয়াত যাদের খলিফা হওয়ার প্রমাণ বহন করে। আল্লাহ তায়ালা দীন প্রতিষ্ঠার যে ওয়াদা করেছেন তা তিনি তাদেরকে দিয়েই পূর্ণ করেছেন। সকল মুসলমান খোলাফায়ে রাশেদীনসহ সকল সাহাবায়ে কেরামের সাথে মহব্বত এবং বিশ্বাস রাখে। তাদের অনুসরণ

করাকে নিজেদের জন্য সৌভাগ্য মনে করে। স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করছেন–

فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا

সুতরাং যদি তারা তোমাদের মতো ঈমান আনে তাহলে তারা হেদায়াত প্রাপ্ত হয়ে যাবে। *[বাকারা ২:১৩৭]*

[অত্র আয়াতে সাহাবায়ে কেরামের ঈমানকে আদর্শ ঈমানের মাপকাঠি সাব্যস্ত করে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য ও স্বীকৃত ঈমান হচ্ছে সে রকম ঈমান, যা সাহাবায়ে কেরাম অবলম্বন করেছেন। যে ঈমান ও বিশ্বাস এ থেকে চুল পরিমাণও ভিন্ন, তা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।]

হাজারা গোত্রের ভিত্তিই ইসলামের দুশমনির উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং তাদের অন্তরে আল্লাহ, তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামের মহব্বত কোত্থেকে আসবে? যার সুস্পষ্ট প্রমাণ তাদের কিতাবাদি এবং তাদের এই আচরণের মধ্যেই রয়েছে। হাজারা শিয়ারা এসব মজলুম এবং অসহায় তালেবানের সামনে মাটিতে খোলাফায়ে রাশেদীনের নাম লিখে (নাউযুবিল্লাহ) জুতা দিয়ে দলতো এবং বরকতময় এসব ব্যক্তিত্বের নামের অবমাননা করতো। এভাবে নিজেদের আমলনামায় চিরদিনের জন্য অপমান এবং বদবখতি লিখে নিতো।

আমি যখন কয়েদিদের থেকে এসব অবস্থা শুনি, যাদের ব্যাপারে আমি আগে অনেক আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের উলামায়ে কেরামের কিতাবে পড়েছি, তখন অন্তরে অনুভূতি জন্মে যে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মধ্যে সর্বদা এমন একটি জামাত থাকা প্রয়োজন যারা সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা রক্ষার দায়িত্ব পালন করবে এবং সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা এবং অবস্থান সম্পর্কে উম্মতকে অবগত করবে। এই ধারাবাহিকতায় পাকিস্তানে আমিরে আজিমত মাওলানা হক নেওয়াজ জঙ্গী শহীদ রহ. এবং তার বন্ধুদের প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়।

তালেবানের আগে হিজবে ওয়াহদাতের জুলুম

তালেবান আসার আগেও আফগান জনগণের সাথে হিজবে ওয়াহদাতের শত্রুতা এবং তাদের উপর জুলুম নির্যাতনের প্রমাণ আমি কাবুলে এবং অন্যান্য এলাকায় নিজে দেখেছি। কাবুলের জনগণ থেকে আমি শুনেছিও। কাবুলের চিড়িয়াখানার কাছে অবস্থিত বাজারের দেয়ালগুলো তাদের জুলুমের সাক্ষী। যেখানে কাফেররা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের নওজোয়ান এবং বৃদ্ধদেরকে ধরে নিয়ে আসতো

এবং তাদের হাত পায়ে বড় বড় পেরেক গেড়ে বাজারের দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখতো। যারফলে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের নওজোয়ানরা তড়পাতে তড়পাতে জীবন দিতো।

মৃতের নাচ

এছাড়া তাদের আরো একটি জুলুম এমন ছিলো যে, তারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের এক নওজোয়ানকে ধরে নিয়ে আসতো। তার শাহরগ কেটে তার উপর পেট্রোল ঢেলে আগুন লাগিয়ে দিতো। যারফলে তার রগগুলো বন্ধ হয়ে যেতো। এতে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের এই নওজোয়ান খুব ছটফট করতে থাকতো এবং চিৎকার করে কাঁদতে থাকতো। আর হাজারা শিয়ারা তার চারপাশে দাঁড়িয়ে শোরগোল করতো এবং নেচে-গেয়ে আনন্দ প্রকাশ করতো। তাদের এই জুলুম আফগানিস্তানে মৃতের নাচ হিসেবে পরিচিত ছিলো।

জাতিসঙ্ঘের ভূমিকা

জাতিসঙ্ঘ, আমেরিকা, ইউরোপ এবং গোটা বিশ্বে মানবাধিকারের ফেরিওয়ালা সংগঠনগুলো আফগানিস্তানে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের উপর সংঘটিত এসব জুলুমের ব্যাপারে চুপ ছিলো। যা মূলত পর্দার আড়ালে কাফেরদের সমর্থন ছিলো। সেই সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীর সুস্পষ্ট প্রমাণও বহন করতো।

মানবাধিকারের পতাকাবাহী সংগঠন এবং দেশগুলো অমানবিক জুলুমের সময় কখনো কোনো আওয়াজ করেনি, কোনো প্রতিবাদও করেনি। অথচ তালেবানের যুগে শরয়ী এবং ইসলামী শাস্তিগুলোতে তাদের মানবাধিকার উথলে উঠতে দেখা গেছে। সেসব শাস্তি ও কেসাস আল্লাহ এবং তার রাসূলের আদেশের আনুগত্যে ছিলো। আর এসব কানুনের কারণেই তালেবানরা আফগানিস্তানে সেই নিরাপত্তা এবং শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলো যা আমেরিকা এবং ইউরোপের শহরগুলোতে পাওয়া যায় না।আফগানিস্তানে এসব কাফেরদের কেবল জুলুমই ছিলো। যারফলে আফগানিস্তানে এই উপমা সবার মুখে মুখে ছিলো যে, আফগান রাগলে উজবুক দয়ালু। উজবুক রাগলে হাজারাহ দয়ালু।

আফগান বর্ডারে ইরানি সৈন্য সমাবেশ

ইরান কয়েকটি দেশে সন্ত্রাসী সংগঠন এবং প্রতিষ্ঠান করে রেখেছে। যারা ইরানি পৃষ্টপোষকতা এবং আর্থিক সহায়তায় সেসব দেশের নিরাপত্তা ও শান্তি বিনষ্ট

করছে। সেগুলোর মধ্যে আফগানিস্তানের হিজবে ওয়াহদাত, পাকিস্তানে তাহরিকে জাফরিয়া, আইএইচও, ফিলিস্তিনে শিয়া আহলে মিলিশিয়া, লেবাননে হিযবুল্লাহ এবং ইরাকে লশকরে মাহদি ইত্যাদি। এসবের সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে। যদি পাঠকগণ এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চান তাহলে পাকিস্তানের বিশিষ্ট সাংবাদিক এবং কলামিস্ট নাজির আহমেদের গ্রন্থ ایران کے افکار و عزائم থেকে ধারণা নিতে পারেন।

তালেবানরা যখন বামিয়ান দখল করে তখন আফগানিস্তানে ইরানি মদদপুষ্ট হিজবে ওয়াহদাতের সামরিক এবং রাজনৈতিক প্রতিপত্তি শেষ হয়ে যায়। ইরান প্রত্যেক দেশে অনুপ্রবেশকে তাদের জন্মগত অধিকার মনে করে এবং খোমেনির কুফরি বিপ্লবের পর তাদের এই অভ্যাসের মধ্যে অভাবনীয় সংযোজন ঘটে। খোদ অভিশপ্ত খোমেনি ১৯৮৭ সালে হজের সময় হারামাইন শরীফাইনের উপর হামলা করার মাধ্যমে যার বহিপ্রকাশ ঘটিয়েছিল।

ইরানের হুকুমত এ কথা মেনে নিতে পারেনি যে, তাদের টাকায় পরিচালিতরা শেষ হয়ে যাবে। তারা তাদের অনুসারী শিয়াদেরকে সর্বাবস্থায় মজবুত অবস্থানে দেখতে চায়। ইরানি পার্লামেন্ট আফগানিস্তানে তালেবানের বিরুদ্ধে সামরিক হস্তক্ষেপের সম্মতিমূলক অনুমতি প্রদান করে। ১৯৯৮ সালের ১ অক্টোবর ইরান আফগানিস্তানের হেরাত বর্ডারে দুই লক্ষ সৈন্য সমাবেশ ঘটায়।

তালেবানরা তাদের মোকাবিলার জন্য সৈন্য প্রস্তুত করে, যাদের নেতৃত্ব দেয় গর্বিত কমান্ডার মোল্লা দাদুল্লাহ শহীদ রহ.। তারা ঘোষণা করেন, যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে তালেবান ইরানে প্রবেশ করবে এবং গেরিলা হামলা চালাবে। তালেবানের এই সাহসিক ঘোষণা, ভূমিকা এবং অকুতোভয় অবস্থা দেখে ইরানি হুকুমত এই চিন্তা করে তাদের সৈন্য ফিরিয়ে নেয় যে, নিতে এসে না আবার দিয়ে যেতে হয়।

ইরানি অনুপ্রবেশের প্রমাণ

তালেবানরা এক বছর পর্যন্ত বামিয়ানের রাস্তা বন্ধ করে রাখে। যারফলে ঘেরাওয়ের অবস্থা সৃষ্টি হয়। কিন্তু বামিয়ানের লোকদেরকে ইরানি অনুপ্রবেশই তালেবানের মোকাবিলা করতে উদ্বুদ্ধ করে। যার কারণেই তারা ইমারাতে ইসলামিয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলো। ইরানি বিমানগুলো প্রতিদিন আকাশ পথে বিপুল পরিমাণ রসদপত্র বামিয়ান নিয়ে আসতো। যারমধ্যে সব রকমের সরঞ্জাম শামিল ছিলো। আর এসবই বামিয়ানের যুদ্ধবাজদের চাহিদা পূরণ

করতো। এরই মধ্যে ইরান বামিয়ানের এয়ারপোর্ট প্রশস্ত করে সেখানে একটি বড় রানওয়ে নির্মাণ করে। সেখানে ইরানি ফৌজি ইঞ্জিনিয়াররা দিন রাত কাজ করতো। ফলে বামিয়ান এয়ারপোর্ট অপারেশন পরিচালনার অধিক উপযোগী হয়। যার মাধ্যমে কয়েকটি বড় বড় ট্রান্সপোর্ট এবং কার্গো বিমান সেখানে অবতরণ করতে থাকে। ইরান হাজারা শিয়াদের চিকিৎসার জন্য এখানে একটি নতুন হাসপাতাল স্থাপন করে। সেখানে যুদ্ধবাজ হাজারা শিয়াদের চিকিৎসা করা হয়। এছাড়া একমাত্র ইরানই তালেবানের বিরুদ্ধে প্রোপাগাণ্ডা ছড়াচ্ছিলো। যাতে যে কোনোভাবেই হোক বামিয়ানের উপর ইমারতে ইসলামিয়ার জানবাজদেরকে হামলা করা থেকে বিরত রাখা যায়। কিন্তু তালেবানরা কোনো কাফের বা মুনাফিকের আক্রমণের ভয় আমলে নেয় না। ১৯৯৮ সালের সেপ্টেম্বরের প্রথম ১০ দিনের মধ্যে বামিয়ানে আক্রমণ পরিচালনা করে এবং ১৩ সেপ্টেম্বর মিনি ইরান তথা বামিয়ান দখল করে নেয়।

ইরানি অস্ত্র

যখন তালেবানরা বামিয়ানে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে তখন তারা বিপুল পরিমাণ ইরানি অস্ত্র হাতে পায়। যেগুলোর মধ্যে রকেট, মেশিনগান এবং কালাশনিকভের তালাবদ্ধ পেটির স্তুপ ছিলো। এগুলো কয়েকটি ডিপুতে রক্ষিত ছিলো। ৪টি হেলিকপ্টার এবং ৩০টি ট্যাংকও বামিয়ান থেকে পাওয়া যায়। বামিয়ান ইরানি চক্রান্তকারীদের সবচেয়ে বড় মারকাজ ছিলো। এখানে ইরান প্রতিদিন ১০/১৫টি ফ্লাইটে সাহায্য এবং অস্ত্র পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু করেছিলো। এর উপর তারা খুব অহংকারও করতো। কিন্তু সব কিছুই আল্লাহ তায়ালার বাঘদের সামনে মাকড়সার জাল প্রমাণিত হয়।

পুলখমরি

দোশি শহর থেকে আরো এক ঘণ্টা সফর করে আমরা পুলখমরি পৌঁছি। পুলখমরি খুব সুন্দর একটি জায়গা। এই শহরের তিনদিক পাহাড় ঘেরা। সেখানে দাঁড়িয়ে শহরের দিকে তাকালে পুলখমরি শহর আপনাকে খুব সুন্দর দৃশ্য উপহার দেবে। কাবুলের দিক থেকে শহরে প্রবেশ করলে রাস্তার বামদিকে অবস্থিত ফ্লাওয়ার মিল রয়েছে। ফ্লাওয়ার মিল আফগানিস্তানের খুব কম এলাকাতেই আছে। পুলখমরি শহরের মাঝখান থেকে একটি নদী প্রবাহিত হয়ে বাগলান এবং কুন্দুজ হয়ে আমু নদীতে গিয়ে মিশেছে। এই নদী যেখান থেকে

পুলখমরি শহরে প্রবেশ করে সেখানে ড্যাম বানিয়ে পানি আটকিয়ে ঝর্ণা বের করা হয়েছে। সেখানেই নদীর উপর একটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি করা হয়েছে। এখান থেকেই পুলখমরি শহরে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। এই ঝর্ণা থেকে পুলখমরির উপকুলীয় এলাকায় পানি সরবরাহ করা হয়। যারফলে সেখানে খুবই চমৎকার ফসল হয়। পুলখমরিতে একটি সিমেন্টের ফ্যাক্টরিও আছে। ফ্যাক্টরিতে পাথর সরবরাহের জন্য একটি ছোট ট্রেন আছে। তালেবানরা তাদের শাসনামলে এটিকে পূর্ণভাবে চালু করে। যার আলোচনা আমি 'তালেবান আফগানিস্তানকে কী দিয়েছে' শিরোণামে করেছি।

পুলখমরি ভৌগোলিক দৃষ্টিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। কারণ, কাবুল থেকে মাজার শরীফ অথবা কাবুল থেকে কুন্দুজ যাওয়ার জন্য আপনাকে পুলখমরি দিয়ে অবস্যই যেতে হবে। পুলখমরিতে একটি নতুন হাসপাতাল রয়েছে। এটি সব রকমের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি দ্বারা সজ্জিত। তালেবানের আগে পুলখমরির মতো গুরুত্বপূর্ণ জায়গা শিয়াদের ইসমাইলি ফেরকার নেতৃত্বাধীন বিশেষ খলিফা মানসুর নাদেরির নিয়ন্ত্রণে ছিলো। পুলখমরির কমান্ডার ছিলো তার ছেলে সাইয়েদ নাদেরি। মানসুর নাদেরির হেডকোয়ার্টার দাররাহকিয়ানে ছিলো। সেখানে সে তার মহল এবং পার্লামেন্ট পাহাড়ের আকৃতিতে বানিয়ে রেখেছিলো। সেখানেই সে প্রচলিত ইসমাইলি রাজত্বের নকশা তৈরি করে।

দাররাহকিয়ান

বিদেশি চক্রান্তের প্রথম মারকাজ বামিয়ান এবং দ্বিতীয় মারকাজ দাররাহকিয়ান। গত ৮০০ বছর যাবত ইসমাইলি ফেরকা আগাখানিদের মারকাজ ছিলো। এই জামাত মূলত হাসান বিন সাব্বাহার হাতে তৈরি। যারা দক্ষিণ ইরানের কোহেস্তানি এলাকায় কজভিনে 'আল মাউত' নামক পাহাড়ের চূড়ায় এক অজেয় কেল্লাকে নিজেদের মারকাজ বানায়। এই কেল্লাকে আশিয়ানা উকাব বলা হতো।

হাসান বিন সাব্বাহ তার ফেদায়িদের মাধ্যমে গোটা পৃথিবীকে এতো ভীত-সন্ত্রস্ত করেছিলো যে, অনেক হুকুমত তাকে ট্যাক্স দিতো। তার অধীনস্তরা দেড় শতাব্দিরও অধিক কাল এই ধারবাহিকতা জারি রাখে। শেষপর্যন্ত হিজরি সপ্তম শতাব্দিতে হালাকু খানের হাতে আল মাউত নামক কেল্লাহ ধ্বংস হয় এবং বাতেনি গ্রুপের লোক বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। তাদেরই কিছু লোক আফগানিস্তানে দাররাহকিয়ানে এসে আবাদ হয়। ধীরে ধীরে এই এলাকা তাদের মারকাজ হয়ে

যায়। আল মাউত এর স্মরণে এখানে দাররাহকিয়ানে জায়গায় জায়গায় উকাবের ছবি, আকৃতি এবং নিদর্শন দেখা যায়।

কমান্ডার মানসুর নাদেরি এখানকার প্রধান ছিলো। তালেবান বিরোধী কমান্ডারদেরকে সাহায্য করার ক্ষেত্রে সে ছিলো সবার আগে। এসব সাহায্য অভিশপ্তকে তার বিদেশি প্রভুরা ইসলাম প্রচারের পবিত্র আন্দোলন তাহরিকে তালেবানকে দমনের জন্য দিতো। তালেবান যখন দাররাহকিয়ান দখল করে তখন মানসুর নাদেরি পালিয়ে যাওয়ার মধ্যে মুক্তি খুঁজে পায়। তালেবানরা ইমারত, উকাব (ঈগল পাখি)-এর আকৃতি বিশিষ্ট মহল দেখে হয়রান হয়ে যায়। কারণ, এই উকাবের আকৃতি বিশিষ্ট মহল পাহাড়ের চূড়ায় ছিলো। যেখানে পৌঁছার জন্য ব্যবহৃত ট্রেনের মতো লিফ্টও তালেবানের জন্য নতুন জিনিস ছিলো।

অস্ত্রের গুদাম

তালেবানরা গনিমতের মাল হিসেবে দাররাহকিয়ান থেকে এতো পরিমাণ অস্ত্রের ডিপো পায় যে, আফগানিস্তান বিজয়ের মধ্যে অন্য কোথাও এতো অস্ত্র পায়নি। কেবল একটি ডিপোতে ৫০০ শ্রমিক তিনদিন পর্যন্ত ট্রাকের মাধ্যমে অন্য জায়গায় নিতে থাকে। এ ধরনের কয়েকটি ডিপো তালেবানের হাতে আসে। ইসলামী শরীয়তে ছবি বানানো এবং আকৃতি বানানো হারাম। তাই উকাবের আকৃতি বিশিষ্ট মহল তালেবানরা বিস্ফোরক দিয়ে ধ্বংস করে দেয়।

চাকা পাংচার হয়ে গেছে

আমি আমার সাথী কামাল শহীদ রহ. এর সাথে খোশগল্পে মশগুল ছিলাম। গাড়ি খুব দ্রুত পুলখমরি নদী পার হচ্ছিলো। এই দীর্ঘ সফরে কামাল শহীদ রহ. এর মতো মিশুক এবং হাসিখুসি সাথী অমূল্য নেয়ামতের চেয়ে কম ছিলো না। এ সময় হঠাৎ এক বিস্ফোরণ হয় এবং গাড়ি ঢেউ তুলতে থাকে। আমাদের বাস হেলে যায় এবং দাঁড়িয়ে যায়। আমি অল্পক্ষণের জন্য পেরেশান হয়ে যাই। ব্যাপার কী, কী হলো? এরই মধ্যে ড্রাইভার নিচে আয়না ফেলে দেখলে তার মুখ থেকে অর্থহীন কথা বের হয়ে আসে। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে গাড়ির সকল যাত্রী নিচে নেমে যায়। বাসের কর্মীরা খুব পরিশ্রম করে টায়ার পরিবর্তন করে। ড্রাইভার তার সিট বুঝে নেয় এবং গাড়ি আবার তাশকরগানের দিকে রওয়ানা হয়ে যায়।

তাশকরগানে অবস্থান

আমাদের বাস যেটি জার্মান মার্সিডিজ কোম্পানির তৈরি ছিলো সেটি পুলখমরি থেকে খুব দ্রুত মাজার শরীফের দিকে এগুচ্ছিলো। রাত আড়াইটার দিকে তাশকরগান পৌঁছি। তাশকরগানের পুরাতন নাম খলম। মাজার শরীফ এবং তাশকরগানের আশেপাশে এখনো খলম নামেই পরিচিত। তাশকরগানের বাসিন্দারা খুবই গভীর বিশ্বাসের মুসলমান। এখানকার অধিকাংশ আবাদি পখতুন গোত্রীয়।

১৯৯৭ সালে যখন তালেবানদেরকে মাজার শরীফ থেকে পিছু হটতে হয় তখন তাশকরগানের লোকেরা জবুথবু জখমি তালেবানেরকে আন্তরিকতার সাথে তাদের ঘরে আশ্রয় দেয়। তালেবানের এই মসিবতের দিনে তারা নিজেদের প্রণ হাতে নিয়ে সাহায্য করে। তাদের আন্তরিক ভূমিকা উল্লেখ না করা অকৃতজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুই হবে না।

তাশকরগানের লোকেরাই তালেবানদেরকে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দেয়। জখমি তালেবানের চিকিৎসা করে। সাহায্য প্রার্থীদেরকে যথাসাধ্য আন্তরিক সাহায্য করে। যা তালেবানও স্বীকার করে। তাশকরগানের লোকদের তালেবানের প্রতি সাহায্যের বিস্তারিত বর্ণনা জানতে হযরত মাওলানা মাকসুদ আহমদ শহীদ রহ. এর পুস্তক 'খাক ও খুন' পড়তে পারেন। 'খাক ও খুন' এর লেখক মাওলানা মাকসুদ আহমদ শহীদ রহ. নিজে লাল মসজিদের তাহরিকে তালেবাত ও তালেবান এর সময় আমেরিকার দালাল জেনারেল পার্ভেজ মোশাররফের জুলুমের শিকার হয়ে নিজের জীবনকে জান কবজকারীর হাতে সোপর্দ করেন।

তাশকরগানের শেষ প্রান্তে পৌঁছে আমাদের বাসের ড্রাইভার গাড়ি একপাশে থামিয়ে ঘোষণা করে, সামনে হাজারা শিয়াদের এলাকা, তাই আমরা রাতে সামনে যেতে পারবো না। কারণ, তারা গাড়ি লুট করে।

ঈমানের ডাকাত এবং মালের ডাকাত

তারা একদিকে যেমন ঈমানের ডাকাত, সেই সাথে মালেরও ডাকাত। তাশকরগান থেকে সামনে হাজারা শিয়াদের এলাকা। সেখান দিয়ে যাতায়াতরত সকল গাড়ির মুসলমান যাত্রীদেরকে তারা লুট করে। কখনো কখনো হত্যা করতেও পিছপা হয় না। তাশকরগান থেকে মাজার শরীফ মাত্র ৩০ কিলোমিটার দূরত্বের পথ। যা মাত্র ৪৫ মিনিটের সফর। কিন্তু ঈমান এবং মালের ডাকাতদের

কারণে রাত আড়াইটা থেকে সকাল সাড়ে ছয়টা পর্যন্ত আমাদেরকে তাশকরগানেই থাকতে হয়।

হায়রাতান রাজপথ অথবা দোস্তি রাজপথ

সকালে আমরা তাশকরগানে ফজর নামাজ আদায় করি এবং সাড়ে ছয়টার দিকে মাজার শরীফের দিকে রওয়ানা হই। মাজার শরীফ থেকে সামান্য আগে একটি রাস্তা বের হয়ে যায়, যা মরুভূমি হয়ে হায়রাতান বন্দর পর্যন্ত গিয়েছে। এই রাজপথকে হায়রাতান বিশ্বরোড বলে। কিন্তু সেখানকার অধিবাসীদের নিকট এই রাজপথ দোস্তি নামে পরিচিত। হায়রাতান বন্দর আমু নদীর তীরে অবস্থিত। আমু নদীর উপরে একটি বড় সেতু রয়েছে। দোস্তি রাজপথ আফগানিস্তানকে উজবেকিস্তানের সাথে সংযুক্ত করে দিয়েছে। দোস্তি সেতু রাশিয়ানরা নির্মাণ করেছিলো। এ সেতুর উভয় পার্শ্বে রাস্তা এবং মাঝখানে রেল লাইন রয়েছে। দোস্তি সেতু আফগানিস্তানের ব্যবসার একটি বড় মাধ্যম। মধ্য আফগানের অধিকাংশ মাল দোস্তি সেতুর মাধ্যমে আফগানিস্তানের হায়রাতান বন্দরে আসে। আমু নদীর অপর তীরে উজবেকিস্তানের প্রসিদ্ধ শহর তিরমিজ অবস্থিত। যা বড় মুহাদ্দিস এবং পবিত্র হাদীস সমূহের বড় কিতাব জামেয়ে তিরমিজি এর লেখক ইমাম তিরমিজি রহ. এর জন্মস্থান এবং বাসস্থান।

মাজার শরীফ

প্রায় সাড়ে সাতটার দিকে আমরা মাজার শরীফ বাসস্ট্যান্ডে পৌছি। বাস থেকে নেমে আমরা একটি হোটেলের পথ ধরি। সেখানে আমরা হাতমুখ ধুয়ে চাঙ্গা হই। ততক্ষণে হোটেলের বেয়ারা আসে। কামাল শহীদ তাকে নাশতা নিয়ে আসতে বলেন। অল্পক্ষণের মধ্যে সে আফগানি নাশতা নিয়ে চলে আসে। নাশতা শেষ করে হোটেল থেকে বের হলে আমাদের দৃষ্টি বিশাল এলাকা জুড়ে দাঁড়িয়ে থাকা মাজারের উপর পড়ে। এই মাজারই মাজার শরীফ শহরের প্রসিদ্ধির কারণ। এ মাজারটিও রাফেজি শিয়াদের বানানো। এই মাজারকে সাইয়েদুনা আলী রা. এর দিকে সম্পৃক্ত করে তারা বলে, এটি নাকি হযরত আলী রা. এর কবর। কিন্তু ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটি সম্পূর্ণ ভুল। কারণ, কোনোভাবেই সাইয়েদুনা আলী রা. এর আফগানে আসা প্রমাণিত নয়। এ জন্য আমার সাথী কামাল শহীদ রহ. বলেন, 'যেখানে আকল থাকবে সেখানে সাহাবায়ে কেরামের দুশমন থাকবে না। আর যেখানে সাহাবায়ে কেরামের

দুশমন থাকবে সেখানে আকল থাকবে না।' এই মাজারের বেষ্টনীর মধ্যে একটি বড় ডেগের মধ্যে ভাগ্যের তালা লাগিয়ে রেখেছে। মূর্খ লোকেরা এসে সেটি টেনে খুলে। যদি তালা খুলে যায় তাহলে তারা মনে করে তাদের ভাগ্যের তালা খুলে গেছে। এই বিশ্বাস একটি ভ্রান্ত বিশ্বাস। কারণ ভালো মন্দের মালিক আল্লাহ তায়ালা।

চারব্রুকের দিকে

আমরা হোটেল থেকে বের হলে কামাল শহীদ রহ. আমাকে বাসস্ট্যান্ডে নিয়ে যান। এখান থেকে গাড়ি চারব্রুকের দিকে যায়। কিন্তু গাড়ি রওয়ানা হতে বিলম্ব হবে। অথচ আমাদেরকে দ্রুত চারব্রুকে যাওয়া প্রয়োজন ছিলো। তাই কামাল শহীদ রহ. এক টেক্সিওয়ালার সাথে কথা বলেন। সে ২০০ আফগানিতে চারব্রুক যেতে রাজি হয়। আমরা সকাল নয়টার দিকে চারব্রুকের দিকে রওয়ানা হয়ে যাই। দেড় ঘণ্টা সফর করার পর আমরা চারব্রুকে পৌঁছি।

চারব্রুক মাজার শরীফ থেকে শিবারগানের পথে অবস্থিত। যখন আমরা চারব্রুকের দিকে যাচ্ছিলাম তখন রাস্তায় পুরাতন যুগের একটি গেট দেখতে পাই। আমি আমার সাথী কামাল শহীদ রহ.কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আফগানিস্তানের প্রসিদ্ধ শহর বলখের গেট এটি। যা বলখ শহরের সীমান্তের শুরুতে বানানো হয়েছে। বলখ শহর এখান থেকে একটু সামনে অবস্থিত। এই শহর অনেক ইতিহাসের সাক্ষী।

কামান্দান দিলাওয়ার জানের মেহমানখানায়

টেক্সি ড্রাইভার আমাদেরকে চারব্রুকের এক বাজারে নামিয়ে দেয়। কামাল শহীদ তার ভাড়া আদায় করার পর আমাকে নিয়ে গলির দিকে যাত্রা করেন। আমরা দু'একটি গলি ঘুরে একটি বড় হাবেলির সামনে এসে দাঁড়াই। কামাল শহীদ গেটে নক করলে অল্পক্ষণের মধ্যে ভিতর থেকে কাজের লোক বের হয়ে আসে। কামাল শহীদ তার সাথে ভালো-মন্দ জিজ্ঞাসাবাদের পর কামান্দান দিলাওয়ার সাহেবের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেন। সে বলল, তিনি ভিতরেই আছেন। কামাল শহীদ বললেন, আমরা তার সাথে সাক্ষাৎ করতে চাই। লোকটি আমাকে এবং কামাল শহীদকে নিয়ে হাবেলির ভিতরে চলে আসে। সেখানে আমাদেরকে একটি মেহমানখানায় বসিয়ে কামান্দান দিলাওয়ার জানকে খবর দিতে চলে যায়।

কামান্দান দিলাওয়ার জান

কামান্দান দিলাওয়ার জান কামাল শহীদের পুরাতন দোস্ত। কামাল শহীদ রহ. শিবারগানে চাকরী করতেন। কামান্দান দিলাওয়ার জানও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় বাস করতো। এই দুই বন্ধুর অনেক সময় এক সাথে কেটেছে। কিন্তু উভয়ের মধ্যে একটি বড় এবং স্পষ্ট পার্থক্য ছিলো। যা উভয়কে পৃথক করে দেয় এবং উভয়ের জীবনের পথ ভিন্ন হয়ে যায়। কামান্দান দিলাওয়ার জান পদ এবং ধন সম্পদের প্রতি দিওয়ানা ছিলো। যার কারণে দিলাওয়ার জানের সম্পর্ক উত্তরাঞ্চলের কমান্ডারদের সাথে ছিলো। তাছাড়া সে টাকা কামাইয়ের জন্য আফিম এবং চুরসের ব্যবসাও করতো। কিন্তু কামাল শহীদ দীনকে অসম্ভব রকম মহব্বত করতেন। তার অন্তর উম্মতে মুসলিমার ক্রান্তিকাল নিয়ে পেরেশান ছিলো। তাই কামাল শহীদ ইসলামের সাচ্চা মুহাফিজ তালেবানের সাথে শামিল হয়ে যান। কিন্তু কামান্দান দিলাওয়ার জান কখনো প্রয়োজনের সময় নিরাশ করেনি। সে কামান্দান (সহযোগী) দিলাওয়ার জানই ছিলো। সে ২০০১ সালে ক্রুসেডার হামলার পর তালেবানের প্রিয় কমান্ডার মোল্লা দাদুল্লাহ শহীদ রহ., মোল্লা আব্দুল মান্নান হানাফী এবং মোল্লা বেরাদারকে নিরাপদ আশ্রয় দেয় এবং তাদেরকে নিরাপদে কান্দাহার পৌছার ব্যবস্থা করে।

মোল্লা বেরাদার যিনি বর্তমানে আফগানিস্তানে আমিরুল মুমিনীনের পক্ষ থেকে যুদ্ধবিষয়ক নেগরানের দায়িত্ব পালন করছেন, তিনি যখন কামাল শহীদকে আব্দুর রশিদ দোস্তামকে টার্গেট বানানোর জন্য দায়িত্ব দেন তখন কামাল শহীদ কামান্দান দিলাওয়ার জানের সাথে যোগাযোগ করেন। সে তালেবান মুজাহিদীনকে আশ্রয় দেয়া এবং এই অভিযানের জন্য পূর্ণ সহযোগিতার নিশ্চয়তা দেয়। এ জন্য সে কমান্ডার উস্তাদ আতার সাথেও কথা বলে। সে বংশীয় দ্বন্দের কারণে আব্দুর রশিদ দোস্তামের বিরোধী ছিলো।

হাজি মুহাম্মাদের ডেরায়

আমি এবং কামাল শহীদ কামান্দান দিলাওয়ার জানের মেহমানখানায় বসে ছিলাম। এরই মধ্যে মধ্যম-আকৃতির মজবুত গড়ন, শ্যামবর্ণের প্রায় ৪০ বছর বয়সী এক লোক মেহমানখানায় প্রবেশ করেন। তিনি খুব মহব্বতের সাথে কামাল শহীদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। কামাল শহীদ তাকে আমার সাথে কামান্দান দিলাওয়ার জান হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেন। কামাল শহীদ তাকে

পূর্ণ অবস্থা সম্পর্কে অবগত করেন বলেন, অভিযানের সকল সরঞ্জাম আমরা নিয়ে এসেছি। অভিযান পরিচালনার জন্যও আমরা প্রস্তুত।

কামান্দান দিলাওয়ার জান আসা-যাওয়ার জন্য তার গাড়ি এবং একটি মোটর সাইকেল দেন। কামান্দান দিলাওয়ার জান ওয়ারলেস সেটের মাধ্যমে যোগাযোগ করার পর কামাল শহীদকে বললেন, কাল উস্তাদ আতা মুহাম্মাদের সাথে আপনাদের সাক্ষাৎ হয়ে যাবে। এরপর কামান্দান দিলাওয়ার জান আমার দিকে মনোযোগী হন এবং কামাল শহীদকে জিজ্ঞেস করেন, ইনি কে? কামাল শহীদ শুধু এতটুকু বলেন, ইনি আমাদের মুজাহিদ সাথী। এই অভিযানে সহযোগিতার জন্য এসেছেন এবং আপনার কাছেই থাকবেন।

কামান্দান দিলাওয়ার জান বললেন, এখানে অনেক লোকজনের যাতায়াত আছে, তাই এখানে থাকা তার জন্য উপযুক্ত নয়। আমি তাকে আমার নির্ভরযোগ্য সাথী হাজি মুহাম্মাদের ডেরায় রেখে আসবো। সেখানে সে নিরাপদ থাকবে। হাজি মুহাম্মাদ তার প্রতি খেয়ালও রাখবে। আসরের পর কামান্দান দিলাওয়ার জানের ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে আসে। কামান্দান দিলাওয়ার জান ড্রাইভিং সিটে বসেন। কামাল শহীদ এবং আমি গাড়িতে উঠে বসি। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা হাজি মুহাম্মদের ডেরায় পৌঁছে যাই। যেটি হাজি মুহাম্মাদ তার কৃষি ফার্মের মাঝখানে বানিয়েছিলেন। কামান্দান দিলাওয়ার জান হাজি মুহাম্মাদের সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলেন, সে আমাদের বিশেষ লোক। তার প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখবে। তার যেনো কোনো কষ্ট না হয়। সে কয়েকদিন তোমার মেহমান হিসেবে থাকবে। তারপর কামান্দান দিলাওয়ার জান এবং কামাল শহীদ রহ. চলে যান।

হাজি মুহাম্মাদ আমাকে একটি কামরা দেখিয়ে দিয়ে বলেন, আপনি এখানে থাকবেন। কোনো কিছুর প্রয়োজন হলে আমাকে বলবেন। আর সকাল-সন্ধ্যা আমার ছেলে আপনার কাছে খাবার, চা-নাশতা পৌঁছে দেবে। এখানকার আশেপাশের জমি আমারই। আপনি ইচ্ছা করলে এদিকে ঘোরাফেরা করতে পারবেন। কেউ বাধা দিবে না।

কামাল শহীদ এবং উস্তাদ আতা

পরদিন আসর নামাজ আদায়ের পর আমি হাজি মুহাম্মাদের কৃষি ফার্মে পায়চারি করছিলাম। তখন কামাল শহীদ মোটর সাইকেলে চড়ে হাজি মুহাম্মদের ডেরায় চলে আসেন। তিনি আমাকে বললেন, আজ কামান্দান দিলাওয়ার জানের

মাধ্যমে উত্তরাঞ্চলীয় জোটের প্রসিদ্ধ কমান্ডার এবং মাজার শরীফের গভর্নর উস্তাদ আতার সাথে দেখা হয়েছে।

উস্তাদ আতা পূর্ণ সহযোগিতা করার নিশ্চয়তা দিয়েছেন। আতা এই ওয়াদা করেছেন যে, সে আমাদেরকে আব্দুর রশিদ দোস্তামের তথ্য সরবরাহ করবে। আমি তৎক্ষণাৎ কামাল শহীদকে প্রশ্ন করলাম, আপনি উস্তাদ আতার উপর কতটুকু বিশ্বাস রাখতে পারেন যে, সে আপনাকে সঠিক সময়ে তথ্য সরবরাহ করবে? কারণ, সে দোস্তামের সাথে সাথে তালেবানেরও দুশমন। কামাল শহীদ এই প্রশ্নের খুবই উপযুক্ত এবং যৌক্তিক জবাব দেন। তিনে বলেন, উস্তাদ আতা তাজুক এবং আব্দুর রশিদ দোস্তাম উজবুক। এজন্য উভয়ের মধ্যে বংশীয় শত্রুতা রয়েছে।

আরো একটি কারণ হলো, উস্তাদ আতার সম্পর্ক আহমদ শাহ মাসউদের সাথে। এখন মাজার শরীফ উস্তাদ আতার কব্জায় আছে। তাছাড়া সে গভর্নরের পদে নিযুক্ত আছে। আর আব্দুর রশিদ দোস্তাম নিজে রক্ত পিপাসু কমান্ডার। সে মাজার শরীফে তার দখলদারিত্বকে নিজের অধিকার মনে করে।

তৃতীয় কারণ হলো, উস্তাদ আতা তালেবানের দুশমন হওয়া সত্ত্বেও এখন কেনো সহযোগিতা করছে– এ প্রশ্নের সুস্পষ্ট জবাব হলো, এখন মাজার শরীফের সীমান্ত পর্যন্ত তালেবানের পক্ষ থেকে উস্তাদ আতার কোনো ভয় নেই। আমরা যেভাবে দোস্তামের বিরুদ্ধে অভিযানের জন্য উস্তাদ আতার সমর্থন আদায় করেছি, ঠিক তেমনিভাবে উস্তাদ আতাও দুশমনের দুশমনকে বন্ধু মনে করে আমাদের সাথে হাত মিলাচ্ছে।

এজন্য আশা করা যায়, উস্তাদ আতা সঠিক তথ্য সরবরাহ করবে। মাগরিবের নামাজের সময় হয়েছিলো তাই আমরা মাগরিবের নামাজ আদায় করি। তারপর ভাই মুহাম্মাদ কামাল শহীদ বলেন, আমি ফিরে যাই। আপনি কাল সকালে কোনো নিরাপদ জায়গা খুঁজে নিবেন, যাতে সরঞ্জাম সেখানে পুঁতে রাখা যায়। পরদিন আমি সকালের নামাজ আদায় করে বসেছিলাম। হাজি মুহাম্মাদের ছেলে নাশতা নিয়ে চলে আসে। আমি নাশতা করি। হাজি মুহাম্মদের ছেলে খালি পাত্র নিয়ে ফিরে গেলে আমি হাজি মুহাম্মাদের কৃষি খামারে পায়চারি করতে থাকি এবং নিরাপদ জায়গা খুঁজতে থাকি। কারণ, সরঞ্জাম হাতে আসলে সেগুলো এদিকেই লুকিয়ে রাখতে হবে।

পাঠকদের জেনে রাখা উচিত যে, এই সরঞ্জাম আমরা মাজার শরীফ আসার পর মোল্লা আব্দুশ শুকুর স্মাগলারদের মাধ্যমে মাজার শরীফ পাঠিয়েছিলেন। সেগুলো আমরা অভিযানে ব্যবহার করবো। তাই আমরা দু'জন স্মাগলারদের

থেকে উল্লেখিত সরঞ্জাম আনার জন্য মাজার শরীফের উপকূলীয় এলাকার দিকে রওয়ানা হই। মাজার শরীফের উপকূলীয় এলাকায় পৌছে কামাল শহীদ স্মাগলারদের বলা ঠিকানা অনুযায়ী ঠিকানার দিকে গাড়ি ঘোরান। অল্প কিছুক্ষণ কাঁচা রাস্তায় চলার পর কামাল শহীদ একটি কেল্লা সাদৃশ হবেলির সামনে গাড়ি থামান। গাড়ির আওয়াজ শুনে এক চাকর বের হয়ে আসে। কামাল শহীদ তাকে সরঞ্জামের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে। সে উল্টা পায়ে হবেলির ভিতরে চলে যায়। কিছুক্ষণ পর সে যখন ফিরে আসে তখন তার সাথে আরো দু'জন লোক ছিলো। তারা সরঞ্জাম বহন করছিলো। কামাল শহীদ গাড়িতে বসেই তাদেরকে সরঞ্জাম গাড়িতে উঠাতে ইশারা করেন। আমি এগিয়ে গিয়ে দ্রুত সরঞ্জামের গণনা শেষ করি। কামাল শহীদ গাড়ি স্টার্ট করে পেছনে ঘুরিয়ে দেন। প্রায় ১১টার দিকে আমরা হাজি মুহাম্মাদের ডেরাতে পৌছে যাই।

মাজার শরীফ টু শিবারগান রোডে রেকি

আমরা সরঞ্জাম হাজি মুহাম্মদের কৃষি খামারের এক জায়গায় পুঁতে রাখি। যোহর নামাজ আদায়ের পর আমরা মাজার শরীফ টু শিবারগান রোড রেকির জন্য বের হয়ে যাই। আমাদের উদ্দেশ্য, আমরা সেই জায়গাটি নির্বাচন করবো যেখানে মাইন বিছানো যাবে।

কামাল শহীদ আমাকে বললেন, তোমাকে জায়গা নির্বাচন করতে হবে। কিন্তু এদিকে খেয়াল রাখতে হবে, জায়গাটি যেনো বলখ শহরের গেট থেকে চারব্রকের মধ্যে হয়। কারণ, এই এলাকা আমাদের আয়ত্বের ভেতর আছে। আমি আমার সাথী কামাল শহীদের সাথে রোড পর্যবেক্ষণ করছিলাম। রোডটি খুবই জাকজমকপূর্ণ এবং মজবুতভাবে পাকা করে নির্মাণ করা হয়েছে। এর কোথাও কেটে মাইন বিছানো কষ্টকর। এতে আক্রমণ ব্যর্থ হওয়ারও আশঙ্কা ছিলো। তাছাড়া এই এলাকাটি মাঠের মধ্যে অবস্থিত থাকায় কোথাও কোনো মোড় ছিলো না এবং কোনো জায়গা সংকীর্ণও ছিলো না। আমরা চারব্রক থেকে যথেষ্ট দূরে বের হয়ে এসেছিলাম। এখনো পর্যন্ত আমরা মাইন বিছানোর জায়গা নির্বাচন করতে পারিনি। হঠাৎ আমার মনে একটি চিন্তা এলো যে, কোনো জায়গায় রাস্তা কেটে মাইন বিছানো হোক। তাই আমি একটি জায়গা নির্বাচন করে ফিরে আসি।

মাইন বিছানো

যখন আমরা রোড পর্যবেক্ষণ শেষে জায়গা নির্বাচন করে ফিরে আসি তখন কামাল শহীদ বললেন, আমাদের দ্রুতই মাইন বিছানো সম্পন্ন করতে হবে। কারণ, উস্তাদ আতার পক্ষ থেকে যে কোনো সময় দোস্তাম আসার সংবাদ আসতে পারে। সেই সাথে কামাল শহীদ আরো বললেন, মাজার শরীফ টু শিবারগান রোড আসরের পর বন্ধ হয়ে যায়। যে গাড়ি যেখানে থাকবে সেখানেই থেমে যাবে। কারণ, এরপর রোডের উপর ডাকাতদের রাজত্ব চলে। যারা উত্তরাঞ্চলীয় জোটের কমান্ডারদের পেটপূর্তির জন্য নিরপরাধ লোকদেরকে লুট করে এবং সামান্যতম বাধা দিলেই হত্যা করতেও পিছপা হয় না।

আমি বললাম তাহলে ঠিক আছে। আমরা রাত ১২টার পর মাইন বিছাতে যাবো। কারণ, সেসময় ডাকাতরাও কোনো যাত্রী আসার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে যায়। তাই আমরা কোনো প্রকার ঝুঁকি ছাড়াই মাইন বিছাতে পারবো।

আমি আসর নামাজের পরই মাইনের সাথে ইলেক্ট্রিক সিস্টেম এবং রিমোট কন্ট্রোল সংযুক্ত করে নেই। আমরা রাতে মাইন বিছাতে রওয়ানা হই। নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে গাড়ি থামিয়ে বনেট খুলে দেই। যাতে মানুষ বুঝতে পারে, গাড়ি নষ্ট হয়ে গেছে আর আমরা তা ঠিক করছি। আমি গাড়ির নিচে রাস্তার পিচ দেয়া অংশ ইলেক্ট্রিক কাটার দিয়ে কাটি এবং তা উঠিয়ে একপাশে রেখে দেই। তারপর কাঙ্ক্ষিত স্থান সহজে মাইন ফিট করার মতো করে খনন করি। খোদাই করার পর কামাল শহীদ গাড়ি থেকে মাইন বের করেন এবং আমি ইলেক্ট্রিক সিস্টেমসহ নিরাপদ পদ্ধতিতে তা গর্তে রাখি। তারপর অল্প মাটি ঢেলে পূর্বে কেটে রাখা রাস্তার পিচ দেয়া অংশটুকু তার উপর রেখে দেই। অতঃপর গ্যাস সিলিন্ডার দিয়ে গরম করে সেই অংশটুকু রাস্তার সমান করে দেই। যারফলে খোদাই করার আলামত মিশে যায়।

আমরা সেখানে মাইন ফিট করে মাজার শরীফ থেকে শিবারগান যাওয়ার পার্শ্বেও একটি মাইন ফিট করি। এরপর রাত প্রায় দেড়টায় আমরা হাজি মুহাম্মাদের ডেরায় ফিরে আসি।

উস্তাদ আতার ধোঁকা

মাইন বিছিয়েছি আজ পনের দিন হলো। উস্তাদ আতার পক্ষ থেকে আমরা দোস্তামের যাতায়াতের কোনো সংবাদ পাইনি। যারফলে আমি পেরেশান ছিলাম। আমি আমার পেরেশানির কথা আমার সাথী কামাল শহীদের সাথেও প্রকাশ করি। কিন্তু কামাল শহীদ আরো অপেক্ষা করতে বলেন। আমরা নিজেরা

রাস্তার খোঁজ-খবর নিতে পারছিলাম না। তা ছাড়া আমাদের সাথে দোস্তামের কনভয়ের হঠাৎ দেখা হয়ে গেলেও আমরা আক্রমণ করতে পারতাম না। কেননা কোন্ গাড়িতে দোস্তাম আছে তার কোনো সংবাদ আমাদের কাছে নেই। যদি আমরা আক্রমণ করেও বসি তাহলে সেই জরুরি অবস্থায় নিরাপদ জায়গায় চলে যাওয়া আমাদের জন্য কেবল মুশকিলই নয় বরং অসম্ভব ছিলো। ২০ দিন অপেক্ষা করার মধ্যে আমি বিছানো মাইনের ব্যাটারি সেল তিনবার পরিবর্তন করেছি। যাতে যে কোনো সময় আক্রমণ করলে তা ব্যর্থ না হয়।

মাইন ফিট করার পর ২১তম দিনের সূর্যোদয় হলে কামাল শহীদ বিশেষ কাজে মাজার শরীফ যান। সেখানে গিয়ে তিনি দেখলেন, দোস্তাম তো তার দেহরক্ষীসহ নিরাপদে মাজার শরীফে এসেছে। যখন দোস্তাম হোটেল থেকে বাইরে আসে তখন দোস্তামের সাথে কামাল শহীদের সামনা-সামনিও হয়। কামাল শহীদ ফিরে এসে সকল অবস্থা কামান্দান দিলাওয়ার জানকে জানালেন। পরদিন কামান্দান দিলাওয়ার জান উস্তাদ আতার সাথে এ ব্যাপারে সাক্ষাৎ করলে সে বিভিন্ন বাহানা পেশ করতে থাকে। সে বলে, এখনো উপযুক্ত সময় আসেনি, যার কারণে দোস্তামের উপর এখনই আক্রমণ করা যাবে না।

পরবর্তীতে জানা গেলো, উস্তাদ আতা নিজের স্বার্থ হাসিলের জন্যই আমাদের সাথে ধোঁকাবাজি করেছে, যে স্বার্থ সে দোস্তামের মাধ্যমে কারজাই থেকে হাসিল করতে চাচ্ছিলো।

কামাল শহীদের উপদেশ

উস্তাদ আতা ধোঁকা দেয়ার পর, ইখলাসের মূর্তপ্রতীক কামাল শহীদ বলতে লাগলেন, আমি জীবনে প্রথমবার উত্তরাঞ্চলীয় জোটের এক কমান্ডারের উপর ভরসা করে ছিলাম; কিন্তু আজ সেও আমাকে ধোঁকা দিলো। তিনি আরো বলেন– 'আজ আমি সকল মুজাহিদীনকে বলছি, তারা যেসব আক্রমণের জন্য প্রচুর মেহনত করেন, সেসব ক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহ করা থেকে পূর্ণ অভিযান যেনো নিজেরাই কন্ট্রোল করে, কারো উপর যেনো কোনো ধরনের ভরসা না করে। ইনশা আল্লাহ, তাতে তারা ১০০% কামিয়াব হবে।'

শহীদি হামলার সিদ্ধান্ত

এতো বড় ধোঁকা দেয়ার পরও আমাদের দৃঢ়তায় কোনো পরিবর্তন আসেনি। আমরা দুশমনের এলাকাতে দুশমনের উপর পূর্ণ সফল আক্রমণ পরিচালনার জন্য পুনরায় পরিকল্পনা করি। আফগানিস্তানে আমিরুল মুমিনীনের পক্ষ থেকে

যুদ্ধবিষয়ক নেগরান মোল্লা বেরাদারের সাথে পরামর্শ করে দোস্তামের উপর শহিদী হামলার সিদ্ধান্ত নেই। আমরা আমাদের গোপন ও নিরাপদ জায়গাও পরিবর্তন করি। তারপর দোস্তাম সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে থাকি। কিছু দিনের মধ্যেই এই তথ্য অর্জনে সফল হই যে, দোস্তাম মাজার শরীফে অনুষ্ঠিত নওরোজের জলসায় অবশ্যই শরীক হবে। আমরা নওরোজের জশনে-জুলুসে দোস্তামের উপর হামলা করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি।

ফেদায়ীর আগমন

তৃতীয় দিন মোল্লা বেরাদার সংবাদ পাঠালেন, শহীদি (আত্মঘাতি) হামলার জন্য আমি এক মুজাহিদকে পাঠিয়েছি। তিনি তার পরিচয়ের জন্য বিশেষ নিদর্শনও বলে দেন। তিনি বলেন, আপনারা তাকে মাজার শরীফ বাস স্ট্যান্ড থেকে গ্রহণ করবেন। পরদিন সকাল ৭টায় কামাল শহীদ মাজার শরীফ বাস স্ট্যান্ড পৌঁছেন এবং কাবুল থেকে আগত ৩০৩ মার্সিডিজ বাসের অপেক্ষা করতে থাকেন। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে বাস এসে যায়। সেই বাস থেকে মোল্লা বেরাদারের বলা নিদর্শন বিশিষ্ট মুজাহিদ নেমে আসেন। কামাল শহীদ তাকে নিয়ে ফিরে আসেন।

জশনে নওরোজ এবং দোস্তামের অপেক্ষা

জশনে নওরোজ (বর্ষবরণের অনুষ্ঠান বিশেষ) ছিল অগ্নিপূজকদের সংস্কৃতি, যা আজও ইরান এবং আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চলগুলোতে খুব ধুমধাম করে পালিত হয়। জশনে নওরোজ বসন্তকালের আগমন উপলক্ষে আয়োজিত হয়। এই জশনে নওরোজেরই একটি জলসা 'জানবুশ মিলি ইসলামী' মাজার শরীফ শহরে আয়োজন করে। যার মধ্যমণি এবং সভাপতির দায়িত্ব পালন করার কথা আব্দুর রশিদ দোস্তামের। কামাল শহীদ খুব বুদ্ধিমত্তা এবং দক্ষতার সাথে জানবুশ মিলি ইসলামীর এক দায়িত্বশীলের সাথে ফেদায়ী মুজাহিদ উসমানকে সেখানে পৌঁছে দেন, যেখানে দোস্তামের বসার কথা।

২০০৬ সালে অনুষ্ঠিত এই জলসায় উসমান শহীদি হামলা করার জন্য সারা দিন স্টেজে বসে দোস্তামের অপেক্ষা করতে থাকেন। কিন্তু ইতোপূর্বে ২০০৫ সালের ঈদুল আজহার সময় তার উপর ফেদায়ী (আত্মঘাতি) হামলা হওয়ার কারণে দোস্তাম সতর্ক ছিলো। তাই সে আসরের সময় সংবাদ পাঠিয়ে বলে, আমি গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে এই জলসায় শরীক হতে পারছি না। সুতরাং অনুষ্ঠানে দোস্তামের লিখিত বক্তব্য পাঠ করে শুনিয়ে দেয়া হয়।

এই ঘোষণার পর উসমান খুব সাবধানে বিস্ফোরকের জ্যাকেট পরিহিত অবস্থায় নিচে নেমে আসে। তার চেহারা তখন ঈমানের নূরে চমকাচ্ছিলো। আমি এবং কামাল শহীদ এগিয়ে এসে উসমানকে স্বাগত জানাই। আমরা গাড়িতে উঠে ফিরে আসি। তাকদীর আমাদের প্রচেষ্টার উপর বিজয়ী হয়ে যায় এবং দোস্তাম আরেকবার বেঁচে যায়। কুদরত তার রশিকে লম্বা করে দেয়।

উসমান শহীদ রহ.

মধ্যম গড়নের গৌর বর্ণের হাসি-খুশি চেহারা বিশিষ্ট নওজোয়ান এই উসমান শহীদ রহ.। তিনি সর্বদা শাহাদাতের পেয়ালা খুঁজে বেড়াতেন। মুজাহিদীনের মধ্যে উসমান এবং আবু হুরায়রা নামে পরিচিত ছিলেন। উসমান শহীদের আসল নাম নাসরুল্লাহ। তিনি পাঞ্জাবের হাফিজাবাদের বাসিন্দা। উসমান শহীদ প্রাথমিক শিক্ষা হাফিজাবাদ থেকেই গ্রহণ করেন। তারপর নিজ ব্যবসা-বাণিজ্যে মশগুল হয়ে যান। কিন্তু দ্রুতই আল্লাহ তায়ালা উসমান শহীদকে তাঁর প্রতিষ্ঠিত দীনের নেতৃত্বের জন্য নির্বাচন করে নেন। উসমান শহীদ তার কাশ্মীরি মা বোনের হেফাজতের জন্য কাশ্মীরে চলে যান। এখানে তিনি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ইন্ডিয়ান আর্মিদেরকে নাকানী-চুবানি খাওয়াতে থাকেন। তারপর কাশ্মীর থেকে ফিরে এসেও আরামে ঘরে বসে থাকেননি, বরং মুজাহিদীনের খেদমতে নিযুক্ত হয়ে যান।

৯/১১ এর পর যখন জিহাদ 'সন্ত্রাস' আর মুজাহিদীন 'সন্ত্রাসী' আখ্যা পেলো এবং আমেরিকার নেতৃত্বে বিশ্ব কাফের সম্প্রদায় ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে হামলা করে বসলো, তখন উসমান শহীদ আরো একবার যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে হাজির হন। তালেবানের সাথে মিলে 'বিশ্ব কুফুরি ঐক্যে'র উপর অগ্রগামী হয়ে হামলা করতে থাকেন। উদ্দেশ্য হলো, উম্মতে মুসলিমা যেনো তাদের হারানো ঐতিহ্য পুনরায় ফিরে পায়। এ সময় উসমানকে সর্বদা জিহাদে ব্যস্ত থাকতে দেখা যায়। আর শেষ পর্যন্ত এই জিহাদেই নিজের জীবনকে কুরবান করে দেন।

হেলমন্দ প্রদেশের গরমসির জেলার যুদ্ধক্ষেত্র হাজার জুফতের সাধারণ আমির ছিলেন মোল্লা মুহাম্মাদ নাঈম, আর পাকিস্তানি মোর্চার আমির ছিলেন উসমান শহীদ। হাজার জুফত হেলমন্দ নদীর তীরে অবস্থিত। যারফলে যুদ্ধগ্রস্ত এলাকাগুলো খোলা ময়দান ছিলো। ময়দানী এলাকায় যুদ্ধ খুব কঠিন হয়। আর যখন সামনে ভারি তোপখানা, আকাশে হেলিকপ্টারের গর্জন এবং প্রয়োজনে বি-৫২ বিমানও পৌঁছে যায়, তখন অবস্থা আরো কঠিন হয়ে ওঠে। কিন্তু তারপরও

মুজাহিদীন শক্ত হাতে মোকাবিলা করে অসংখ্য আমেরিকানকে জাহান্নামে পৌঁছে দেন। অসংখ্য আমেরিকান জখমি অবস্থায় উপদেশের বস্তু হিসেবে নিজ দেশে ফিরে যায়। কিন্তু অনেক আরবী, আফগানি এবং পাকিস্তানি মুজাহিদ শাহাদাতের পেয়ালা পান করেন। যাদের মধ্যে উসমান শহীদের নাম উল্লেখযোগ্য। উসমান শহীদ দীর্ঘদিন যুদ্ধক্ষেত্রে থাকেন। তারপর মুজাহিদীনের কিছু প্রয়োজন মিটানোর জন্য পাকিস্তান চলে যান।

২০০৭ সালে পুনরায় যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে আসেন। সেই দিনগুলোতে দুশমন প্রতিদিন বোম্বিং করতো। উসমান শহীদ যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে এসেছেন কেবল ৫/৬ দিন হলো। এক রাতে আমেরিকান বিমান খুব বোম্বিং শুরু করে। সকালে যখন নীরব হয় তখন উসমান শহীদ দুপুরের খাবার খেতে এবং সাথীদের সাথে পরামর্শ করার জন্য বিশ্রামাগারে যান। এরই মধ্যে আকাশে বিমান চক্কর দিতে থাকে। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে পুনরায় বিমানগুলো বোম্বিং শুরু করে দেয়। বিমানগুলো খুব ভারি বোম ফেলতে থাকে। যার একটি উসমান শহীদের বিশ্রামাগারে পড়ে। বোমার আঘাতে বিশ্রামাগার পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায় এবং একটি ময়দানের আকৃতি ধারণ করে। এ সময় চারজন সাথী মাটির সাথে মিশে যান, যাদের মধ্যে উসমান শহীদও ছিলেন। তাদের লাশ পাওয়া যায়নি এবং জানাজাও হয়নি। তারিখটি ছিল ২০০৭ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর।

چن چن کے میرے ٹکڑے پوری لاش کرے نا
کوئی تلاش کرنا چاہے تو تلاش کرے نا
টুকরোগুলো খুঁজে খুঁজে কেউ
আমার লাশ পূর্ণ করতে পারবে না,
কেউ তালাশ করতে চাইলেও
তালাশ করতে পারবে না।

উসমান শহীদ যেনো এমন বলতে বলতেই আপন রবের সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেন এবং নিজের রক্তে অজু করে আপন রবের দরবারে হাজির হয়ে যান।

میں کٹوں کچھ اس طرح سے کہ ہر عضو میرا بکھر جائے
نہ کفن کوئی مجھے دے نہ جنازہ کوئی پڑھائے
আমি এমনভাবে টুকরো হবো যে
আমার প্রতিটা অঙ্গ বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে,
না কেউ আমায় কাফন পরাবে
না কেউ আমায় জানাজা দেবে।

কান্দাহার প্রত্যাবর্তন

জশনে নওরোজের জলসায় যখন দোস্তাম এলো না, তখন কামাল শহীদ মোল্লা বেরাদারের সাথে পুনরায় যোগাযোগ করেন। তিনি বলেন, আপনারা সবাই ফিরে আসুন। সুতরাং আমরা আমাদের যুদ্ধের সরঞ্জাম এক জায়গায় নিরাপদ পদ্ধতিতে দাফন করি এবং তার একটি নকশা তৈরি করি। পরদিন মাজার শরীফ থেকে কাবুল এবং কাবুল থেকে কান্দাহার, একটানা ১৬ ঘণ্টার সফর শেষে আমি, উসমান এবং কামাল কান্দাহার পৌঁছি।

শহীদানের আলোচনা

আমি এখন সেসব শহীদানের আলোচনা করবো, যাদের সাথে আফগান জিহাদে আমার সময় কেটেছে। তাঁরা আফগানিস্তানের পিপাসার্ত মরুভূমি, পাথুরে ও বালুময় প্রান্তর এবং আকাশচুম্বি পহাড়গুলোতে ইসলামের প্রতিরক্ষার জন্য যুদ্ধ করে আফগানিস্তানের জমিনেই দাফন হয়েছেন। আফগানিস্তানের মাটি সেসব শহীদানের চেহারার প্রসাধনী হয়েছে।

وہ لوگ جنہوں نے خون دے کر پھولوں کو رنگت بخشی ہے

دو چار سے دنیا واقف ہے گمنام نجانے کتنے ہیں

বুকের রক্ত ঢেলে যারা ফুলের গায়ে রং দিলো
দু'চার জনরে বিশ্ব চেনে, কতোই তো অজানা রয়ে গেলো!

মোল্লা আব্দুশ শুকুর শহীদ রহ.

মোল্লা আব্দুশ শুকুর শহীদ রহ. ছিলেন মোল্লা আব্দুল হাকিম শহীদ রহ. এর গর্বিত শিষ্য। তিনি ছিলেন আমলদার আলেম, দীর্ঘদেহী এবং উন্নত চরিত্রের অধিকারী দয়ালু কমান্ডার। ১৯৯৮ সালে তুখারের যুদ্ধক্ষেত্রে তার সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। তখন তিনি তালেবানের গর্বিত কমান্ডার মোল্লা বেরাদারের নায়েব ছিলেন। আমি তার কমান্ডিংয়ে উত্তরাঞ্চলীয় জোটের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছিলাম। তার সাথে আমার ভালো এবং বিশেষ বন্ধুত্ব হয়ে যায়। এই বন্ধুত্ব তার শহীদ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বহাল ছিল।

ক্রুসেডাররা যখন ইমারতে ইসলামিয়ার উপর হামলা করে তখন আমেরিকার ফৌজ কুন্দুজে ঘেরাওয়ে থাকা মোল্লা আব্দুশ শুকুরকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়। মোল্লা আব্দুশ শুকুর প্রথমে শিবারগানের জিন্দানখানায় বন্দী থাকেন।

তারপর তাকে জমানার কলংক গোয়ান্তানামু বে কারগারে প্রেরণ করা হয়। মোল্লা আব্দুশ শুকুর গোয়ান্তানামু বে থেকে ২০০৩ সালে মুক্তি পান। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রের কঠিন পরিস্থিতি থেকে নিয়ে বন্দী জীবনের ভয়ানক শাস্তি পর্যন্ত কোনো জিনিস মোল্লা আব্দুশ শুকুরকে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ থেকে রুখতে পারেনি। ফিরে এসে তিনি পুনরায় জিহাদ শুরু করেন। বড় থেকে বড় আকারে সম্মিলিত ক্রুসেডার বাহিনীর উপর হামলাকারীদের নেতৃত্ব দিতে থাকেন। তিনি অধিকাংশ সময় বলতেন– 'জিহাদ কঠিন, কিন্তু কোনো অবস্থাতেই ছাড়া যাবে না, কেননা এটি আল্লাহর হুকুম।'

তার পৈতৃক নিবাস ছিল কান্দাহার প্রদেশের খাকরিজ জেলার চুনার বসতিতে। সেখানকার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে তাকে গণ্য করা হতো। আমি ২০০৪ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত মোল্লা আব্দুশ শুকুরের সাথে মিলে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে কয়েকটি যুদ্ধে লড়াই করি। সেগুলোর কয়েকটির আলোচনা এই পুস্তকের শুরুতে করা হয়েছে। তবে ২০০৮ সালে কান্দাহার শহরের সবচেয়ে বড় জেল ভেঙ্গে তালেবান বন্দীদের মুক্তিদাতাদের মধ্যে মোল্লা আব্দুশ শুকুরের বড় ভূমিকা ছিলো। জেল ভাঙ্গার পর তালেবান মুজাহিদীনরা উরগান্দাব শহরের নিয়ন্ত্রণ হাতে নেয়। সেখানে আমেরিকার সৈন্যদের বিরুদ্ধে কয়েকটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। আমেরিকানদের মুখের খাবার কেড়ে নেয়ায় তারা শহরে বিমান হামলা শুরু করে। সেই বোম্বিংয়ে মোল্লা আব্দুশ শুকুর শহীদ হয়ে আপন রবের দরবারে হাজির হয়ে যান। শাহাদাতের সময় তার বয়স ছিল ৪০ বছরের কাছাকাছি।

খালেদ শহীদ রহ.

দুর্বল শরীর, এক হাত পঙ্গু, যুদ্ধের ময়দানে ওয়ারলেস সেটে যোগাযোগের দায়িত্বে নিযুক্ত শ্যাম বর্ণের নওজোয়ান। মুজাহিদীনের মধ্যে খালেদ কে-টু নামে পরিচিত ছিলেন। তার আসল নাম আব্দুল আজিজ। পিতৃ নিবাস ভাওয়ালপুরের জামালপুর গ্রামে। সেখানে খালেদ শহীদ এক গরীব পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

লেখা পড়া করার খুব শখ ছিলো খালেদ শহীদের। কিন্তু বাস্তবতা তাকে সামনে আগাতে দেয়নি। বাধ্য হয়ে তিনি ট্রাক্টরের ওয়ার্কশপে কাজ নেন। কিন্তু কুদরত তো এই বিরল মোতিকে দীনে মাতিনের বিজয়ের জন্য নির্বাচন করে রেখেছিলেন। তাই আল্লাহ তায়ালা খালেদ শহীদকে জিহাদ ফি সাবিলিল্লার সাথে জড়িত করে নেন। এভাবেই তিনি কিছুদিন পর কাশ্মিরের জুলুমের বদলা নিতে এবং কাশ্মিরের মায়েদের হেফাজতের জন্য কাশ্মিরে চলে যান। সেখানে দুই বছর যাবত হিন্দু বেনিয়াদেরকে পুতুলনাচ নাচিয়ে গজওয়ায়ে হিন্দের

সত্যায়ন হয়ে গাজি হিসেবে পাকিস্তান ফিরে আসেন। তারপর আফগানিস্তানের জিহাদে তালেবানের সাথী হয়ে জিহাদ করতে থাকেন। ১৯৯৮ সালে একটি তোপ চালাতে গিয়ে কেল্লায়ে মুরাদ বেগে জখমি হন। এতে খালেদ শহীদের একটি হাত শহীদ হয়ে যায়।

২০০০ সালে কাশ্মিরী মুজাহিদীনের সাথে পাকিস্তানি মুজাহিদীনের যোগাযোগ কঠিন হওয়ার নালিশ আসায় খালেদ শহীদ উঁচু জায়গায় খুব উঁচু এক পাহাড়ে যোগাযোগ ইউনিট বানিয়ে অভ্যন্তরীণ সাথীদের মধ্যে যোগাযোগকে সহজ করে দেন। খালেদ শহীদ এই যোগাযোগ ইউনিটের নাম দেন 'কে-টু'। পরবর্তীতে এই কে-টু তার পরিচয় বহন করে এবং তিনি খালেদ শহীদ কে-টু নামে প্রসিদ্ধ হয়ে যান। যখন ইমারাতে ইসলামিয়ার উপর ক্রুসেডাররা খুনের রাত চাপিয়ে দেয় তখন তিনি তালেবানের সাথে মিলে আমেরিকান সৈন্যের বিরুদ্ধে হরদম আক্রমণ পরিচালনা করতে থাকেন। ইলেক্ট্রনিক্সের ময়দানে তিনি কয়েকটি নতুন আবিষ্কারের মাধ্যমে এই যুদ্ধকে মুজাহিদীনের জন্য সহজ করে দেন। যারফলে আমেরিকান সৈন্যরা খুব ভয় পেয়ে যায় এবং আফগানিস্তানে তাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার দেখতে থাকে। এসব খেদমতের জন্য তালেবানের কেন্দ্রীয় নেতারাও খালেদ শহীদ রহ.কে 'তাহসিন' সনদ প্রদান করে।

খালেদ শহীদ রহ. এর শাহাদাতের এক বছর আগে তার আটজন কাছের বন্ধু গ্রেফতার হয়ে যান। খালেদ শহীদ একা হয়ে যান। কিন্তু তারপরও তিনি জিহাদের সাথে জড়িয়ে থাকেন এবং আফগানিস্তানের হেলমন্দ প্রদেশের সীমান্ত শহর বারামচাতে বীরত্ব প্রদর্শন করতে থাকেন। সে সময় খালেদ শহীদ রহ. এর নেতৃত্বে আরব, পশতুন, পাকিস্তানি এবং ইরানি মুজাহিদীন জিহাদ করছিলো। বারামচাতেও মুজাহিদীন এবং জনসাধারণের মধ্যে যোগাযোগের ক্ষেত্রে সমস্য দেখা দেয়। খালেদ শহীদ রহ. ওয়ারলেসের নেটওয়ার্কিংকে খুব ভালোভাবে জানতেন। তিনি বারামচা শহর থেকে খানেশিনের ছোট ছোট বসতি পর্যন্ত ওয়ারলেসের উত্তম সিস্টেম চালু করেন। যারফলে তালেবান এবং স্থানীয় জনসাধারণ খুব খুশি হন।

তালেবানরা পরস্পরের সাথে যোগাযোগের জন্য অধিকাংশ সময় স্যাটেলাইট ফোন ব্যবহার করতো, যা খুবই বিপজ্জনক এবং ব্যায়বহুল ছিলো। এখন পুরো বারামচাতে ওয়ারলেস সেট ব্যবহার করা হয়। খালেদ শহীদের শাহাদাতের ঘটনা সেই যুদ্ধে শরীক এক মুজাহিদ আমাকে বলেছেন। ২০০৮ সালের ৪ জুন খালেদ শহিদ বিদেশি মুজাহিদ শহীদ ইলিয়াসের সেনা ছাউনিতে ছিলেন। ৫ জুন সকাল বেলা বারামচার 'আল্লাহু আকবার পাহাড়'-এর উপর আমেরিকান

হেলিকপ্টার অবতরণ করতে থাকে। তখন সেখানকার তালেবানের আমির হেলিকপ্টারকে মিসাইল ফায়ারিংয়ের নিশানা বনাতে হুকুম দেন।

খালেদ শহীদের নিকট তখন ৪টি মিসাইল ছিলো। তিনি দু'টি মিসাইল তার সাথী মুহাম্মাদ এবং তয়্যিবকে দেন। বাকি দু'টি নিজের হাতে নিয়ে ভাই বেলালের সাথে ময়দানের দিকে চলে যান। ময়দানে পৌছে খালেদ শহীদ পজিশন গ্রহণ করেন। ততক্ষণে মুহাম্মাদ এবং তয়্যিবও পজিশন নিয়ে নেয়। প্রথমে মুহাম্মাদ এবং তয়্যিব মিসাইল চালায়। যা 'আল্লাহু আকবার পাহাড়' এর উপর দিয়ে চলে যায়। মিসাইল ছুড়তেই হেলিকপ্টার নড়েচড়ে ওঠে। মুহাম্মাদ এবং তয়্যিব এক জায়গায় লুকিয়ে যায়। এরই মধ্যে খালেদ শহীদ এবং ভাই বেলাল মিসাইল ফায়ার করে দেন।

হেলিকপ্টার তাদের দিকে মুখ করলে তারা ছাউনির দিকে ছুটে যান। গানশিপ হেলিকপ্টার ততক্ষণে তাদের উপর ফায়ারিং শুরু করে। কিন্তু তারা নিরাপদেই সেনা ছাউনিতে পৌছে যান। হেলিকপ্টার দীর্ঘ সময় ফায়ারিং করার পর ফিরে যায়। তারপর জেড বিমান এসে বোম্বিং করে সেনা ছাউনিকে পরিপূর্ণ মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়। যারফলে ইলিয়াস এবং বেলাল জায়গাতেই শহীদ হয়ে যান। খালেদ শহীদ ভাই মারাত্মক জখমি হন এবং তার একটি পা কেটে যায়। এরই মধ্যে ১৫০ জনের মতো সৈন্য আল্লাহু আকবার পাহাড় থেকে নেমে বারামচা বাজার পর্যন্ত পৌছে যায়। সেখানে তালেবান এবং আমেরিকানদের মধ্যে যুদ্ধ চলছিলো। সেনা ছাউনিতে খালেদ শহীদ একা ৪ ঘন্টা পড়ে থাকেন। একটানা যুদ্ধ এবং বোম্বিংয়ের কারণে তার কাছে কেউ আসতে পারেনি। সাড়ে এগারোটার দিকে যখন সাথীরা তার কাছে পৌছেন তখন তিনি শেষ নিঃশ্বাস নিচ্ছিলেন। তিনি কালেমায়ে শাহাদাত পড়েন এবং আপন হাকিকি খালেকের দরবারে হাজির হয়ে যান।

খুরশেদ শহীদ রহ.

হাসি-খুশি থাকা এবং সবাইকে হাসানো ছিল খুরশেদ শহীদের স্বভাব। গৌর বর্ণ ও মাঝারি গড়ন। এই নওজোয়ান খুব সুন্দর কণ্ঠের অধিকারী ছিলেন। তিনি বাবা খুরশেদ নামে পরিচিত ছিলেন। হাসেল পুরের এক গরীব পরিবারে তার জন্ম। তিনি যখন বুঝমান হন তখন ভাইদেরকে ফলের আড়তে কাজ করতে দেখেন। তিনি কয়েক ক্লাস পড়াশোনা করেন, তারপর পরিস্থিতির শিকার হয়ে ভাইদের মতো ফলের আড়তে কাজ করতে বাধ্য হন। কিন্তু কে জানতো ফলের

গুদামে কাজ করা এই খুরশেদই একদিন শহীদানের কাতারে শামিল হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করবেন।

সকল মুজাহিদীন খুরশেদ শহীদের উপর সন্তুষ্ট ছিলেন। তিনিও মুজাহিদীনের খেদমতকে সৌভাগ্য মনে করতেন। তিনি তাহরিকে তালেবান আফগানিস্তানে শরীক হয়ে যান এবং আমিরুল মুমিনীনের নেতৃত্বে জিহাদ করতে থাকেন। তিনি তার জীবনের সর্বোত্তম সময়গুলো ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে কাটিয়েছেন। তিনি সবসময় তার পুরাতন বন্ধু খালেদ শহীদ রহ. এর হাত হিসেবে থেকেছেন। জিহাদের সেইসব উত্থান-পতনের দিনগুলো হাসি-খুশিতে কাটিয়েছেন। বারামচা যুদ্ধে খালেদ শহীদের দুইদিন আগে তিনি শহীদ হয়ে যান। ২০০৮ সালের ২ জুন রাতে হঠাৎ আমেরিকান ছত্রীসেনা নিচে নেমে আসে। যাদেরকে আকাশের হেলিকপ্টার ফায়ারিংয়ের মাধ্যমে শেল্টার দিচ্ছিলো। আমরা আমাদের অবস্থানে বিশ্রামে ছিলাম। খুরশেদ শহীদ অবস্থার জটিলতা বুঝতে পেরে গান হাতে নেন এবং বুট পরে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যান। ততক্ষণে তালেবানের আমিরের পক্ষ থেকে পয়গাম আসে, আমরা যেসব মিসাইল স্থাপন করেছিলাম সেগুলো ফায়ারিং করছে না। তাই তোমরা ফায়ারিং শুরু করো, যাতে বেশি সৈন্য নিচে নামতে না পারে। খুরশেদ শহীদ খালেদ শহীদকে বললেন, আপনি এখানেই অবস্থান করুন, আমি পাহাড়ের উপর গিয়ে মিসাইল ফায়ারিং করছি। খালেদ তখন বললেন, আপনি আব্দুল্লাহ ইরানিকে সাথে নিয়ে যান।

খালেদ শহীদ এবং আব্দুল্লাহ ইরানি মিজাইল ফায়ারিং করার জন্য রওয়ানা হয়ে যান। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে মিসাইল স্থাপন করে ফায়ারিংয়ের পজিশন নিয়ে নেন। এরই মধ্যে পুনরায় তাদের নিকট মিসাইল ফায়ারিংয়ের হুকুম এসে পৌঁছে। খুরশেদ শহীদ ২টি মিসাইলই ফায়ার করে দেন। যখন মিসাইল ফায়ার হয় তখন আকাশে জেড বিমান গর্জন করছিলো। যেখান থেকে মিসাইল ফায়ারিং হয়েছিলো জেড বিমান সেখানে তুমুল বোম্বিং করে। যারফলে খুরশেদ এবং আব্দুল্লাহ ইরানি শহীদ হয়ে যান।

গর্বিত কমান্ডার ভাই সুলতান শহীদ রহ.

দুর্বল দেহ কিন্তু দৃঢ় সংকল্পের মালিক ছিলেন ভাই সুলতান শহীদ রহ.। বয়স মাত্র ২৫ মাত্র পঁচিশ বছর কিন্তু অভিজ্ঞতা ছিল যেন ২০ বছরের। দেখতে সাধারণ গ্রাম্য লোকের মতো, কিন্তু বাস্তবতায় ছিলেন অকুতোভয়ী, বিজয়ী সাহসী এক সিপাহসালার। এই হলো আমাদের অনুগ্রহশীল গর্বিত কমান্ডার

সুলতান শহীদ। ডেরা ইসমাইল খানের এক উপকূলীয় গ্রামে তার জন্ম। মাতৃভাষা পশতু কিন্তু উর্দু-ফারসি ভাষায়ও কথা বলতেন।

সুলতান শহীদ রহ. এর সাথে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয় ১৯৯৬ সালে দাররাহসালাঙ্গে। শেষ দেখা হয় ২০০১ সালে কুন্দুজে। বয়সে যদিও ছোট ছিলো কিন্তু ধারাবাহিক অভিজ্ঞতা এবং ঈমানের নূর তাকে বড়দের মনমানসিকতা দিয়েছিলো। এই কঠিন পরিস্থিতিতে তিনি যেমনিভাবে পাকিস্তানি মুজাহিদীনের সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছেন, ঠিক তেমনিভাবে রণাঙ্গনের কঠিন পরিস্থিতি সামাল দিতে একজন অভিজ্ঞ কমান্ডারে প্রমাণ দিয়েছেন। পরিচালনার কাজের সাথে সাথে তার মধ্যে সাহসিকতা এবং বাহাদুরি টুইটম্বুর ছিলো। যুদ্ধক্ষেত্রে কাঁধের উপর রকেটলাঞ্চার তুলে সকল সাথীর আগে আগে চলতেন। যেন শাহাদাত লাইলী এবং সুলতান শহীদ মজনু হয়ে তার পিছনে পিছনে ছুটছেন।

তার বাহাদুরি দেখে মুজাহিদীনের হিম্মত বেড়ে যেতো। তিনি ভয়হীনভাবে লড়ে যেতেন। সুলতান শহীদ কয়েকবার বীরত্ব প্রদর্শন করতে গিয়ে জখমি হন কিন্তু জখম তার স্পৃহা এবং দৃঢ়তার মধ্যে কোনো কমতি আনতে পারেনি। প্রত্যেকবারই চিকিৎসার পর যুদ্ধের ময়দানে ফিরে যেতেন। যুদ্ধের ময়দানও তার অংশগ্রহণকে পছন্দ করতো। কারণ তিনি যুদ্ধের ময়দান সর্বদা গরম রাখতেন। কুন্দুজে সুলতান শহীদের সাথে ওয়ারলেস অপারেটর হিসেবে আমার দায়িত্ব ছিলো। সুলতান শহীদের সাথে আমার চুক্তি ছিলো, যখনই সংঘর্ষ হবে তখন তিনি আমাকে নিয়ে যাবেন। তাই কয়েকটি যুদ্ধক্ষেত্রে তার সঙ্গী হয়ে আমার লড়াই করার সুযোগ হয়।

যখন জবরদখলকারী জালেম আমেরিকা একের পর এক বোম্বিং এবং আত্মসম্মানহীন গাদ্দারদের অকৃতজ্ঞতার কারণে তালেবানরা গোটা উত্তর আফগানিস্তান থেকে পিছু হটে কুন্দুজ শহরে সীমাবদ্ধ হয়ে যায়, তখনও কুন্দুজে মুজাহিদীনের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন কমান্ডার সুলতান শহীদ রহ.। কুন্দুজ শহর থেকে তালেবানরা চলে আসার আগে ভাই সুলতান ওয়ারলেসে মাধ্যমে শত শত মাইল দূরে তার সাথীদের সাথে যোগাযোগ করেন। সেসব যোগাযোগকে আমি রেকর্ডও করেছি। বারবার তিনি বাইরের সাথীদেরকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন। ইনশাআল্লাহ ভালো হয়ে যাবে। বাস্তবেও পরবর্তীতে তার সাথে যা কিছু হয়েছিলো তার জন্য তা কল্যাণকরই ছিলো। কুন্দুজ থেকে চলে আসার পর আফগানিস্তানে উত্তরাঞ্চলের আমেরিকান কমিউনিস্টরা চুক্তি ভঙ্গ করে কুন্দুজ থেকে বের হওয়া সব তালেবানকে গ্রেফতার করে ফেলে। তারপর কঠিন শাস্তি

ও অত্যাচারের টার্গেট বানায়। আমাদের অনুগ্রহশীল এবং গর্বিত কমান্ডার সুলতান শহীদ রহ.ও সেসব বন্দীদের মধ্যে শামিল ছিলেন। কিন্তু তার বন্দী জীবন দীর্ঘ হয়নি। কারণ, উত্তরাঞ্চলীয় জোটের অত্যাচারিদের লিডার দোস্তাম এবং আমেরিকা মিলে দুনিয়ার আইনকে তাকের উপর রেখে ৩ হাজার মুজাহিদীনকে শহীদ করে দেয়। যাদের মধ্যে সুলতান শহীদও শামিল ছিলেন। তাদের দাফন হয় দাশতে লাইলাতে। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে জান্নাতুল ফিরদাউসে সুউচ্চ মর্যাদা দান করুন এবং তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করুন। আমীন, সুম্মা আমীন।

পয়গামে শুহাদা

شہید تم سے یہ کہہ رہے لہو ہمارا بھلا نہ دینا
قسم سے تم کو اے سرفروشوں عدو ہمارا بھلا نہ دینا

তোমাদেরকে বলছেন শহীদান
রক্ত আমাদের ভুলো না কখনো,
কসম তোমাদের হে নতুন প্রজন্ম!
শত্রুকে আমাদের ভুলো না কখনো।

স মা প্ত

Rahee Graphics : 01555360074

আবাবিল
প্র কা শ ন

ISBN:984-70160-0113-7

9847016001137

মুকাদ্দাস জঙ্গ

হা য়া তু ল্লা হ

MUKADDAS JONG

Hayatullah